কবি

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

মিত্র ও ঘোষ
১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা

সত্য ও সুন্দরের উপাসক পরম শ্রদ্ধেয়

শ্রীযুক্ত মোহিতলাল মজুমদার

শ্রদ্ধাভাজনেষু—

লাভপুর, বীরভূম

ফাল্গুন—১৩৪৮

লেখকের অন্য বই

আগুন
নীলকণ্ঠ
রাইকমল
চৈতালী ঘূর্ণী
ইমারৎ
১৩৫০
প্রসাদমালা
পাষাণ পুরী
ধাত্রীদেবতা
গণদেবতা
পঞ্চগ্রাম
কালিন্দী
মন্বন্তর
বেদেনী
রসকলি
স্থলপদ্ম
জলসা-ঘর
হারানো সুর
ছলনাময়ী
দিল্লীকা লাড্ডু
যাদুকরী
প্রতিধ্বনি
তিন শূন্য

নাটক

কালিন্দী
দুই পুরুষ
দ্বীপান্তর
পথের ডাক
বিংশ শতাব্দী

এক

দস্তুরমতো একটা বিস্ময়!

নজীর অবশ্য আছে বটে,—দৈত্যকুলে প্রহ্লাদ; কিন্তু সেটা ভগবৎ-লীলার অঙ্গ। মূককে যিনি বাচালে পরিণত করেন, পঙ্গু যাঁহার ইচ্ছায় গিরি লঙ্ঘন করিতে পারে, সেই পরমানন্দ মাধবের ইচ্ছায় দৈত্যকুলে প্রহ্লাদের জন্ম সম্ভবপর হইয়াছিল; কিন্তু কুখ্যাত অপরাধপ্রবণ ডোমবংশজাত সন্তানের অকস্মাৎ কবিরূপে আত্মপ্রকাশকে ভগবৎ-লীলা বলা যায় কি না, সে বিষয়ে কোন শাস্ত্রীয় নজীর নাই। বলিতে গেলে গা ছম-ছম করে। সুতরাং এটাকে লোকে একটা বিস্ময় বলিয়াই মানিয়া লইল।

গ্রামের ভদ্রজনেরা সত্যই বলিল—এ একটা বিস্ময়! রীতিমত!

অশিক্ষিত হরিজনেরা বলিল—নেতাইচরণ তাক্ লাগিয়ে দিলে রে বাবা!

যে বংশে নিতাইচরণের জন্ম, সে বংশটি হিন্দু সমাজের প্রায় পতিততম স্তরের অন্তর্গত ডোমবংশ, তবে শহর অঞ্চলে ডোম বলিতে যে স্তরকে বুঝায়—ইহারা সে স্তরের নয়। এ ডোমেরা বাংলার বিখ্যাত লাঠিয়াল—প্রাচীন কাল হইতেই বাহুবলের জন্য ডোমেরা বিখ্যাত। ইহাদের উপাধি—বীরবংশী। নবাবী পল্টনেও নাকি বীরবংশীরা বীরত্বে বিখ্যাত ছিল। কোম্পানীর আমলে নবাবী আশ্রয়চ্যুত হইয়া দুর্দ্ধর্ষ যুদ্ধব্যবসায়ীর দল পরিণত হয় ডাকাতে। পুলিসের ইতিহাস ডোমবংশের কীর্ত্তিকলাপে পরিপূর্ণ। এই গ্রামের ডোম-পরিবারগুলির প্রত্যেকের রক্তে রক্তে এখনও সেই ধারা প্রবাহিত। পুলিশ কঠিন বাঁধ দিয়াছে সে প্রবাহের মুখে—লোহা দিয়া বাঁধিয়াছে—হাতকড়ি, লোহার গরাদে দেওয়া ফটক, ডাণ্ডাবেড়ীর লোহা প্রত্যক্ষ; এ ছাড়া ফৌজদারী দণ্ডবিধির আইনও লোহার আইন। কিন্তু তবু বাছিয়া বাছিয়া ছিদ্রপথে অথবা অন্তরদেশে ফল্গুধারার মত নিঃশব্দে অধীর গতিতে আজও সে ধারা বহিয়া চলিয়াছে। নিতাইয়ের মামা গৌর বীরবংশী—অথবা গৌর ডোম এ অঞ্চলে বিখ্যাত ডাকাত। বৎসরখানেক পূর্ব্বেই সে পাঁচ বৎসর 'কালাপানি' অর্থাৎ আন্দামানে থাকিয়া দণ্ড ভোগ করিয়া ফিরিয়াছে।

নিতাইয়ের মাতামহ—গৌরের বাপ শম্ভু বীরবংশী আন্দামানেই দেহ রাখিয়াছে।

নিতাইয়ের বাপ ছিল সিঁদেল চোর। পিতামহ ছিল ঠ্যাঙাড়ে। নিজের জামাই-কেই নাকি সে রাত্রের অন্ধকারে পথিক হিসাবে হত্যা করিয়াছিল। জামাইমারীর মাঠ এখান হইতে ক্রোশ খানেক দূর।

ইহাদেরও ঊর্দ্ধতন পুরুষের ইতিহাস পুলিশ-রিপোর্টে আছে, ভীতিপ্রদ রক্তাক্ত ইতিহাস।

সেই বংশের ছেলে নিতাইচরণ। খুনীর দৌহিত্র, ডাকাতের ভাগিনেয়, ঠাঙাড়ের পৌত্র, সিঁদেল চোরের পুত্র—নিতাইয়ের চেহারায় বংশের ছাপ স্পষ্ট প্রত্যক্ষ; দীর্ঘ সবল কঠিন-পেশী দেহ, রাত্রির অন্ধকারের মত কালো রঙ। কিন্তু বড় বড় চোখের দৃষ্টি তাহার বড় বিনীত এবং সে দৃষ্টির মধ্যে একটি সকরুণ বিনয় আছে। সেই নিতাই অকস্মাৎ কবিরূপে আত্মপ্রকাশ করিল। লোকে সবিস্ময়ে তাহার দিকে ফিরিয়া চাহিল,—নিতাই গৌরবের লজ্জায় অবনত হইয়া সকরুণ দৃষ্টিতে মাটির দিকে চাহিয়া রহিল।

ঘটনাটা এই—

এই গ্রামের প্রাচীন নাম অট্টহাস—একান্ন মহাপীঠের অন্যতম মহাপীঠ। মহাপীঠের অধিষ্ঠাত্রী-দেবী মহাদেবী চামুণ্ডা। মাঘী পূর্ণিমায় চামুণ্ডার পূজা বিশিষ্ট একটি পর্ব্ব; এই পর্ব্ব উপলক্ষ্যে এখানে মেলা বসে। এই মেলায় কবিগানের পাল্লা হইবার কথা। নোটনদাস ও মহাদেব পাল—দুইজনে এ অঞ্চলে খ্যাতনামা কবিয়াল, ইহাদের গান এখানে বাঁধা। অপরাহ্ণবেলা হইতেই লোকজন জমিতে সুরু করিয়া সন্ধ্যানাগাদ বেশ একটি জনতায় পরিণত হইয়াছিল—প্রায় হাজার দেড় হাজার লোকের সমাবেশ।

সন্ধ্যায় সমারোহ করিয়া আসর পাতা হইল, চারিদিকে চারিটা পেট্রোম্যাক্স আলো জ্বালা হইল, কবিয়ালদের মধ্যে মহাদেবের দল আসিয়া আসরে বসিল, কিন্তু নোটনদাসের সন্ধান মিলিল না। যে লোকটি ডাকিতে গিয়াছিল, সে বলিল—বাসাতে কেউ কোথাও নাই মশায়—লোক না—জন না—জিনিস না—সব ভোঁ-ভোঁ করছে। কেবল শতরঞ্চিটা পড়ে রয়েছে—যেটা আমরা দিয়েছিলাম।

মেলার কর্ত্তৃপক্ষ স্তম্ভিত এবং কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া গেল।

* * *

নোটনদাসের দোষ নাই। গতবার হইতেই তাহার টাকা পাওনা ছিল। গতবার মেলা-তহবিলে টাকার অনটন পড়িয়াছিল, সেইজন্য চামুণ্ডার মোহন্ত তাহাদের মাথায় আশীর্ব্বাদী ফুল ঠেকাইয়া বহু আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিয়াছিলেন—আসছে বার, বাবা সকল, আসছে বার! গাওনার আগেই আসছে বার তোমাদের দু বছরের টাকা মিটিয়ে দেওয়া হবে।

নোটন এবং মহাদেব বহুদিন হইতেই এ মেলায় গাওনা করে, এককালে এ মেলার সমৃদ্ধির সময় তাহারা পাইয়াছেও যথেষ্ট, সেই কৃতজ্ঞতা বা চক্ষুলজ্জাতেই গতবার

তাহারা কিছু বলিতে পারে নাই। কিন্তু এবার আসিয়া নোটন যখন মোহন্তকে প্রণাম করিয়া হাত পাতিয়া দাঁড়াইল, তখন তিনি টাকার পরিবর্ত্তে তাহার হাতে দিলেন তাজা টকটকে একটি জবা ফুল, এবং আশীর্ব্বাদ করিলেন—বেঁচে থাক বাবা, মঙ্গল হোক!

বলিয়াই তিনি প্রসঙ্গান্তরে মনোনিবেশ করিলেন। লোক-জন অনেকেই বসিয়া ছিল—অধিকাংশই গ্রামের ভদ্রলোক, তাঁহাদের সঙ্গেই প্রসঙ্গটা আগে হইতে চলিতেছিল। নোটন প্রসঙ্গটা শেষ হইবার অপেক্ষায় বসিয়া রহিল। মজলিসে আলোচনা হইতেছিল—মেলার এবং মা চামুণ্ডার স্থানের আয়ব্যয়ের বিষয়ের। মোহন্ত, আয় এবং ব্যয়ের হিসাব সবিস্তারে বিবৃত করিয়া সিদ্ধান্ত করিয়া দিলেন যে, মা চামুণ্ডার হ্যাণ্ডনোট না কাটিলে আর উপায় নাই। পরিশেষে মৃদু হাসিয়া বলিলেন—এমন খাতক আর মিলিবে না বাবা। কুবের খাজাঞ্চি। ধর্ম্মের কাগজে কামনার কালিতে হ্যাণ্ডনোট লিখে অর্থ দিলে—ওপারে মোক্ষসুদ সমেত পরমার্থ কড়ায় গণ্ডায় মিটিয়ে পাবে। বলিয়া হা-হা করিয়া হাসিয়া উঠিলেন। সঙ্গে সঙ্গে সকলেই হাসিল। নোটনদাসও হাসিল। তারপরেই সে মজলিস হইতে সরিয়া পড়িল।

নোটনের বাসায় তখন নূতন একটা বায়নার প্রস্তাব লইয়া লোক আসিয়া বসিয়া আছে। এখান হইতে দশ ক্রোশ দূরে একটা নূতন মেলা বসিতেছে, সেখানে এবার প্রচুর সমারোহ, তাহারা নোটনদাসকে চায়। অন্তত এখানকার মেলা সারিয়াও যাইতে হইবে। যদি এখানে কোনরূপে শেষের একটা দিন স্থগিত করিয়া যাইতে পারে, তবে অবশ্য বড়ই ভাল হয়।

নোটন বলিল—হুঁ। তারপর সে তাহার দোহারকে বলিল—বোতলটা দে তো! বোতল না হইলে নোটনের চলে না। বোতলের মুখেই খানিকটা পানীয় পান করিয়া নোটন গা-ঝাড়া দিয়া বসিল।

লোকটি নোটনের মুখের দিকে চাহিয়া বসিয়া ছিল, সে বলিল—তা হ'লে ওস্তাদ, আমাকে একটা কথা ব'লে দেন। আমাকে আবার এই ট্রেনেই ফিরতে হবে। ট্রেনেরও আর দেরী নাই।

নোটন হাসিয়া বলিল—আমি কাল থেকেই গাওনা করব।

লোকটা বিনীত হইয়া বলিল—আজ্ঞে, তা হ'লে এখানে?

নোটন বলিল—নিজে শুতে পাচ্ছিস সেই ভাল, শঙ্করার ভাবনা ভাবতে হবে না তোকে।

লোকটা বলিল—আজ্ঞে বেশ। তা কবে যাবেন আপনি ?

—আজই, এখুনি, তোর সঙ্গে এই ট্রেনে।

লোকটা উৎসাহিত হইয়া উঠিল।

—দক্ষিণে কিন্তু পনেরো টাকা রাত্রি।

—আজ্ঞে, তাই দোব। লোকটার উৎসাহের আর সীমা ছিল না।

—কিন্তু আগাম দিতে হবে।

তৎক্ষণাৎ লোকটি একখানা দশ টাকার নোট বাহির করিয়া দিল। বলিল—এই বায়না। আর সেখানকার মাটিতে পা দিলেই বাকী টাকা কড়া-ক্রান্তি হিসেব ক'রে মিটিয়ে দোব।

নোটখানা ট্যাঁকে গুজিয়া নোটন উঠিয়া পড়িল। ঢুলী ও দোহারদের বলিল—ওঠ! লোকটাকে বলিল—টাকা মিটিয়ে নিয়ে বাসায় ঢুকব কিন্তু। তারপর সন্ধ্যার অন্ধকারে অন্ধকারে—মাঠে মাঠে স্টেশনে আসিয়া মুখ ঢাকিয়া ট্রেনে উঠিয়া বসিল।

* * *

নোটন ভাগিয়াছে শুনিয়া অপর পাল্লাদার কবি মহাদেব আসরে বসিয়া মনে মনে অপসোস করিতেছিল। আজও পর্য্যন্ত নোটনের সহিত পাল্লায় কখনও সে পরাজয় স্বীকার করে নাই, কিন্তু আজ সে সর্ব্বান্তঃকরণে নীরবে পরাজয় স্বীকার করিল—সঙ্গে সঙ্গে নোটনকে বেইমান বলিয়া গালও দিল।

আসরের জনতা ক্রমশ ধৈর্য্য হারাইয়া ফেলিতেছিল, সংবাদটা তখনও তাহাদের কাছে অজ্ঞাত। অধীর শ্রোতার দল কলরবে একেবারে হাট বাধাইয়া তুলিয়াছিল। পাশেই মেলার কর্ত্তৃপক্ষ এবং গ্রাম্য জমিদারগণ নোটন-প্রসঙ্গ আলোচনা করিতে-ছিলেন। মোহন্ত চিন্তিত। নোটন ভাগিয়াছে কবিগান হইবে না—এই কথাটি একবার উচ্চারিত হইলে হয়, সঙ্গে সঙ্গে এই দর্শকদল—বাঁধভাঙা জলের মত চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িবে। জলশূন্য পুষ্করিণীর ভিজা পাঁকের মত জনশূন্য মেলাটায় থাকিবে শুধু পায়ের দাগ আর ধুলা। ওদিকে কিন্তু গ্রাম্য জমিদারগণ একেবারে খড়ের আগুনের মত জলিয়া উঠিয়াছেন। এখনি পাইক লাঠিয়াল পাঠাইয়া গলায় গামছা বাঁধিয়া নোটনকে ধরিয়া আনিয়া জুতা মারিয়া পিঠের চামড়া তুলিয়া দিবার ব্যবস্থা হইতে ক্ষতিপূরণের মামলা করিয়া হতভাগ্যের ভিটামাটি উচ্ছন্ন দিবার ব্যবস্থা পর্য্যন্ত—নানা উত্তেজিত কল্পনায় তৃণদাহী বহ্নির মতই তাঁহারা লেলিহান হইয়া উঠিয়াছেন। জমিদারের অন্যতম, গঞ্জিকাসেবী ভূতনাথ—নামে ভূতনাথ হইলেও দক্ষযজ্ঞনাশী নিরূপাক্ষের মতই দুর্মদ দুর্দ্দান্ত, সে মালকোচ সাঁটিয়া বলিল—ছুটো লোক, ছোঠো

আদমী হামারা সাথ দেও, আমি এখুনি যাব। দশ কোশ রাস্তা। দশ কোশ তো ঢুলকীমে চলা যায়গা। বলিয়া সে যেন ঢুলকী চালে চলিবার জন্ম দুলিতে আরম্ভ করিল।

ঠিক এই সময়েই কে একজন কথাটা জানিয়া ফেলিয়া আসরের প্রান্ত হইতে হাঁকিয়া বলিল—উঠে আয় রে রাখহরি, উঠে আয়।

—কেনে রে? উঠে গেলে আর জায়গা থাকবে না।

—জায়গা নিয়ে ধুয়ে খাবি! উঠে আয়—বাড়ী যাই—ভাত খাই গিয়ে। নোটনদাস ভেগেছে; কবি হবে না।

—না। মিছে কথা।

—মাইরি বলছি। সত্যি।

রাখহরি রসিক ব্যক্তি, সে সঙ্গে সঙ্গে বলিয়া উঠিল—বল হরি—! সমগ্র জনতা নিম্নাভিমুখী আলোড়িত জলরাশির কল্লোলের মতই কৌতুকে উচ্ছ্বসিত হইয়া ধ্বনি দিয়া উঠিল—হরি বো—ল! অর্থাৎ মেলাটির শবযাত্রা ঘোষণা করিয়া সঙ্গে সঙ্গে তৃণ-দাহী বহ্নি যেন ঘরে লাগিয়া গেল। জমিদারবর্গ জনতার উপরেই ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিল।

—কে? কে? কে রে বেটা?

—ধর তো বেটাকে, ধর তো। হারামজাদা বেটা বজ্জাত, ধর তো বেটাকে।

ভূতনাথ ব্যাঘ্রবিক্রমে ঘুরিয়া রাখহরির বদলে যে লোকটিই সম্মুখে পাইল, তাহারই চুলের মুঠায় ধরিয়া হুঙ্কার দিয়া উঠিল—চোপ রও শালা।

অন্য কয়েকজনে তাহাকে ক্ষান্ত করিল—হাঁ-হাঁ-হাঁ! কর কি ভূতনাথ, ছাড়, ছাড়।

ভূতনাথ তাহাকে ছাড়িয়া দিল, কিন্তু বীর বিক্রমে শাসন করিয়া দিল—খবর দা—র!

একজন বিবেচক ব্যক্তি বলিল—মেলা-খেলায় ও-রকম করে মানুষ! রং তামাসা নিয়েই তো মেলা হে। ভোলা ময়রা কবিয়াল—জাড়া গাঁয়ে কবি করতে গিয়ে জমিদারের মুখের সামনেই বলেছিল—"কি ক'রে তুই বললি জগা, জাড়া গোলোক বৃন্দাবন, যেখানে বামুন রাজা চাষী প্রজা—চারিদিকেতে বাঁশের বন! কোথায় তোর শ্যামকুণ্ড কোথায় বা তোর রাধাকুণ্ড—সামনে আছে মুলোকুণ্ড করগে মুলো দরশন।" তাতে তো বাবুরা রাগ করে নাই, খুশীই হয়েছিল।

ভূতনাথ এত বোঝে না সে বক্তাকে এক কথায় নাকচ করিয়া দিল—যা-যা-যাঃ। কিসে আর কিসে—ধানে আর তুষে।

—আরে, তুষ হ'লেও তো ধানের খোসা বটে। চটলে চলবে কেন? দু তিন মাইল থেকে সব তামাক টিকে নিয়ে এসেছে কবিগান শুনতে। এখন শুনছে—'কবিয়াল ভাগলবা'; তা ঠাট্টা ক'রে একটু হরিধ্বনি দেবে না! রেগো না।

মোহন্ত এখন গাঁজা খাইয়া ভাম হইয়া বসিয়া থাকেন বটে, কিন্তু এককালে তিনি একজন পাকা পাটোয়ার অর্থাৎ জমিদার সেরেস্তার নায়েব ছিলেন; তিনি এতক্ষণ ধরিয়া চুপ করিয়া চিন্তাই করিতেছিলেন, তিনি এইবার বলিলেন—আচ্ছা, আচ্ছা কবিগানই হবে। চিন্তা কি তার জন্যে! চিন্তামণি যে পাগলী বেটীর দরবারে বাঁধা, তাঁর চিনির ভাবনা! বলিয়া হা-হা করিয়া হাসিয়া উঠিলেন।

কবিগান চিনি কি না—সে প্রশ্ন তখন কাহারও মনে উঠিবার সময় নয়, সকলে উৎসুক হইয়া মোহন্তের মুখের দিকে চাহিল, মোহন্ত বলিলেন—ডাক মহাদেবকে আর তার প্রধান দোয়ারকে। তাই হোক—গুরু-শিষ্যেই যুদ্ধ হোক। রাম-রাবণের যুদ্ধের চেয়ে দ্রোণ-অর্জ্জুনের যুদ্ধ কিছু কম নয়। রামায়ণ সপ্তকাণ্ড, মহাভারত হ'ল অষ্টাদশ পর্ব্ব।

সোর-গোল উঠিল—মহাদেব! মহাদেব! ও হে কবিয়াল! ওস্তাদজী হে! শোন শোন।

দুই

মহাদেব অগত্যা কথাটা স্বীকার করিল।

মোহন্ত সুদুর্লভ আশীর্ব্বাদ করিয়া তাহাকে কল্পতরুর তলায় বসাইয়া দিলেন, অতঃপর স্বীকার না করিয়া উপায় কি! কিন্তু আর একজন ঢুলী দোয়ারের প্রয়োজন। ঠিক এই সময়েই নিতাইচরণের আবির্ভাব। সে জোড়হাতে পরম বিনয়সহকারে শুদ্ধ ভাষায় নিবেদন করিল—প্রভু অধীনের একটি নিবেদন আছে—আপনকাদের সি-চরণে।

অন্য কেহ কিছু বলিবার পূর্ব্বেই মহাদেব কবিওয়ালাই বলিয়া উঠিল—এই যে, এই যে আমাদের নেতাইচরণ রয়েছে; তবে আর ভাবনা কি? নেতাই বেশ পারবে দোয়ারকি করতে।

নিতাইয়ের গুণাগুণ কবিয়ালরা জানিত, কবিগান যেখানেই হউক, সে গিয়া ওই দোয়ারদের দলে মিশিয়া বসিয়া পড়িত, কখনও কাঁসী বাজাইত—আর দোয়ারের কাজ তো প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত।

বাবুদের মধ্যে একজন কলিকাতায় চাকরী করেন, ময়লা কাপড়-জামার গাদার মধ্যে তিনি ধোপদুরস্ত পাট করা বস্ত্রের মতই শোভমান ছিলেন—বেশ ভারিক্কী

চাল; খুব উঁচু দরের পায়াভারী পৃষ্ঠপোষকের মত করুণামিশ্রিত বিস্ময় প্রকাশ করিয়া তিনি বলিলেন—বল কি, অ্যাঁ? নেতাইচরণের আমাদের এতগুণ! A Poet! বাহবা, বাহাবা রে নিতাই! তা লেগে যা রে বেটা, লেগে যা। আর দেরী নয়—আরম্ভ ক'রে দাও তা হ'লে। তিনি হাতঘড়িটা দেখিবার চেষ্টা করিয়া বলিলেন—এখনই তো তোমার—

দেখ তো কটা বাজল? একজন ফস করিয়া দেশলাইয়ের একটা কাঠি জ্বালিয়া ধরিল।

ভদ্রলোক বিরক্ত হইয়া হাত সরাইয়া লইয়া বলিলেন—আঃ! দরকার নেই আলোর। রেডিয়ম দেওয়া আছে, অন্ধকারে দেখা যাবে।

ভূতনাথ এতসব রেডিয়ম ফেডিয়ামের ধার ধারে না, সে হি-হি করিয়া হাসিয়া নিতাইকেই বলিল—লে রে বেটা, লে, তাই কাক কেটেই আজ আমাবস্তে হোক। কাক—কাকই সই!

নিতাই মনে মনে আহত হইলেও মুখে কিছু বলিল না। ও-দিকে তখন আসরে ঢোলে কাঠি পড়িতে আরম্ভ করিয়াছে, কুড়ুতাক কুড়ুতাক কুড়ুম-কুড়ুম।

নিতাই দোয়ারকি করিতে লাগিয়া গেল।

নিজের দোয়ারের সহিত কবিওয়ালার পাল্লা, সুতরাং প্রতিযোগিতাটা হইতেছিল আপোসমূলক—অত্যন্ত ঠাণ্ডা রকমের। তীব্রতা অথবা উষ্ণতা মোটেই সঞ্চারিত হইতেছিল না। শ্রোতাদের মধ্যে গুঞ্জন উঠিল দুই ধরণের; যাহারা উহাদের মধ্যে তীক্ষ্ণবুদ্ধি, তাহারা বলিল—দূর দূর! এই শোনে! সাঁট ক'রে পাল্লা হচ্ছে! চল বাড়ী যাই। দুই-চার জন আবার উঠিয়াও গেল।

অপর দল বলিল—মহাদেবের দোয়ারও বেশ ভাল কবিয়াল মাইরি! বেশ কবিয়াল, ভাল কবিয়াল! টকাটক জবাব দিচ্ছে।

নিতাইচরণের প্রশংসাও হইতেছিল। নিতাইচরণের গলাখানি বড় ভাল। তাহার উপর ফোড়নও দিতেছে চমৎকার। সে প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছে—নিজে স্বাধীনভাবে দুই-চার কলি গাহিবার জন্য।

বাবুরা তাহাকে উৎসাহিত করিলেন—বলিহারি বেটা বলিহারি!

নিতাইয়ের স্বজন ও বন্ধুজনে বলিল—আচ্ছা, আচ্ছা!

এক কোণে মেয়েদের জটলা—তাহাদেরও বিস্ময়ের সীমা নাই, নিতাইয়ের পরম বন্ধু স্টেশনের পয়েন্টস্‌ম্যান রাজালাল বায়েনের বউ হাসিয়া প্রায় গড়াইয়া পড়িতেছে—ও মা গো? নেতাইয়ের প্যাটে প্যাটে এত! ও মা গো!

তাহার পাশেই বসিয়া রাজার বউয়ের বোন, ষোল-সতের বছরের মেয়েটি পাশের গ্রামের বউ—সে বিস্ময়ে হতবাক হইয়া গিয়াছে, সে মধ্যে মধ্যে বিরক্ত হইয়া বলিতেছে—না ভাই, খালি হাসছিস তু! শোন কেনে!

রাজা বন্ধুগৌরবে অদূরে বসিয়া ক্রমাগত ঢুলিতেছিল, সে হাসিয়া বলিল—দেখতা হায় ঠাকুরঝি! ওস্তাদ কেয়সা গাহানা করতা হায়, দেখতা!

রাজা এই শ্যালিকাটিকে বলে—ঠাকুরঝি! নিতাইও তাহাকে বলে—ঠাকুরঝি। শ্বশুর-বাড়ী অর্থাৎ পাশের গ্রাম হইতে সে নিত্য দুধ বেচিতে আসে। নিতাই নিজেও এক পোয়া করিয়া দুধের 'রোজ' লইয়া থাকে। এই কারণেই মেয়েটির বিস্ময় এত বেশী; যে লোককে মানুষ চেনে, তাহার মধ্য হইতে অকস্মাৎ এক অপরিচিত জনকে আত্মপ্রকাশ করিতে দেখিলে বিস্ময়ে মানুষ এমনই হতবাক হইয়া যায়।

নিতাইয়ের কিন্তু তখন এদিকে চাহিয়া দেখিবার অবসর ছিল না; সে তখন প্রচণ্ড উৎসাহে উৎসাহিত হইয়া উঠিয়াছে, উৎসাহের প্রাবল্যে সে উটের মত নাসিকা-প্রবেশের পথে মাথা গলাইয়া দিল—নিজেই সে স্বাধীনভাবে গান আরম্ভ করিল। আ—করিয়া রাগিণী টানিয়া মহাদেবের দোয়ারের রচিত ধুয়াটাকে পর্য্যন্ত পাল্টাইয়া—সেই সুরে ছন্দে নিজেই নূতন ধুয়া ধরিয়া দিল।

মহাদেবের দোয়ার, সেই প্রকৃত একপক্ষের পাল্লাদার ওস্তাদ—সে আপত্তি তুলিয়া বলিয়া উঠিল—অ্যাই! ও কি? ও কি গাইছ তুমি? অ্যাই—নেতাই!

নিতাই সে কথা গ্রাহ্যই করিল না। বাঁ হাতখানিতে কান ঢাকিয়া ডান হাতখানি থুথু নিবারণের জন্য মুখের সম্মুখে ধরিয়া গান গাহিয়া চলিল। সম্মুখের দিকে অল্প একটু ঝুঁকিয়া তালে তালে মৃদু নাচিতে নাচিতে সে গাহিল—

হুজুর—ভদ্র পঞ্চজন, রয়েছেন যখন
সুবিচার হবে নিশ্চয় তখন—
জানি-জানি-জানি,

বাবুরা খুব বাহবা দিলেন—বহুৎ আচ্ছা! বাহবা! বাহবা!

সাধারণ শ্রোতারা বলিল—ভাল। ভাল।

নিতাই ধাঁ করিয়া লাফ মারিয়া ঘুরিয়া ঢুলিটাকে ধমক দিল—অ্যা-ই! কাটছে।

সঙ্গে সঙ্গে সে তাল দেখাইয়া হাতে তালি দিয়া বাজনার বোল বলিতে আরম্ভ করিল— ধিকড় তা-তা-ধেন্‌তা,—ধিকড় তা-তা-ধেন্‌তা—গুড়-গুড়-তা-তা-থিয়া—ধিকড়;—হাঁ—! বলিয়া সে স্বরচিত ধুয়াটা গাহিল—

ক-য়ে কালী কপালিনী—খ-য়ে খপ্পরধারিণী
গ-য়ে গোমতা সুরভি—গণেশজননী—
কণ্ঠে দাও মা বাণী।

একপাশে কতকগুলি অর্দ্ধশিক্ষিত ছোকরা বসিয়া ছিল—তাহারা হি-হি করিয়া হাসিয়া উঠিল। একজন বলিল—গ-য়ে গরু, ছ-য়ে ছাগল, ভ-য়ে ভেড়া। বহুৎ আচ্ছা! হাস্যধ্বনির রোল উঠিয়া গেল।

নিতাই সঙ্গে সঙ্গে খাড়া হইয়া দাঁড়াইল, তারপর হাস্যধ্বনি অল্প শান্ত হইতেই বলিল—বলি দোয়ারগণ!

মহাদেবের দোয়ার রাগ করিয়া বসিয়া ছিল, অপর কোন দোয়ারও ছিল না। কেহ সাড়াই দিল না। নিতাই এবার উভয়ের প্রত্যাশা না করিয়াই বলিল—দোয়ারগণ! গোমাতা শুনে সবাই হাসছে! বলছে, গ-য়ে গরু, ছ-য়ে ছাগল, ভ-য়ে ভেড়া!

ঢুলীটা এবার বলিল—হাঁ!

আচ্ছা।—বলিয়া সে ছড়ার সুরে আরম্ভ করিল—

গো-মাতা শুনিয়া সবে হাস্য করে।
দীন নিতাইচরণ বলছে জোড়করে—

বলিয়া হাত দুইটি জোড় করিয়া একবার চারিদিক ঘুরিয়া লইল। বন্ধু রাজা পরম উৎসাহে বলিয়া উঠিল—বহুৎ আচ্ছা ওস্তাদ।

কিন্তু নিতাই তখন চোখে স্পষ্ট করিয়া কিছু দেখিতেছিল না, রাজাকে সে লক্ষ্য করিল না, সে ছড়াতেই বলিয়া গেল—অসমান মাত্রায় রচিত গ্রাম্য কবিয়ালের ছড়া—

শুনুন মহাশয় দীনের নিবেদন।
গো কিম্বা গরু তুচ্ছ নয় কখন॥
গাভী ভগবতী, ষাঁড় শিবের বাহন।
সুরভির শাপে মজে কত রাজন॥

রব উঠিল—ভাল! ভাল! ঢুলীটা ঢোলে কাঠি দিল—ডুডুম!

নিতাই বলিল—

শাস্ত্রের সার কথা আরও বলে যাই।
গো-ধন তুল্য ধন ভূ-ভারতে নাই॥
তেঁই গোলোকপতি—বিষ্ণু বনমালী।
ব্রজধামে করলেন গরুর রাখালী॥

নিতাইয়ের এই উপস্থিত জবাবে সকলে অবাক হইয়া গেল। ছন্দে বাঁধিয়া এমন ত্বরিত এবং যুক্তিসম্পন্ন জবাব দেওয়া তো সহজ কথা নয়। বন্ধু রাজা পর্য্যন্ত হতবাক; রাজার বউয়ের হাসি থামিয়া গিয়াছে; ঠাকুরঝির অবগুণ্ঠন খসিয়া পড়িয়াছে—দেহের বেশবাসও অসম্বৃত।

নিতাইয়ের তখনও শেষ হয় নাই, সে বলিল—

তা ছাড়া মশাই—আছে আরও মানে—
গো মানে পৃথিবী সুধান পণ্ডিত জনে ॥

এবার বাবুরা উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করিয়া উঠিলেন। আসরের লোক হরিধ্বনি দিয়া উঠিল।

নিতাই বিজয়গর্ব্বে ঢুলীটাকে বলিল—বাজাও।

এতক্ষণে সকলে নড়িয়া চড়িয়া বসিল, রাজা একবার ফিরিয়া স্ত্রী ও ঠাকুরঝির দিকে চাহিয়া হাসিল—অর্থাৎ, দেখ। স্ত্রী বিস্ময়ে মুগ্ধ হাসি হাসিয়া বলিল—তা বটে বাপু।

ঠাকুরঝির কিন্তু তখনও বিস্ময়ের ঘোর কাটে নাই। সে বিপুল বিস্ময়ে শিথিল-চৈতন্যের মত নিতাইয়ের দিকে চাহিয়া ছিল। রাজা তাহার অসম্বৃতবাসা বিস্মিত ভঙ্গি দেখিয়া বিরক্ত হইয়া উঠিল, রূঢ়স্বরে বলিল—অ্যাই! ও ঠাকুরঝি! মাথায় কাপড় দে।

রাজার স্ত্রী একটা ঠেলা দিয়া বলিল—মরণ, সাড় নাই মেয়ের!

ঠাকুরঝি এবার জিভ কাটিয়া কাপড় টানিয়া মাথায় দিয়া বলিল—আচ্ছা গাইছে বাপু ওস্তাদ।

ওদিকে বাবুদের মহলে সকলের বিস্ময়ের সীমা ছিল না, কলিকাতা-প্রবাসী চাকুরে বাবুটি পর্য্যন্ত স্বীকার করিলেন—রীতিমত একটা বিস্ময়! Son of a Dom—অ্যাঁ—He is a poet!

দুর্দ্দান্ত ভূতনাথ ক্রুদ্ধ হইলে রুদ্র, তুষ্ট হইলে আশুতোষ—মানসিক অবস্থায় এই দুই দূরতম প্রান্তে অতি সহজেই সে গঞ্জিকাপ্রসাদে ব্যোমমার্গে নিমেষমধ্যেই যাওয়া-আসা করিয়া থাকে, সে একেবারে মুগ্ধ হইয়া গিয়াছিল। সে বলিল—ধুকুড়ির ভেতর খাসা চাল রে বাবা! রত্ন রে—একটা রত্ন—মানিকের বেটা মানিক!

মোহন্ত হাসিয়া বলিলেন—আমার পাগলী বেটীর খেয়াল বাবা; নিতাইকে বড় করতে মা আমার নোটনকে তাড়িয়েছেন।

ইহার পরই আরম্ভ হইল মহাদেবের পালা। মহাদেব পাকা প্রাচীন কবিয়াল।

ব্যাপারটা দেখিয়া শুনিয়া সে ক্রুদ্ধ ভ্রুকুটি করিয়া গান ধরিল—ব্যঙ্গে, গালি-গালাজে নিতাইকে শূলবিদ্ধ করিতে আরম্ভ করিল, রসপূর্ণ গালি-গালাজে সমস্ত আসরটা হাস্যরোলে মুখর হইয়া উঠিল। নিতাইও আসরে বসিয়া মৃদু মৃদু হাসিতেছিল। কিন্তু ক্ষুণ্ণ হইল রাজা। সে মিলিটারী মেজাজের লোক, গালি-গালাজগুলা তাহার অসহ্য হইয়া উঠিল। সে আসর হইতে উঠিয়া খানিকটা মেলার মধ্যে ঘুরিবার জন্য চলিয়া গেল। রাজার স্ত্রী কিন্তু প্রচুর হাসিতেছিল। ঠাকুরঝি মেয়েটিও কিন্তু অত্যন্ত দুঃখিত হইয়াছে, সে এবারও বিরক্তি ভরে বলিল—হাসিস না দিদি! এমনি ক'রে গাল দেয় মানুষকে!

মহাদেব ছড়া বলিতেছিল—

সুবুদ্ধি ডোমের পোয়ের কুবুদ্ধি ধরিল।
ডোম কাটারি ফেলে দিয়ে কবি করতে আইল॥
ও-বেটার বাবা ছিল সিঁদেল চোর, কর্ত্তা বাবা ঠ্যাঙাড়ে।
মাতামহ ডাকাত বেটার—দ্বীপান্তরে মরে॥
সেই বংশের ছেলে বেটা কবি করবি তুই।
ডোমের ছাওয়াল রত্নাকর চিংড়ির পোনা রুই॥

একজন ফোড়ন দিল—

অল্পজলই ভাল চিংড়ির—বেশী জলে যাস না।

দোয়ারেরা পরমোৎসাহে মহাদেবের নূতন ধুয়াটা গাহিল—

আস্তাকুড়ের এঁটোপাতা—স্বগ্গে যাবার আশা—গো!
ফরাৎ ক'রে উড়ল পাতা—স্বগ্গে যাবার আশা গো!
হায়রে কলি—কিই বা বলি—
গরুড় হবেন মশা গো—স্বগ্গে যাবার আশা গো॥

অকস্মাৎ মহাদেব বলিয়া উঠিল—আঃ, জ্বালাতন রে বাপু! বলিয়াই সে আপনার পায়ে একটা চড় মারিয়া বসিল এবং সঙ্গে সঙ্গেই গাহিল—

পায়েতে কামড়ায় মশা—মারিলাম চাপড়!
গোলোকেতে বিষ্ণু কাঁদেন—চড়িবেন কার উপর!

মহাদেবের দোয়ার—যাহাকে নাকচ করিয়া নিতাই কবিয়াল হইয়াছে—সেই এবার ফোড়ন দিয়া উঠিল—চটাৎ চড়ের সয় না ভর, স্বগ্গে যাবার আশা গো।

ইহার পর রাত্রি যত অগ্রসর হইল, মহাদেবের তাণ্ডব ততই বাড়িয়া গেল। শ্লীল-অশ্লীল গালিগালাজে নিতাইকে সে বিপর্য্যস্ত করিয়া দিল। মহাদেবের এই

শূল-প্রতিরোধের ক্ষমতা নিতাইয়ের ছিল না। কিন্তু তাহার বাহাদুরি এই যে জর্জ্জর ক্ষতবিক্ষত হইয়াও সে ধরাশায়ী হইল না। খাড়া থাকিয়া হাসিমুখেই সব সহ্য করিল। সে গালিগালাজের উত্তরে কেবল ছড়া কাটিয়া বলিল—

ওস্তাদ তুমি বাপের সমান তোমাকে করি মান্য।
তুমি আমাকে দিচ্ছ গাল, ধন্য হে তুমি ধন্য॥
তোমার হয়েছে ভীমরথী—আমার কিন্তু আছে ভক্তি তোমার চরণে।
ডঙ্কা মেরেই জবাব দিব—কোনই ভয় করি না মনে॥

লোকের কিন্তু তখন এ বিনীত মিষ্ট রস উপভোগ করিবার মত অবস্থা নয়, মহাদেব গালিগালাজের মত্তরসে আসরকে মাতাল করিয়া দিয়া গিয়াছে, এবং মহাদেবের তুলনায় নিতাই সত্যই নিষ্প্রভ। সুতরাং তাহার হার হইল। তাহাতে অবশ্য নিতাইয়ের কোন গ্লানি ছিল না। বরং সে অকস্মাৎ নিজেকে একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি বলিয়াই অনুভব করিল।

পাল্লার শেষে সে বাবুদের প্রণাম করিয়া করজোড়ে সবিনয়ে বলিল—হুজুরগণ, অধীন মুখ্য ছোট নোক—

তাহাকে কথা শেষ করিতে না দিয়াই বাবুরা বলিলেন—না না। খুব ভাল, ভাল গেয়েছিস তুই। বহুৎ আচ্ছা, বহুৎ আচ্ছা!

প্রচণ্ড উৎসাহে তাহার পিঠে কয়েকটা সাংঘাতিক চপেটাঘাত করিয়া ভূতনাথ বলিল—জিতা রহো, জিতা রহো রে বেটা।

ঠাকুরে বাবু করুণামিশ্রিত প্রশংসার হাসি হাসিয়া বলিল—ইউ আর এ পোয়েট, অ্যাঁ!

কথাটার অর্থ বুঝতে না পারিয়া নিতাই বিনীত সপ্রশ্ন ভঙ্গিতে বাবুর দিকে চাহিয়া বলিল—আজ্ঞে?

বাবু বলিলেন—তুই তো একজন কবি রে।

নিতাই লজ্জিত হইয়া মাথা নীচু করিয়া মাটির দিকে চাহিয়া রহিল। তারপর সে মহাদেবকে বলিল—মার্জ্জনা করবেন ওস্তাদ। আমি অধম। বলতে গেলে আমি মশকই বটে।

মহাদেব অবশ্য এ কথায় লজ্জিত হইল না, সে বরং নিতাইয়ের বিনয়ে খুশি হইয়াই বলিল—আমার দলে তুমি দোয়ারকি কর। তারপর নিজেই দল বাঁধতে পারবে।

নিতাই মনে মনে একটা রূঢ় অথচ রসিকতাসম্মত জবাব খুঁজিতেছিল; মহাদেবের গালিগালাজের মধ্যে জাতি তুলিয়া এবং বাপ-পিতামহ তুলিয়া গালিগালাজগুলি

তাহার বুকে কাঁটার মত বিঁধিয়াছিল। কিন্তু কোন উত্তর দিবার পূর্ব্বেই পিছন হইতে দশ-বিশজন ডাকিল—নেতাইচরণ, নেতাইচরণ! ওহে!

ডাক শুনিয়া নিতাইচরণ পুলকিত হইয়াই ফিরিয়া দাঁড়াইল, আজই সে—'নিতে' 'নেতা' 'নিতো' 'নেতাই' হইতে নিতাইচরণ হইয়া উঠিয়াছে। যাহারা ডাকিতেছিল, তাহারা অদূরবর্ত্তী বাবুদের দেখাইয়া বলিল—বাবুরা ডাকছেন। মোহন্ত ডাকছেন।

মোহন্তজী চণ্ডীর প্রসাদী একগাছি সিন্দুরলিপ্ত বেলপাতার মালা তাহার মাথায় আলগোছে ফেলিয়া দিয়া বলিলেন—বাঃ বাঃ, খুব ভাল। মা তোমার উন্নতি করবেন। মায়ের মেলায় একরাত্রি গাওনা তোমার বাঁধা বরাদ্দ রইল।

ঢাকুরে বাবু নিতাইয়ের পিঠ চাপড়াইয়া বলিলেন—একটা মেডেল তোকে দেওয়া হবে। তারপর হাসিয়া আবার বলিলেন—You are a poet! অ্যাঁ! এ একটা বিস্ময়!

নিতাই দিশাহারা হইয়া গেল। কি করিবে, কি বলিবে, কিছুই ঠাওর করিতে পারিল না। বাবু বলিলেন—কিন্তু খবরদার, আপন গুষ্টির মত চুরি ডাকাতি করবি না। তুই বেটা কবি—a poet!

হাতজোড় করিয়া এবার নিতাই বলিল—আজ্ঞে প্রভু! চুরি জীবনে আমি করি নাই। মিছে কথাও আমি বলি না হুজুর, নেশা পর্য্যন্ত আমি করি না। জ্ঞাত-জ্ঞাত-মা-ভাইয়ের সঙ্গেও এইজন্যে বনে না আমার; আমি ঘর তো ঘর, পাড়া পর্য্যন্ত ত্যজ্য করেছি। আমি থাকি ইষ্টিশানে রাজন পয়েণ্টম্যানের কাছে। কুলিগিরি ক'রে খাই।

এ গ্রামের সমস্ত কিছুই ভূতনাথের নখদর্পণে, সে নিতাইকে সমর্থন করিয়া বলিল—তা বটে বাপু! সাচ্চা সাধু আদমী নিতাই।

নিতাই আবার বলিল—এই মা-চণ্ডীর সামনে দাঁড়িয়ে বলছি। মিছে বলি তো বজ্জাঘাত হবে আমার মাথায়।

তিন

নিতাই মিথ্যা শপথ করে নাই। নিতাই জীবনে কখনও চুরি করে নাই। তাহার আত্মীয়স্বজন, গভীর রাত্রে নিঃশব্দপদসঞ্চারে, নির্ভয় বিচরণের মধ্যে যে উদ্বেগময় উল্লাস অনুভব করে, সে উল্লাসের আস্বাদ সত্যই নিতাইয়ের রক্তকণিকাগুলির কাছে অজ্ঞাত। গ্রীক-বীর আলেকজাণ্ডারের সম্মুখীন থেসিয়ান দস্যুর মত ন্যায়ের তর্ক বীরবংশীরা জানে না

বটে, কিন্তু নীতি ও ধর্ম্মের কথা শুনিয়া তাহারা হাসে। নিতাইয়ের এই বিমুখতার জন্য তাহারা তাহাকে ঘৃণা করে।

কেমন করিয়া এমন হইল, সে ইতিহাস অজ্ঞাত। তাচ্ছিল্যভরে কেহ লক্ষ্য করে নাই বলিয়াই অলক্ষ্যে হারাইয়া গিয়াছে। তবে একটি ঘটনা লোকের চোখে পড়িয়াছিল। স্থানীয় জমিদারের মায়ের স্মৃতিরক্ষার উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত নৈশ-বিদ্যালয়ে নিতাই পড়াশুনা করিয়াছিল। ডোমপাড়ার অনেকগুলি ছেলেই পড়িত। ছাত্রসংগ্রহের উদ্দেশ্যে জমিদার একখানা করিয়া কাপড় দিবার ঘোষণার ফলেই বীরবংশীর দল ছেলেদের পাঠশালায় আনিয়া ভর্ত্তি করিয়া দিয়াছিল। সঙ্গে সঙ্গে নিতাইও আসিয়াছিল। বৎসরের শেষে কাপড় লইয়া দ্বিতীয় ভাগের চোর বেণীর গল্প পড়িবার পূর্ব্বেই ডোমেদের ছেলেগুলি পাঠশালা হইতে সরিয়া পড়িল, কেবল নিতাইই থাকিয়া গেল। নিতাই পরীক্ষায় ফার্স্ট হইয়াছিল বলিয়া কাপড়ের সঙ্গে একটা জামা ও একখানা গামছা পাইয়াছিল। ছেলে, কাপড় গামছা জামা তিন দফা পাওয়াতে নিতাইয়ের মা আপত্তি তো করেই নাই বরং খানিকটা গৌরব অনুভবও করিয়াছিল। বংশধারা-বিরোধী একটি অভিনব গৌরবের আস্বাদ বোধ করি নিতাই পাইয়াছিল। ইহার পর আরও বৎসর দুয়েক নিতাই পাঠশালায় পড়িয়াছিল। এই দুই বৎসরে পুরস্কার হিসাবে কাপড়, জামা, গামছা ছাড়াও নিতাই পাইয়াছিল খান কয়েক বই—শিশুবোধ রামায়ণ, মহাভারতের কথা, জানোয়ারের গল্প। সেগুলি নিতাইয়ের কণ্ঠস্থ। নিতাই আরও পড়িত, কিন্তু একমাত্র নিতাই ছাড়া পাঠশালায় আর দ্বিতীয় ছাত্র না থাকায় পাঠশালা উঠিয়া গেল; অগত্যা নিতাই পাঠশালা ছাড়িতে বাধ্য হইল। ততদিনে সে কবিগানের মস্ত ভক্ত হইয়া উঠিয়াছে। বাংলার অশিক্ষিত সম্প্রদায় কবিগানের ভক্ত। কিন্তু সে প্রীতি তাহাদের অশ্লীল রসিকতার প্রতি আসক্তি। নিতাইয়ের আসক্তি অন্যরূপ। পুরাণ-কাহিনী, কবিতা তাহার ভাল লাগে।

মামাতো মাসতুতো ভাইয়েরা নিতাইকে ব্যঙ্গ করিয়া এতদিন বলিত—পণ্ডিত মাশায়! এইবার তাহারা তাহাকে দলে লইয়া দীক্ষা দিতে ব্যগ্র হইয়া উঠিল।

মামা গৌরচরণ সদ্য পাঁচ বৎসর জেল খাটিয়া ঘরে ফিরিয়াছে, সে বোনকে ডাকিয়া গম্ভীরভাবে বলিল—নেতাইকে এবার বেরুতে বল। নেকাপড়া তো হ'ল।

গৌরচরণের গম্ভীর ভাবের কথার অর্থ—তাহার আদেশ। নিতাইয়ের মা আসিয়া ছেলেকে বলিল—তোর মামা বলছে, এইবার দলের সঙ্গে যেতে হবে তোকে।

নিতাই মায়ের দিকে কিছুক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া বলিল—ছি! ছি! ছি! গব্যধারিণী জননী হয়ে এই কথা তু বলছিস আমাকে!

নিতাইয়ের মা হতভম্ব হইয়া গেল।

নিতাইয়ের মামা চোখ লাল করিয়া আসিয়া সম্মুখে দাঁড়াইয়া বলিল—কি বলেছিস মাকে? হচ্ছে কি?

নিতাই তখন পুরানো খাতাটায় রামায়ণ দেখিয়া হাতের লেখা অভ্যাস করিতেছিল। সে নির্ভয়ে বলিল—লিখছি।

নিকছিস? গৌর আসিয়া খাতাটা ও বইখানা টান মারিয়া ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিল। নিতাইও সঙ্গে সঙ্গে উঠিয়া দাঁড়াইল। ধীরে ধীরে মামাকে অতিক্রম করিয়া সে খাতা ও বই কুড়াইয়া লইয়া নিজেদের পাড়া পরিত্যাগ করিয়া বাহির হইয়া পড়িল। গ্রাম খুঁজিয়া সেইদিনই সে ঘনশ্যাম গোঁসাইয়ের বাড়ীতে মাহিন্দারী চাকুরিতে বাহাল হইল।

গোঁসাইজী বৈষ্ণব মানুষ, ঘরে সন্তানহীনা স্থূলকায়া গৃহিণী, উভয়েরই দুগ্ধপ্রীতি মার্জ্জারের মত। ঘরে দুইটি গাই আছে, গাই দুইটি এতদিন রাত্রে স্বেচ্ছামত বিচরণ করিয়া প্রভাতে ঘরে আসিয়া দুধ দিত। কিন্তু ইদানীং কলিকাল অকস্মাৎ যেন পরিপূর্ণ কলিত্ব লাভ করিয়াছে, গ্রামের লোকের গো-ব্রাহ্মণে ভক্তি একেবারেই বিলুপ্ত হইয়াছে, তাঁহার গাভী দুইটিকে গত দুই মাসে পনেরো বার লোকে খোঁয়াড়ে দিয়াছে। সেই কারণে বাধ্য হইয়া গোঁসাইজী গাভীপরিচর্য্যার জন্য লোক বাহাল করিলেন। নিতাইয়ের সহিত সর্ত্ত হইল, সে গাভীর পরিচর্য্যা করিবে, বাসন মাজিবে, প্রয়োজনমত এখানে ওখানে যাইবে, রাত্রে বাড়ীতে প্রহরা দিবে। গোঁসাইজীর সুদি কারবারে মূল এক শত মন ধান এখন সাত শত মণে পরিণত হইয়াছে। ঘরের উঠানেও একটি ধানের স্তূপ। গোঁসাইজী স্ফীতোদর মরাই ও নিজের বিশীর্ণ দেহের দিকে চাহিয়া নিয়তই চিন্তায় পীড়িত হইতেছিলেন। বলিষ্ঠ যুবক নিতাইকে পাইয়া তিনি আশ্বস্ত হইলেন। নিতাই গোঁসাইজীর বাড়ীতেই বসবাস আরম্ভ করিল।

দিন কয়েক পরেই, সেদিন ছিল ঘন অন্ধকার রাত্রি। গভীর রাত্রে গোঁসাই ডাকিলেন —নিতাই!

বাহিরে খুটখাট শব্দে নিতাইয়ের ঘুম ভাঙিয়া গিয়াছিল, সে জাগিয়াই ছিল, সে ফিসফিস করিয়া বলিল—আজ্ঞে, আমি শুনেছি।

—গোলমাল করিস না, উঠে আয়। গোঁসাইজী অগ্রসর হইলেন। নিতাই শীর্ণকায় গোঁসাইজীর অকুতোভয়তা দেখিয়া শ্রদ্ধান্বিত হইয়া উঠিল। গোঁসাই আসিয়া নিঃশব্দে বাহিরের দুয়ার খুলিয়া বাহির হইলেন। বাহিরে চারজন লোক, তাহাদের মাথায় বোঝাই-করা চারিটা বস্তা। ভারে উত্তেজনায় লোকগুলি হাঁপাইতেছে এবং থরথর করিয়া

কাঁপিতেছে। দরজা খুলিতেই নিঃশব্দে লোক চারিজন ঘরে ঢুকিয়া উঠানের ধানের গাদায় বস্তা চারিটা ঢালিয়া দিল। রাত্রির অন্ধকারের মধ্যেও নিতাই ধানের সোনার মত রং প্রত্যক্ষ করিল। লোকগুলিকেও সে চিনিল, প্রত্যেকেই খ্যাতনামা ধানচোর।

সকালবেলাতেই জোড়হাত করিয়া গোঁসাইজীকে বলিল—প্রভু, আমি মাশায় কাজ করতে পারব না।

—পারবি না!

—আজ্ঞে না।

—এক পয়সা মাইনে আমি দেব না কিন্তু।

নিতাই কথার উত্তর করিল না। তাহার কাপড় ও দপ্তর লইয়া সে বাহির হইয়া পড়িল। আসিয়া উঠিল গ্রামের স্টেশনে।

স্টেশনের পয়েন্টস্‌ম্যান রাজা মুচি তাহার বন্ধু। রাজালাল একটু অদ্ভুত ধরণের লোক। বিগত মহাযুদ্ধের সময় তাহার ছিল তরুণ বয়স, সে ঘটনাচক্রে কুলি হিসাবে গিয়া পড়িয়াছিল মেসোপটেমিয়ায়। ফিরিয়া আসিয়া কাজ করিতেছে এই লাইট রেলওয়েতে। প্রাণখোলা দিলদরিয়া লোক, অনর্গল ভুল হিন্দী বলে, ঘড়ির কাঁটার মত ডিউটী করে, বার ছয়-সাত চা খায়, প্রচুর মদ খায়, ভীষণ চীৎকার করে, স্ত্রীপুত্রকে ধরিয়া ঠেঙায়। বিবাহ তাহার অনেক। এখানে আসিয়াই নূতন বিবাহ করিয়াছে। রাজার সঙ্গে নিতাইয়ের আলাপ অনেক দিনের, অর্থাৎ রাজা এখানে আসিবার পর হইতেই আলাপ, সে প্রায় তিন বৎসরের ঘটনা।

নিতাই সেদিনও স্টেশনে বেড়াইতে আসিয়াছিল, রাজার ছেলেরা ট্রেন আসিবার ঘণ্টা হইতেই হাঁকিতেছিল—হট যাও! হট যাও! লাইনের ধারসে হট যাও!

নিতাইয়ের ভারী ভাল লাগিয়াছিল, সে প্রশ্ন করিয়াছিল—বাহারে! কাদের ছেলে হে তুমি?

—আমি রাজার ছেলে।

—রাজার ছেলে! কেয়াবাৎ! তবে তো তুমি 'যোবরাজ'!

রাজা ছিল কাছেই, সে নিতাইয়ের কথা শুনিয়া হাসিয়াই সারা। সঙ্গে সঙ্গে সে নিতাইয়ের সঙ্গে আলাপ করিয়াছিল। ট্রেন চলিয়া যাইতেই রাজা নিতাইকে ধরিয়া লইয়া একেবারে তাহার কোয়ার্টারে হাজির করিয়াছিল। স্ত্রীকে বলিল—

আমার বন্ধুলোক! উমদা আদমী! ফটকেটাকে বলে—রাজার বেটা যোবরাজ। বলিয়া সে কি তাহার হা-হা করিয়া হাসি!

নিতাই উৎসাহভরে কবিয়ালদের নকল করিয়া গালে হাত দিয়া, মুখের সম্মুখে অপর হাতটি রাখিয়া ঈষৎ ঝুঁকিয়া রামায়ণ স্মরণ করিয়া গান ধরিয়াছিল—

রাজার বেটা যোবরাজা, তেজার বেটা মহাতেজা
খায় সে খাস্তা খাজা গজা
বিদিত ভো-মণ্ডলে!

রাজা লাফ দিয়া ঘরের ভিতর হইতে তাহার পৈত্রিক ঢোল ও তাহার নিজের কাঁসি বাহির করিয়া আনিয়া নিজে লইয়াছিল ঢোলটা—ছেলেটার হাতে দিয়াছিল কাঁসিটা। ওই কাঁসিটা রাজার বাবা রাজাকে কিনিয়া দিয়াছিল মহেশপুরের মেলায়। সেদিন দ্বিপ্রহরেই কবিগান জমিয়া উঠিয়াছিল রাজার ঘরে। নিতাই রাজার ছেলেকে 'যোবরাজ' বলিয়াই ক্ষান্ত হয় নাই, রাজার পরিবারের দিকে ফিরিয়া গাহিয়াছিল—

রাজার ঘরের ঘরণী যিনি—তিনি মহামান্যা রাণী—
তিনি খান বড় বড় ফেণী—
সর্ব্বলোকে বলে।

ঠিক এই সময় আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল আর একজন। পনের-ষোল বছরের একটি কিশোরী মেয়ে। মেয়েটির রং কালো, কিন্তু দীঘল দেহভঙ্গিতে ভুঁইচাপার সবুজ সরল ডাঁটার মত একটি অপরূপ শ্রী। মেয়েটির মাথায় কাপড়ের বিড়ার উপর তকতকে মাজা একটি বড় ঘটী, হাতে একটি ছোট গেলাস; পরনে দেশী তাঁতের মোটা স্থতার খাটো কাপড়। মোটা স্থতার ধপধপে খাটো কাপড়খানির আঁটো-সাঁটো বেষ্টনীর মধ্যে তাহার ছিপছিপে দীঘল কালো দেহখানি মানায় বড় চমৎকার। মেয়েটি রাজার শ্যালিকা, পাশের গ্রামের বধূ। সে এই বর্দ্ধিষ্ণু গ্রামখানিতে প্রত্যহ দুধের যোগান দিতে আসে; রাজার স্টেশনে গাড়ী আসে ঘড়ির কাঁটা ধরিয়া, আর এই মেয়েটি আসে—পশ্চিমসমীপবর্ত্তী দ্বিপ্রহরের স্থর্য্যের অগ্রগামিনী ছায়ার মত। মেয়েটির সরল ভীরু দৃষ্টিতে বিস্ময় যেন কালো জলের স্বচ্ছতার মত সহজাত। সবিস্ময়ে কিছুক্ষণ এই দৃশ্য দেখিয়া অকস্মাৎ মেয়েটি হাসিতে আরম্ভ করিয়াছিল—অসঙ্কোচ খিলখিল হাসি।

রাজার স্ত্রী কিন্তু কঠিন মেয়ে, সে বোনকে ধমক দিয়াছিল—হাসিস না ক্যাক ক্যাক ক'রে। বেহায়া কোথাকার!

মুহূর্ত্তে মেয়েটির হাসি বন্ধ হইয়া গিয়াছিল। কিন্তু সে রাগ করে নাই বা দুঃখিত

হয় নাই, স্বচ্ছন্দে শাসন মানিয়া লওয়ার মত বেত্রলতাসুলভ একটী নমনীয়তা তাহার স্বভাবজাত গুণ। দেহখানিই শুধু লতার মত নয়, মনও যেন তাহার দীঘল দেহের অনুরূপ।

নিতাইও থামিয়া গিয়াছিল। ধরতার সময় পার হইয়া গেল, তবু নিতাই আর গান ধরিল না দেখিয়া রাজা বাজনা বন্ধ করিল। সে মেয়েটিকে বলিল—দেখতা কেয়া ঠাকুরঝি ? হামারা মিতা। ওস্তাদ আদমী। হামারা নাম হ্যায় রাজা তো—কটকেকো নাম দিয়া যোবরাজা, তোমারা দিদিকো নাম দিয়া রাণী।—বলিয়াই অট্টহাসি।

সঙ্গে সঙ্গে ঠাকুরঝিরও আবার আরম্ভ হইয়া গিয়াছিল সেই হাসি। হাসিতে হাসিতে মাথার অবগুণ্ঠন খসিয়া গিয়াছিল, চোখ দিয়া টপটপ করিয়া জল ঝরিয়া পড়িয়াছিল, তবু তাহার সে হাসি থামে নাই।

হাসি থামাইয়া রাজা বলিয়াছিল—ওস্তাদ! ই কালকুটি হামারা ঠাকুরঝি হ্যায়। ইস্‌কো কেয়া নাম দেগা ভাই ?

নিতাই মুগ্ধ দৃষ্টিতে মেয়েটিকে দেখিতেছিল, তাহার সর্ব্বাঙ্গে কচিপাতার মত যে একটি কোমল ঘনশ্যাম শ্রী আছে, তাহা দেখিয়া তাহাকে লইয়া রহস্য করিতে নিতাইয়ের প্রবৃত্তি হয় নাই। সে বলিয়াছিল—ঠাকুরঝি, ভাই ঠাকুরঝি, ওর আর দোসরা নাম হয় না। আমার ঠাকুরঝিও ঠাকুরঝি, রাজার ঠাকুরঝিও ঠাকুরঝি।

রাজা নিতাইয়ের তর্ক যুক্তিতে অবাক হইয়া গিয়াছিল। গম্ভীরভাবে ঘাড় নাড়িয়া সে স্বীকার করিয়াছিল—হাঁ, হাঁ, ঠিক, ঠিক!

তাহার পর রাজা পাড়িয়াছিল মদের বোতল—আও ভাই ওস্তাদ!

নিতাই জোড়হাত করিয়া বলিয়াছিল—মাফ কর ভাই রাজন। ও দব্য আমি ছুঁই না।

—তব ? তব তুমি কি খায়েগা ভাই ?

ঠাকুরঝি বলিয়াছিল—দুধ খাবা, দুধ ? বলিয়া আবার সেই খিল-খিল হাসি।

নিতাই হাসিয়াছিল—তা খেতে পারি। এমন দব্য কি আছে ভোঁ-মণ্ডলে ? দেবদুল্লভ।

ঠাকুরঝি সত্যই বড় ঘটি হইতে মাপের গেলাসে পরিপূর্ণ এক গ্লাস দুধ ঢালিয়া নিতাইয়ের সম্মুখে নামাইয়া দিয়া তাহার অভ্যস্ত দ্রুতগমনে প্রায় পলাইয়া গিয়াছিল। এ সব পুরানো কথা।

রাজা এখন তাহার ঘনিষ্ঠ বন্ধু, গুণমুগ্ধ ভক্ত।

গোঁসাইজীর চাকরিতে জবাব দিয়া নিতাই আসিয়া উঠিল স্টেশনে। সমস্ত শুনিয়া রাজা বলিল—ঠিক কিয়া ওস্তাদ। বহুৎ ঠিক কিয়া ভাই।

—আমাকে কিন্তু তোমার এইখানে একটু জায়গা দিতে হবে।

—আলবৎ দেগা। জরুর দেগা।

—এইখানে থাকব, আর ইস্টিশানে মোট বইব। তাতেই আমার একটা পেট চ'লে যাবে।

রেলওয়ে কনস্ট্রাকশনের সময় এই স্টেশনটি একটি প্রধান কর্ম্মকেন্দ্র ছিল, সে সময় প্রয়োজনে অনেক ঘরবাড়ী তৈয়ারি হইয়াছিল, সেগুলি এখন পড়িয়াই আছে। তাহারই একটাতে রাজা ওস্তাদের বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিল। নিতাই এখন স্টেশনে কুলিগিরি করে, ভদ্রলোকজনের মোট তুলিয়া দেয়, নামাইয়া লয়, গ্রামান্তরেও মোট বহিয়া লইয়া যায়, উপার্জ্জন তাহার ভালই হয়। স্টেশনে মাল নামাইতে-চড়াইতে মজুরি দুই পয়সা, এই গ্রামের মধ্যে যাইতে হইলে চার পয়সা, গ্রামান্তরে হইলে রেট দূরত্ব অনুযায়ী। অন্য কুলিদের অপেক্ষা নিতাইয়েরই উপার্জ্জন বেশী। তাহার সহায় স্বয়ং রাজা।

স্টেশন-স্টলটি তাহাদের একটি আড্ডা; স্টলের ভেণ্ডার 'বেনে মামা' রহস্য করিয়া নিতাইকে বলে—রাজ-বয়স্য।

মামার দোকানে সজীব-বিজ্ঞাপন বাতব্যাধিতে আড়ষ্ট বিপ্রপদ বলে—বয়স্য কি রে বেটা, বয়স্য কি? সভাকবি, রাজার সভাকবি।

নিতাই বিপ্রপদের পদধূলি লইয়া 'সুপ' শব্দ করিয়া মুখে দেয়, ভারী খুশি হইয়া উঠে। বিপ্রপদকে বড় ভাল লাগে তাহার। এত যন্ত্রণাদায়ক অসুখের মধ্যেও এমন আনন্দময় লোক দেখা যায় না। বাতব্যাধিগ্রস্ত বিপ্রপদ সকালে উঠিয়াই কোনমতে খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে স্টেশনে আসিয়া আড্ডা লয় মামার দোকানে, অনর্গল বকে, লোকজনকে চা খাইতে উৎসাহিত করে। দেহ তাহার যত আড়ষ্ট, মুখ তদপেক্ষা অনেক সক্রিয়। রসিক ব্যক্তি, 'বসুধৈব কুটুম্বকম্'। সকালবেলায় আসিয়া বিপ্রপদ বেলা বারোটায় বাড়ী ফিরে খাইতে। আবার খানিকটা ঘুমাইয়া, বেলা তিনটায় খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে স্টেশনে আসিয়া বসে, যায় রাত্রি সাড়ে দশটার ট্রেন পার করিয়া তবে। বিপ্রপদের সঙ্গে নিতাইয়ের জমে ভাল। নিতাই পদধূলি লইলে, বিপ্রপদ স্বরচিত সংস্কৃত শ্লোকে আশীর্ব্বাদ করে—

ভব কপি, মহাকপি দগ্ধানন সলাঙ্গুল—

হাত জোড় করিয়া নিতাই বলে—প্রভু, কপি মানে আমি জানি।

বিপ্রপদ হাসিয়া ভুল স্বীকার করিয়া বলে—ও—। কপি নয়, কপি নয়, কবি, কবি। আমারই ভুল। আচ্ছা, কবি তো তুই বটিস, কই বল দেখি—'শকুনি খেললে পাশা, রাজ্য পেলে দুর্য্যোধন, বাজী রাখলে যুধিষ্ঠির কিন্তু ভীমের বেটা ঘটোৎকোচ মরল কোন্ পাপে ?'

নিতাই সঙ্গে সঙ্গে উঠিয়া দাঁড়াইয়া কবিগান আরম্ভ করিয়া দেয়। বাঁ হাত গালে চাপিয়া মুখের সম্মুখে ডান হাত আড়াল দিয়া ঈষৎ ঝুঁকিয়া সুর ধরিয়া আরম্ভ করে—আহা—আ হা রে—

রাজা ভাবে, ঢোলকটা পাড়িয়া আনিবে না কি ? কিন্তু সে আর হইয়া উঠে না। বারোটার ট্রেনের ঘণ্টা পড়ে।

দূরান্তরের যাত্রী অধিকাংশই পায় নিতাই। স্টেশনের জমাদার রাজার সুপারিশে যাত্রীরা নিতাইকে লইয়া থাকে। নিতাইয়ের ব্যবহারও তাহারা পছন্দ করে।

মজুরির দরদস্তুর করিতে নিতাই সবিনয়ে বলে—প্রভু, গগনপানে দিষ্টি করেন একবার। গ্রীষ্মকাল হইলে বলে—দিনমণির কিরণটা একবার বিবেচনা করেন। বর্ষায় বলে—কিষ্ণবন্ন মেঘের একবার আড়ম্বরটা দেখেন কত্তা। শীতে বলে—শৈত্যের কথাটা একবার ভাবেন বাবু।

মামার দোকানে বসিয়া বিপ্রপদ নিতাইকে সমর্থন করে, বলে—আজ্ঞে হ্যাঁ। আপনাদের তো সব দোশালা আছে। ওর যে একশালাও নাই। ওর কষ্টের কথাটা বিবেচনা করুন একবার।

দ্বিপ্রহরে বাহিরে যাইতে হইলে নিতাই রাজাকে বলিয়া যায়, রাজন, ঠাকুরঝি এলে দুধটা নিয়ে রেখো।

এখানে থাকিলে বারোটার ট্রেনটি চলিয়া গেলেই নিতাই একটু আগাইয়া গিয়া পয়েন্টের কাছে অথবা লাইনের ধারে কৃষ্ণচূড়াগাছটির ছায়ায় গিয়া দাঁড়ায়। রোদ পড়িয়া লোহার লাইনের উপরের ঘষা অংশটা সুদীর্ঘ রেখায় ঝকমক করে, নিতাই নিবিষ্ট মনে যেখানে লাইনটা বাঁক ঘুরিয়াছে, সেইখানে দৃষ্টি আবদ্ধ করিয়া দাঁড়ায়। সহসা শুভ্র একটি চলন্ত রেখার মত রেখা দেখা যায়, রেখাটির মাথায় একটি স্বর্ণবর্ণ বিন্দু। ক্রমশ সেটি পরিণত হয় একটি মানুষে। তাঁতের মোটা সুতার খাটো কাপড়খানি আঁটসাঁট করিয়া পরা একটি কালো দীর্ঘাঙ্গী মেয়ে। তাহার মাথায় একটি তক-তকে মাজা সোনার বর্ণের পিতলের ঘটি। ঘটিটি সে ধরে না—এক

হাতে মাপের গেলাস, অন্য হাতটি দোলে, সে দ্রুতপদে অবলীলাক্রমে চলিয়া আসে। মেয়েটি চলে দ্রুত ভঙ্গিতে, কথাও বলে দ্রুত ভঙ্গিতে। মেয়েটি সেই ঠাকুরঝি।

নিতাই নেশা করে না; কিন্তু দুধ তার প্রিয়বস্তু। চায়েও আসক্তি তাহার ক্রমশ বাড়িতেছে। ঠাকুরঝির কাছে সে নিত্য একপোয়া করিয়া দুধের যোগান লইয়া থাকে। দুধ আসিলেই চায়ের জল চড়াইয়া দেয়।

স্টেসনে নিত্য নানা স্থানের লোকজনের আনাগোনা। আশপাশের খবর স্টেশনে বসিয়াই পাওয়া যায়। খবরের মধ্যে কবিগানের খবর থাকিলে নিতাই উল্লসিত হইয়া উঠে। সেদিন সন্ধ্যাতেই লালপেড়ে পরিষ্কার ধুতি ও হাতকাটা জামাটি পরিয়া, মাথায় এক পাগড়ি বাঁধে। গুন-গুন করিয়া কবিগান গাহিতে গাহিতে রাজাকে আসিয়া তাগাদা দেয়। মিলিটারী রাজা সাড়ে দশটার ট্রেন পার করিয়াই বলে—ফাইভ মিনিট ওস্তাদ।

পাঁচ মিনিটও তাহার লাগে না, তিন মিনিটের মধ্যেই রেলওয়ে কোম্পানির দেওয়া নীল কোর্ত্তাটা গায়ে চড়াইয়া স্টেশনের একমুখো বাতি ও লাঠি হাতে বাহির হইয়া পড়ে। ভোর হইবার পূর্ব্বেই আবার ফিরিয়া আসে। শুধু কবিগানই নয়, যাত্রাগান, মেলা—এ সবই নিতাইয়ের ভাল লাগে। আলোকোজ্জ্বল উৎসবমুখর রাত্রির মধ্যেই যদি সমস্ত জীবনটা নিতাইয়ের কাটিয়া যায়, তবে বড় ভাল হয়।

হঠাৎ চণ্ডীমায়ের মেলাতে নিতাই সত্য সত্যই কবিয়াল হইয়া উঠিল।

চার

কবিগানের পাল্লার পর চণ্ডীমায়ের প্রসাদী সিন্দূরলিপ্ত শুকনো বেলপাতার মালা গলায় দিয়া নিতাই ফিরিল—সেকালের দিগ্বিজয়ী কবিদের মত। মনে মনে সে বেশ অনুভব করিতেছিল—সে একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি, সে কবি।

সমস্ত পথটা তাহার আত্মীয়স্বজন, যাহারা এতদিন কোন সম্পর্কই রাখে নাই, তাহারা তাহাকে ঘিরিয়া কলরব করিতেছিল। সে সব কিন্তু কিছুই তাহার কানে আসিল না। রাজা ছিল তাহার গা-ঘেঁষিয়া। নিতাইয়ের গৌরবে বুক তাহার ফুলিয়া উঠিয়াছে, সে পথ চলিতেছিল সভাকবির গৌরবতৃপ্ত রাজার মতই। অনর্গল সে লোকজনকে সাবধান করিতেছিল—হট যাও, হট যাও। এতনা নগিচমে কেঁও আতা হ্যায়? হট যাও। উৎসাহের প্রাবল্যে আজ তাহার ভুল-হিন্দী বলার মাত্রা বাড়িয়া গিয়াছে। রাজার স্ত্রী ও ঠাকুরঝি একটু পিছনে আসিতেছিল। নিতাইয়ের আত্মীয়দের সহিত রাজার বউ গলগল করিয়া বকিতেছিল—তোমরা তো মা তাড়িয়ে দিয়েছিলে। এই তো

ইষ্টিশান তোমাদের বাড়ীর দুয়োর থেকে দেখা যায়, কই, কোন দিন নেতাইয়ের খোঁজ করেছ?

ঠাকুরঝি মেয়েটি অন্ধকারের মধ্যে ভীরু দৃষ্টি মেলিয়া যে যখন কথা বলিতেছিল, তাহার মুখের দিকে চাহিতেছিল। পাশের গ্রামে তাহার শ্বশুরবাড়ী, মেলা উপলক্ষে সে আজ দিদির বাড়ী আসিয়াছে, রাত্রে এইখানে থাকিবে, ভোরে উঠিয়া চলিয়া যাইবে। তাহার বড় ইচ্ছা হইতেছিল ওস্তাদকে কয়টি কথা বলিতে—তুমি এত সব কি ক'রে শিখলে? দিদির ঘরে গায়েন করতে, আমরা হাসতাম। বাবা, এত লোকের ছামুতে—ওই এত বড় কবিয়ালের সঙ্গে—বাবা! কল্পনামাত্রেই রাত্রির অন্ধকার আবরণের মধ্যে অপরের অজ্ঞাতে মধ্যে মধ্যে তাহার দৃষ্টি বিস্ময়ে বড় হইয়া উঠিতেছিল।

চণ্ডীতলা হইতে ডোমপাড়ার ভিতর দিয়াই স্টেশনের পথ। নিতাইয়ের আত্মীয়-স্বজন আজ তাহাকে আহ্বান করিল—বাড়ী আয়।

নিতাইয়ের মা এখানে আর থাকে না, সে তাহার কন্যাকে আশ্রয় করিয়া গ্রামান্তরে জামাইয়ের বাড়ীতে থাকে। জামাই এ অঞ্চলের বিখ্যাত দাঙ্গাবাজ লাঠিয়াল, রাত্রে ডাকাতিও করে, গোপনে মদ চোলাই করিয়া বিক্রয় করে; ভাঙা ঘরে বসিয়া পাকী মদ খায়, সের দরুনে মাছ কেনে। নিতাইয়ের মা ভাতের অজুহাতে—ওই পাকী মদ ও মাছের প্রলোভনেই সেখানে এখন বাস করিতেছে। নিতাই একবার নিজের ভাঙা ঘরটার দিকে চাহিয়া একটু হাসিল, বলিল—না, আমি বাসাতেই যাই।

রাজা খানিকটা আসিয়া গদগদ কণ্ঠে বলিল—তুম সাচ্চা আদমী ওস্তাদ! হামলোককে ছোড়কে তুম উলোককো পাশ নেহি গিয়া।

নিতাই আবার একটু হাসিল।

ভিড় তখন কমিয়া গিয়াছে। সঙ্গের লোকজন আপন আপন বাড়ীতে ঢুকিয়া পড়িয়াছে, নিতাই ও রাজার পরিবারবর্গ কেবল স্টেশনের পথে চলিয়াছে। স্টেশনে আসিয়া রাজা বলিল - কুছ খা লেও ভাই ওস্তাদ।

আপনার আলোটি জ্বালিতে জ্বালিতে নিতাই সংক্ষেপে বলিল—না। সে সঙ্গে সঙ্গেই বিছানায় গড়াইয়া পড়িল। সে ভাবিতেছিল, এ অঞ্চলের প্রসিদ্ধ কবিয়াল তারণ মণ্ডলের কথা। তারণ কবি যে আসরে গান করিয়াছে, সে কি লোক! হাজারে হাজারে, কাতারে কাতারে! সে যেবার প্রথম তারণ কবির গান শোনে সেবারকার সে ছবি এখনও তাহার মনে জলজল করিতেছে। এই চণ্ডীমায়ের মেলাতেই, সে কি জনতা, আর সে কি গোলমাল! তখন মেলারও সে কি জাঁকজমক! চার-পাঁচটা

চাপরাসীই তখন মেলার শান্তিশৃঙ্খলা রক্ষার জন্য বাহাল করা হইত। তাহাদের সঙ্গে থাকিত বাবুদের দারোয়ান এবং দুই-চারিজন বাবু। তবু সে কি গোলমাল! নিতাইয়ের স্পষ্ট মনে পড়িল কলরবমুখর জনতা মুহূর্তে স্তব্ধ হইয়া গেল, আলোকোজ্জ্বল আসরের মধ্যে তখন তারণ কবি আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। এই লম্বা মানুষটি, পাকা চুল, পাকা গোঁফ, কপালে সিন্দুরের ফোঁটা, বুকে সারি-সারি মেডেল, লাল চোখ, তারণ কবির আবির্তাবেই সব চুপ হইয়া গিয়াছিল। আসরের একদিকে বেঞ্চ পাতিয়া গ্রামের বাবুরা বসিয়া ছিল, তাহারা পর্য্যন্ত চুপ করিয়া ছিল। আর সে কি গান! তারপর হইতে আশেপাশে যখন যেখানে তারণ কবির গান হইয়াছে, সেইখানেই সে গিয়াছে। একবার ভিড়ের মধ্যে হাত বাড়াইয়া সে তারণ কবির পায়ের ধুলাও লইয়াছিল। তখন হইতেই তাহার সাধ, কবিয়াল হইবে। ইচ্ছা ছিল, তারণ কবির দলে দোয়ারকি করিয়া সে কবিগান শিখিবে। কিন্তু তারণ মরিয়া গেল। মদ খাইয়াই নাকি তারণ মরিয়াছে। তারণ কবির ওই একটা বড় দোষ ছিল, ভীষণ মদ খাইত। আসরেই তাহার বোতল গেলাস থাকিত, সকলের সম্মুখেই সে মধ্যে মধ্যে জল বলিয়া মদ খাইত।

তারণ কবি তাহারই কপালদোষে মরিয়া গেল। এমন গুরু না হইলে কি ভাল কবি হওয়া যায়! শাস্ত্রের কি অন্ত আছে? পড়িয়া শুনিয়া সে সব শিখিতে গেলে এ জীবনে আর কবিয়াল হওয়া হইয়া উঠিবে না। রামায়ণ মহাভারত—। সহসা তাহার মনে হইল, মহাদেব আজ রামায়ণ হইতে যে প্রশ্নটা লইয়া তাহাকে অপদস্থ করিয়াছে, সেটা কিন্তু ঠিক নয়। সঙ্গে সঙ্গে সে উঠিয়া বসিল। ছোট একটি চৌকীর উপর অতি যত্নের সহিত রঙীন কাপড়ে বাঁধিয়া সে তাহার পুঁথিগুলি রাখিয়া থাকে। দপ্তর খুলিয়া সে বাহির করিল রামায়ণ। দপ্তরের মধ্যে এক গাদা বই, পাঠশালা হইতে আজ পর্য্যন্ত সংগৃহীত বইগুলি সবই তাহার আছে। পথে ঘাটে উড়িয়া বেড়ায় যে সমস্ত ছেঁড়া কাগজ ও বইয়ের পাতা, তাহারও অনেক সংগ্রহ নিতাই করিয়াছে। কাগজ দেখিলেই সে কুড়াইয়া লইয়া পড়িতে চেষ্টা করে। যাহা ভালো লাগে তাহাই সে সযত্নে রাখিয়া দেয়। বইয়ের সংগ্রহও তাহার কম নয়—কৃত্তিবাসী রামায়ণ, কাশীদাসের মহাভারত, কৃষ্ণের শত নাম, শনির পাঁচালী, মনসার ভাসান, গঙ্গামাহাত্ম্য, স্থানীয় থিয়েটার-ক্লাবের ফেলিয়া-দেওয়া কয়েকখানা ছেঁড়া নাটক; ইহা ছাড়া তাহার পাঠশালার বইগুলি—প্রথম ভাগ হইতে আরম্ভ করিয়া প্রত্যেকখানি আছে। আর আছে খান দুইয়েক খাতা, ভাঙা স্লেট-পেন্সিল, একটা লেডপেন্সিল, ছোট একটুকরা লাল-নীল পেন্সিল।

সেই রাত্রেই সে নিবিষ্ট মনে রামায়ণের পাতা উল্টাইতে আরম্ভ করিল। ঠিক, মহাদেব তাহাকে ধাপ্পা মারিয়াই হার মানাইয়াছে। ভুল তাহার নয়, মহাদেবই ভুলকে সত্য করিয়াছে মুখের জোরে। সে আবার শুইয়া পড়িল। কিন্তু ঘুম কিছুতেই আসে না। রগের শিরা দুইটা উত্তেজনায় দপ দপ করিয়া লাফাইতেছে, কানের পাশে এখন যেন ঢোল কাঁসির শব্দ উঠিতেছে।

মিলিটারী রাজা রাত্রি জাগিয়াও ঠিক সকাল ছয়টায় উঠিয়াছে। সাতটায় ফাস্ট ট্রেণ এ স্টেশন অতিক্রম করিবে। যুদ্ধ-ফেরত রাজা চা খায়, চায়ের জল চড়াইয়া দিয়া স্টেশনে ঝাড়ু দিয়া আসিয়া ওস্তাদকে ডাকিল—ওস্তাদ! ওস্তাদ!

ওস্তাদ না হইলে চা খাইয়া সুখ হয় না। বউটা এখনও ঘুমাইতেছে। ঠাকুরঝি কিন্তু ঠিক আছে, সে রাজার পূর্ব্বেই উঠিয়া চলিয়া গিয়াছে। ঠাকুরঝির ননদটা বড় দজ্জাল। এমন মেয়েটিকে বড় কষ্ট দেয়। রাজা মনে মনে এখন আপ্‌সোস করে,—বউটাকে কেন সে বিবাহ করিল! ঠাকুরঝিকে বিবাহ করিলেই ভাল হইত; ছিপছিপে দ্রুতগামিনী দ্রুতহাসিনী মিষ্ট স্বভাবের ঠাকুরঝি তাহার মুখরা দিদির চেয়ে অনেক ভাল।

নিতাইয়ের সাড়া না পাইয়া রাজা আবার ডাকিল—হো ওস্তাদ!

এবার নিতাই জড়িত স্বরে উত্তর দিল—উঁহু।

—চা হো গেয়া ভেইয়া।

—উঁহু।

—আরে ট্রেন আতা হায় ভেইয়া!

—উঁহু।

রাজা নিরুপায় হইয়া চলিয়া গেল। আর ডাকিল না। কাল রাত্রে ওস্তাদের বড়ই খাটুনি গিয়াছে, আজ বেচারার একটু ঘুম দরকার।

* * * *

বেলা নয়টা নাগাদ নিতাই উঠিল।

গত রাত্রির কথা স্মরণ করিয়া একটু মৃদু হাসি তাহার মুখে ফুটিয়া উঠিল। কলিকাতার চাকুরে বাবুটি তাহাকে দেখিলেই বলিবেন—তুই একজন কবি, অ্যাঁ! তাহার পর ইংরেজীতে কি একটা!

ভূতনাথবাবু তারিফ করিবেন—বাহবা রে নিতাই, বাহবা!

ক্রমে ক্রমে সমস্ত গ্রামের লোকেরই সপ্রশংস বিস্মিত দৃষ্টি তাহার মনশ্চক্ষে ভাসিয়া উঠিল। বিপ্রপদ ঠাকুর একবারে কোলাহল জুড়িয়া দিবে। স্টেশনে গিয়া বসিলেই হয়। এই সাড়ে নয়টার ট্রেনেই বিপ্রপদের মারফৎ তাহার কবিখ্যাতি একেবারে কাটোয়া পর্য্যন্ত পৌঁছিয়া যাইবে। বাসী দুধ চা চিনি ঘরেই আছে, তবু সে ঘরে চা তৈয়ারি করিল না। চায়ের মগটি হাতে করিয়া শিথিল মন্থর পদক্ষেপে স্টেশন-স্টলে আসিয়া উপস্থিত হইল, মুখে সেই মৃদু হাসি।

বিপ্রপদ হৈ-হৈ করিয়া উঠিল—এই! এই! এই! চোপ, সব চোপ! তারপর তাহাকে সম্বর্দ্ধনা করিয়া বলিল—বলিহার বেটা বলিহার! জয় রামচন্দ্র! কাল নাকি সত্যি সত্যিই লঙ্কাকাণ্ড করে দিয়েছিস শুনলাম। ভ্যালা রে বাপ কপিবর!

আশ্চর্য্যের কথা, বিপ্রপদের রসিকতায় নিতাই আজ অত্যন্ত আঘাত অনুভব করিল, মুহূর্ত্তে সে গম্ভীর হইয়া গেল।

বিপ্রপদের সেদিকে খেয়াল নাই, সে উত্তর না পাইয়া আবার বলিল—ধুয়ো কি ধরেছিলি বল দেখি? 'উঁপ! উঁপ! খ্যাকোর—খ্যাকোর উঁপ! চুপ রে বেটা মহাদেবা চুপ!' না কি! বলিয়া সে টানিয়া টানিয়া হাসিতে লাগিল।

নিতাই এবার হাতজোড় করিয়া গম্ভীরভাবে বলিল—আজ্ঞে প্রভু, মুখ্যুসুখ্যু মানুষ, ছোট জাত, বাঁদর, উল্লুক, হনুমান, জাম্বুবান যা বলেন তাই সত্যি। বলিয়াই সে আপনার মগটি বাড়াইয়া ভেণ্ডার বেনে মামাকে বলিল—কই গো, দোকানী মশায়, চা দেন দেখি! সঙ্গে সঙ্গে সে পয়সার খুঁট খুলিতে আরম্ভ করিল।

দোকানী বেনে মামা মগে চা ঢালিয়া দিয়া বলিল—মাতুল না ব'লে দোকানী বলছিস, সম্বন্ধ ছাড়ছিস না কি নিতাই?

নিতাই কথার উত্তর দিল না। বেনে মামাই বলিল—নাঃ, কাল নেতাই আমাদের আচ্ছা গান করেছে, ভাল গান করেছে!

বিপ্রপদ তাড়াতাড়ি একটা ঘুঁটে লইয়া একটা ছিদ্র করিয়া তাহাতে দড়ি পরাইতে পরাইতে বলিল—আজ কপিবরকে একটা মেডেল দোব।

নিতাই চায়ের মগটি হাতে উঠিয়া চলিয়া গেল।

ওদিকে সাড়ে নয়টার ট্রেনটা প্ল্যাটফর্মে আসিয়া পড়িয়াছে। বিপ্রপদ ও বেনে মামা মনে করিল নিতাই মোটের সন্ধানে গেল। কিন্তু প্ল্যাটফর্ম হইতে রাজা হাঁকিতেছিল—ওস্তাদ! ওস্তাদ!

সাড়া না পাইয়া রাজা নিজেই ছুটিয়া আসিল। বেনে মামা বলিল—এই তো উঠে গেল। প্ল্যাটফর্মে যায় নাই?

রাজা প্রথমে অবশ্য খানিকটা হাসিল, তারপর কিন্তু বলিল—উ বাত তুমারা ঠিক নেহি হ্যায়। সন্‌সারমে আয়কে সাদী নেহি করেগা তো কেয়া করেগা?

নিতাই এবার বলিল—তুমি ক্ষেপেছ রাজন! বিয়ে ক'রে বিপদে পড়ব শেষে! আমাদের জাতের মেয়ে কখনও বিত্তের মর্ম্ম বোঝে? কেবলই খ্যাচ-খ্যাচ করবে দিনরাত। তা ছাড়া ধরগা তোমার— : কথা শেষ হইবার পূর্ব্বেই নিতাই ফিক করিয়া হাসিয়া ফেলিল।

ভ্রূ নাচাইয়া রাজা প্রশ্ন করিল—উ কেয়া বাত ওস্তাদ?

—ধরগা তোমার, তেমন মনে-ধরা কনেই বা কোথায় হে? বেশ মৃদু হাসিয়া নিতাই বলিল—আমরা হলাম কবিয়াল লোক। আমাদের চোখ তো যাতে তাতে ধরবে না রাজন!

রাজা এবার হাসিয়া গড়াইয়া পড়িল। রাজার উচ্চ হাসি উৎকট এবং বিকট। রাজার সে হাসি কিন্তু অকস্মাৎ আবার বন্ধ হইয়া গেল। গম্ভীর হইয়া সে বার বার ঘাড় নাড়িয়া সত্যটা স্বীকার করিয়া বলিল—ঠিক বাত ওস্তাদ, ঠিক বাত বোলা হ্যায় ভাই। লড়াইমে গিয়া দেখা, আ-আ হা একদম ফুলকে মাফিক জেনানা। ইরাণী দেখা হ্যায় ওস্তাদ, ইরাণী? ওইসা, লেকিন উসসে তাজা। রাজার কথা ফুরাইয়া গেল, কিন্তু স্মৃতির ছবি ফুরাইল না; সে উদাস দৃষ্টিতে জানালার ভিতর দিয়া চাহিয়া রহিল বিস্তীর্ণ কৃষিক্ষেত্রের দিকে। নিতাইও চাহিয়া ছিল জানালার ভিতর দিয়া, রেললাইন দুইটির সমান্তরাল শাণিত দীপ্তি দুইটি বাঁকের মুখে যেখানে একটি বিন্দুতে এক হইয়া মিলিয়াছে, সেই বিন্দুর দিকে। সহসা এক সময় সেই বিন্দুটির উপর জাগিয়া উঠিল চলন্ত সাদা কাশফুলের মত একটি রেখা, রেখাটির মাথায় একটি স্বর্ণবিন্দু যেন ঝকমক করিয়া উঠিতেছে মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে!

তাহাদের এই নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিল রাজার স্ত্রীর তীক্ষ্ণ উচ্চ কণ্ঠ। রাজার স্ত্রী চীৎকার করিতেছে। রাজা এখানে বসিয়া আড্ডা দিতেছে, তাই সে আপনার অদৃষ্টকে উপলক্ষ্য রাখিয়া রাজাকে লক্ষ্য করিয়া বাছিয়া বাছিয়া শাণিত বাক্যবাণ নিক্ষেপ করিতেছে।

—ছি রে, ছি রে আমার অদেষ্ট। সকালবেলা থেকে বেলা দুপুর পর্য্যন্ত মানুষের ঘর ব'লে মনে থাকে না। অদেষ্টে আমার আগুন লাগুক, পাথর মেরে এমন নেকাকে ভেঙে কুচিকুচি করি আমি।

রাজার মুখখানা ভীষণ হইয়া উঠিল, সে উঠিয়া পড়িল। নিতাই শঙ্কিত হইয়া বলিল—কোথা যাচ্ছ?

—আঁতা হ্যায়। আভি আতা হ্যায়। সে চলিয়া গেল।

রাজন! রাজন! নিতাই পিছন পিছন আসিয়া দুয়ারে দাঁড়াইয়া রহিল। কিছুক্ষণ পরই রাজা ফিরিল সেই উচ্চ হাসি হাসিতে হাসিতে। হাসিয়া সে মাটির উপর শুইয়া পড়িল। নিতাই প্রশ্ন করিল—হ'ল কি ?

রাজার হাসিতে মুহূর্তের জন্যও ছেদ পড়ে না, এমন হাসির মধ্যে কথাও বলা যায় না। তবুও বহুকষ্টে রাজা বলিল—ভাগা হ্যায়। মাঠে মাঠে—। সঙ্গে সঙ্গে সেই উৎকট উচ্চহাসি। নিতাই বুঝিল। গালি-গালাজমুখরা রাজার স্ত্রী রুদ্র মূর্ত্তিতে রাজাকে আসিতে দেখিয়াই বিপরীত দিকের দরজা দিয়া বাহির হইয়া ছুটিয়া পলাইয়াছে। রাজা উঠিয়া দাঁড়াইয়া, ফিরিয়া দেখার অভিনয় করিয়া বলিল—এইসা করকে দেখতা; হাম এক পাঁও গিয়া তো ফিন দৌড় লাগায়া। অর্থাৎ রাজাকে এক পা অগ্রসর হইতে দেখিলেই সে দৌড় দিয়াছে, আবার কিছুদূর গিয়া ফিরিয়া দেখিয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে রাজার হাসি আবার উথলিয়া উঠিল।

এই মুহূর্তটিতেই বাড়ীর মধ্যে আসিয়া প্রবেশ করিল ঠাকুরঝি। পরনে ক্ষারে ধোয়া ধবধবে মোটা সুতার খাটো কাপড়, মাথায় পরিচ্ছন্ন মাজা পিতলের ঘটি। দ্বিপ্রহরের রৌদ্রে সেটি সোনার মত ঝকঝক করিতেছে।

নিতাই সাদরে আহ্বান করিল—এস, ঠাকুরঝি এস।

ঠাকুরঝি রাজাকে এমন ভাবে হাসিতে দেখিয়া বিপুল কৌতুক অনুভব করিল। সকৌতুকে সে রাজার দিকে আঙুল দেখাইয়া নিতাইকে প্রশ্ন করিল তাহার স্বভাবগত বাচনভঙ্গিতে—জামাই এত হাসছে কেনে ?

—সুধাও তাই জামাইকে। নিতাই হাসিল।

—অই! অই! ই কি হাসি গো! এমন ক'রে হাসছ কেনে গো জামাই ? সঙ্গে সঙ্গে হাসির ছোঁয়াচ তাহাকেও লাগিয়া গেল। সেও হাসিতে আরম্ভ করিল—হি-হি-হি! হি-হি-হি! অত্যন্ত দ্রুত মৃদু ধাতব ঝঙ্কারের মত হাসি।

রাজার হাসি অকস্মাৎ থামিয়া গেল। তাহার দিকে আঙুল দেখাইয়া হাসার জন্য সে ভীষণ চটিয়া উঠিয়াছে। তাহার মনে হইল মেয়েটা তাহাকে ব্যঙ্গ করিতেছে। ভীষণ চটিয়া রাজা ধমক দিয়া উঠিল—অ্যাও!

ধমক খাইয়া মেয়েটির হাসি বাড়িয়া গেল।

রাজা বলিল—আলকাতরার মত রঙ, সাদা দাঁত বের ক'রে হাসছে দেখ! লজ্জা নাই তোর!

এবার মেয়েটি যেন মার খাইয়া স্তব্ধ হইয়া গেল। কয়েক মুহূর্ত স্তব্ধ থাকিয়া

অত্যন্ত ব্যস্ততা প্রকাশ করিয়া সে বলিল—দাও বাপু, দুধ দাও। আমার দেরি হয়ে গেল। গেরস্তরে বকবে।

রাজা বলিল—তোকেও একদিন ঠ্যাঙানি দিতে হবে দেখছি। দিদির মত মাঠে মাঠে—। আবার সে হাসিতে আরম্ভ করিল।

ঠাকুরঝি কিন্তু এবার হাসিল না। সে নীরবে নতমুখে ঘটি হইতে মাপের গ্লাসে দুধ ঢালিয়া গ্লাসটি পরিপূর্ণ করিয়া ধরিয়া আবার তাগাদা দিল—কই গো, কড়াই পাত।

নিতাই ব্যস্ত হইয়া দুধের কড়াটি পাতিয়া দিয়া বলিল—রাগ করলে ঠাকুরঝি? না না, রাগ ক'রো না।

ঠাকুরঝি উত্তর দিল না, মাপা দুধ ঢালিয়া দিয়া সে নীরবেই চলিয়া গেল। পিছন হইতে রাজা এবার রসিকতা করিয়া বলিল—ওঃ, ঠাকুরঝির আমার ডাকগাড়ি গেল। বাবারে, বাবারে, ছুটছে! পোঁ—ভস-ভস ভস-ভস। বাবা রে!

ঠাকুরঝি কিন্তু ফিরিয়াও চাহিল না।

নিতাই বলিল—না রাজন। এ পোকার বাক্য বলা তোমার উচিত হ'ল না।

কিন্তু রাজা সে কথা স্বীকার করিল না। কিসের অনুচিত! সে ফুৎকারে আপনার অন্যায় উড়াইয়া দিল—ধে—ৎ। সঙ্গে সঙ্গেই সে উঠিয়া পড়িল। দেড়টার গাড়ীর ঘণ্টা দিতে হইবে। এই সময়টি নির্ণয়ে ঠাকুরঝি তাহার সিগনাল। ঠাকুরঝি দুধ দিয়া গ্রামে গেলেই সে স্টেশনের দিকে রওনা হয়, মধ্যপথেই শুনিতে পায় মাষ্টার হাঁকিতেছে—রাজা!

রাজা নিত্য সাড়া দেয়, আজও দিল—হাজির হ্যায় হুজুর।

নিতাই উনান ধরাইতে বসিল। আর একবার চা খাইতে হইবে। দোকানী বণিক মাতুলের মাপা চায়ে তাহার নেশা হয় নাই। তা ছাড়া শরীরটাও আজ ভাল নাই। গত রাত্রির পরিশ্রমে, উত্তেজনায়, অনিদ্রায়—আজ অবসাদে দেহ যেন ভাঙিয়া পড়িতেছে। মাথা ঝিমঝিম করিতেছে। কানের মধ্যে এখনও যেন ঢোল কাঁসির শব্দ প্রতিধ্বনিত হইতেছে। আর একটু চা না হইলে জুত হইবে না।

উনান ধরাইয়া কেৎলির বিকল্প একটি মাটির হাঁড়িতে সে জল চড়াইয়া দিয়া নীরবে বসিয়া রহিল। তাহার মন আবার উদাস হইয়া উঠিল। নাঃ, রাজনের এমন কটু কথা বলা ভাল হয় নাই। ঠাকুরঝি মেয়েটি বড় ভাল। আজ সে অনেক কথা অনর্গল বলিত। বলিবার ছিল যে! গত রাত্রির কবিগান শুনিয়া ঠাকুরঝি সবিস্ময়ে কত কথা বলিত। মেয়েটি অত্যন্ত দুঃখ পাইয়াছে, তাই সে কথাগুলি না

বলিয়াই চলিয়া গেল। 'আলকাতরার মত রঙ'—। ছি, ওই কথাই কি বলে? একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া সে গুনগুন করিয়া এককলি গান ভাঁজিতে বসিল। বেশ ভাল একটি কলি মনে আসিয়াছে—

"কালো যদি মন্দ তবে কেশ পাকিলে কাঁদ কেনে।"

ছয়

বড় ভাল কলি হইয়াছে। নিতাইয়ের নিজেরই নেশা ধরিয়া গেল।

কালো যদি মন্দ তবে কেশ পাকিলে কাঁদ কেনে!

ওদিকে চায়ের জল টগবগ করিয়া ফুটিয়া উঠিল। ব্যস্ত হইয়া নিতাই ফুটন্ত জলের হাঁড়িটা নামাইয়া চা ফেলিয়া দিয়া একটা কলাই-করা লোহার থালা চাপা দিল।

'ফুটন্ত জলে প্রত্যেক জনের জন্য এক চামচ চা দিয়া পাঁচ মিনিট অপেক্ষা করুন'—বেণে মামার স্টলে নিতাই চা প্রস্তুত করিবার বিজ্ঞাপন দেখিয়াছে। চা দিয়া আবার সে আপন মনে কলিটা ভাঁজিতে আরম্ভ করিল। দ্বিতীয় কলি আর মনোমত হইতেছে না। সে জানালা দিয়া বাহিরের যাবতীয় কালো বস্তুর দিকে চাহিয়া রহিল। কিন্তু তবু পছন্দসই দ্বিতীয় কলি মনে আসিল না। অন্য দিন সে গরম জলে চা দিয়া মনে মনে এক হইতে ষাট পর্য্যন্ত পাঁচবার গনিয়া যায়, তারপর দুধ চিনি দেয়। আজ আর সে হইয়া উঠিল না, কেবলই কলিটা গুনগুন করিয়া ভাঁজিয়া মনে মনে দ্বিতীয় কলি খুঁজিয়া ফিরিল। অকস্মাৎ তাহার চায়ের কথা মনে হইতেই সে দুধ চিনি দিয়া চা ছাঁকিয়া লইল। কলাই করা লোহার মগে চা লইয়া বাকিটা রাজার জন্য ঢাকা দিয়া রাখিয়া সে আসিয়া বসিল কৃষ্ণচূড়াগাছটির তলায়। এটি তাহার বড় প্রিয় স্থান। ঘন কালো সরু সরু পাতায় ছাতার মত গাছটি; নিতাই বলে—'চিরোল-চিরোল পাতা'। তাহার উপর যখন চৈত্রের শেষ হইতে থোপা-থোপা লাল ফুলে ভরিয়া উঠে, তখন নিতাই প্রায় অহরহই গাছটির তলায় বসিয়া থাকে। ফুলের লোভে ছেলের দল আসে, নিতাই তাহাদিগকে ঝরা ফুল দিয়া বিদায় করে, গাছে চড়িয়া ফুল তুলিতে দেয় না।

স্টেশন হইতে রাজার হাঁক-ডাক আসিতেছে। এই ট্রেনটার সঙ্গে মালগাড়ী থাকে, এখানকার মাল থাকিলে গাড়ী কাটিয়া দিয়া যায়—সেই গাড়ী সান্টিং হইতেছে। নিতাইও নিয়মিত অন্য কুলিদের সঙ্গে মালগাড়ী ঠেলিত। সহসা তাহার মনের গান

চাপা দিয়া জাগিয়া উঠিল জীবিকার ভাবনা। কুলিগিরি সে আর করিবে না, সে কবিয়াল। কিন্তু অন্ন জুটিবে কেমন করিয়া ?

লঘু দ্রুত-গমনে ঘন ঘন পা ফেলিয়া ধপধপে মোটা কাপড় পরিয়া হাল্কা কাশ-ফুলের মত চলিয়াছে ঠাকুরঝি ; মাথায় সোনার টোপরের মত ঝকমকে পিতলের ঘটি। ঠাকুরঝির কথাও যেমন দ্রুত, চলেও সে তেমনি ক্ষিপ্র গতিতে। ঢ্যাঙা নয়, অথচ সরস কাঁচা বাঁশের পর্ব্বের মত অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলিতে বেশ একটি চোখ-জুড়ানো লম্বা টান আছে। ওই দীঘল ভঙ্গিটি নিতাইয়ের সব চেয়ে ভাল লাগে। আর ভাল লাগে তাহার কালো কোমল শ্রী। ঠাকুরঝি আজ অত্যন্ত দ্রুত চলিয়াছে। নিতাই মনে মনে একটু হাসিল—তাহাকে দেখিয়াই ঠাকুরঝি এমন হনহন করিয়া চলিয়াছে। শক্তি থাকিলে ঠাকুরঝি নিশ্চয় মাটি কাঁপাইয়া পথ চলিত। কিন্তু রাজনের এমন কড়া কথা বলা ভাল হয় নাই। আলকাতরার মত রঙ হইলেও ঠাকুরঝি তো মন্দ দেখিতে নয়! মন্দ কেন, ভালই। কালো রঙে কি আসে যায়!

'কালো যদি মন্দ তবে কেশ পাকিলে কাঁদ কেনে ?'

নিতাই ডাকিল—ঠাকুরঝি! অ ঠাকুরঝি!

ঠাকুরঝি গ্রাহ্য করিল না, সে হনহন করিয়াই চলিয়াছে।

—আমার দিব্যি! নিতাই হাঁকিয়া বলিল।

ঠাকুরঝি থমকিয়া দাঁড়াইল।

মিঠা সরু আওয়াজে দ্রুতভঙ্গিতে মেয়েটি বলিল—না, আমার দেরি হয়ে যাবে।

—একটা কথা। শোন শোন।

—না। ওইখান থেকে বল তুমি।

—আমার দিব্যি।

অত্যন্ত দ্রুত গতিতে ঠাকুরঝি এবার আগাইয়া আসিয়া নিতাইয়ের সম্মুখে দাঁড়াইয়া বলিল—তোমার দিব্যি যদি আমি না মানি!

—না মানলে মনে বেথা পাব, আর কি ঠাকুরঝি। নিতাই ছলনা করিয়া বলিল না, আন্তরিকতার সহিতই বলিল।

অপেক্ষাকৃত শান্ত স্বরেই এবার মেয়েটি বলিল—লাও, কি বলছ, বল ?

তাহার মুখের দিকে চাহিয়া মিষ্ট হাসি হাসিয়া নিতাই বলিল—রাগ করেছ ?

মুহূর্ত্তে ভীরু চকিত দৃষ্টি ভরা চোখ দুইটি সজল হইয়া উঠিল। কিন্তু সে উদ্দীপ্ত কণ্ঠে বলিল—কালো আছি, আমি আপনার ঘরে আছি। কেউ তো আমাকে খেতে পরতে দেয় না!

নিতাই হাসিয়া বলিল—আমি কিন্তু কালো ভালবাসি ঠাকুরঝি। ঠাকুরঝির মুখের কালো-রঙে লাল-আভা দেখা যায় না, তবু তাহার লজ্জার গাঢ়ত্ব বোঝা যায়। নিতাই কিন্তু গ্রাহ্য করিল না, সে গালে হাত দিয়া মৃদু স্বরে গান ধরিয়া দিল—

কালো যদি মন্দ তবে কেশ পাকিলে কাঁদ কেনে !

লজ্জিতা ঠাকুরঝি এবার সবিস্ময়ে শ্রদ্ধান্বিত দৃষ্টিতে নিতাইয়ের দিকে চাহিল, বলিল—কাল তুমি বাপু ভারী গান করেছ।

—ভাল লেগেছে তোমার ?

—খুব ভাল।

—এস, এস, একটুকুন চা আছে—খাবে এস।

—না না। ঠাকুরঝির চা খাইতে বেশ ভাল লাগে, কিন্তু মেয়েদের ভাল লাগার কথা বলিতে নাই। ছি !

নিতাই দিব্য দিল—আমার দিব্যি। নিতাই বাসার দিকে ফিরিল। রাজনের জন্য যে চা ছাঁকিয়া রাখিয়াছিল, সেটা উনানের উপরে বসানোই ছিল, নিতাই সেটা দুইটা পাত্রে ঢালিয়া একটা ঠাকুরঝিকে আগাইয়া দিল। মেয়েটি আবার সলজ্জ ভাবে বলিল—না, না, তুমি খাও।

—না, তা হবে না। তা হ'লে বুঝব, তুমি এখনও কোধ করে আছ।

বাটিটা টানিয়া লইয়া সকৌতুক বিস্ময়ে ঠাকুরঝি বলিল—কোধ কি গো ?

—রাগ। 'কোধ' মানে হ'ল তোমার রাগ! কয়ে রফলা 'ও'কার ধ, ক্রোধ ? 'হিংসা কোধ অতি মন্দ কভু নহে ভাল'। বুঝলে ঠাকুরঝি, এই কারুর হিংসে ক'রো না, আর কোধ ক'রো না। কোধের নাম হ'ল চণ্ডাল।

গভীর বিস্ময়ে মেয়েটি নিতাইয়ের দিকে চাহিয়া প্রশ্ন করিল—আচ্ছা, তুমি এত সব কি ক'রে শিখলে ?

গভীরভাবে নিতাই উপরের দিকে চাহিয়া পরম-তত্ত্বজ্ঞের মতই বলিল—ভগবানের ছলনা ঠাকুরঝি। নইলে কবিয়াল ক'রেও তিনি আমাকে 'ডোম'কুলে পাঠালেন কেনে, বল ?

নীরব বিস্ময়ে মূর্ত্তিমতী শ্রদ্ধার মত মেয়েটি কবিয়ালের দিকে চাহিয়া রহিল, তাহার চোখের উপর ভাসিতেছিল—শত শত লোকের বিস্মিত দৃষ্টির সম্মুখে এই লোকটি মুখে মুখে ছড়া বাঁধিয়া গান গাহিতেছে !

অকস্মাৎ একটা গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া নিতাই বলিল—সবই তাঁর লীলা। না হ'লে আমাকে ঠাট্টা ক'রে কপিবর, মানে হনুমান বলে !

চকিত উত্তেজনায় ঠাকুরঝির ভ্রূ দুইটি কুঞ্চিত হইয়া উঠিল, সে প্রশ্ন করিল—কে? কে বটে কে?

আবার একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া নিতাই বলিল—সে আর শুনে কি করবে বল? লাও, চা খাও। জুড়িয়ে গেল।

ঠাকুরঝি এবার পিছন ফিরিয়া বসিল, জামাই বা নিতাইয়ের দিকে মুখ রাখিয়া সে কখনও কিছু খায় না। পিছন ফিরিয়া বসিয়া চায়ের বাটিতে চুমুক দিয়া সে বলিল—না, বলতে হবে তোমাকে। কে বটে, কে সে? জামাই বুঝি? জামাই অর্থে রাজন।

—না না, ঠাকুরঝি, রাজন আমার পরম বন্ধু, বড় ভাল নোক।

—হ্যাঁ, ভাল নোক না ছাই। যে কট্‌কটে কথা!

—না, না। আজ তোমাকে ওটা পরিহাস ক রে বলেছে। তুমি শালী, পরিহাসের সম্বন্ধ।

—পরিহাস কি গো?

—ঠাট্টা, ঠাট্টা। তোমার সঙ্গে তো ঠাট্টার সম্বন্ধ।

ঠাকুরঝি চুপ করিয়া রহিল, নিতাইয়ের কথাটা সে মনে মনে স্বীকার করিয়া লইতেছিল। ঠাকুরঝির কোমল কালো আকৃতির সঙ্গে তাহার প্রকৃতির একটি ঘনিষ্ঠ মিল আছে, সঙ্গীত ও সঙ্গতের মত। কয়েক মুহূর্ত্ত পরেই সে বলিল—তা বটে। জামাই আমাদের রাগীদার হোক, নোক ভাল।

—ভারী ভাল নোক।

—কিন্তু তোমাকে উ কথা কে বললে, বলতে হবে। সে মুখপোড়া কে বটে, কে?

—গাল দিয়ো না ঠাকুরঝি, জাতে বাম্ভণ। ওই যে বণিক মাতুলের দোকানে 'বক' মুনির মত ব'সে থাকে আর ফরফর ক'রে বকে! ওই বিপ্রপদ ঠাকুর।

—কেনে উ কথা বলবে?

—ছেড়ে দাও কথা। জাতে বাম্ভণ, আমি ছোট জাত—বললে, তা বলুক।

—আঃ! ভারী আমার বাম্ভণ। কই, এমনি মুখে মুখে বেঁধে গান করুক দেখি, একবার দেখি! উত্তেজনায় ঠাকুরঝির মাথার কাপড় খসিয়া গেল।

নিতাই মুগ্ধ কণ্ঠে বলিয়া উঠিল—বা-বা-বা! ভারী মানিয়াছে তো ঠাকুরঝি।

ঠাকুরঝির রুক্ষ কালো চুলের এলো খোঁপায় একটি টক্‌টকে রাঙা জবাফুল। লজ্জায় মেয়েটি সচকিতা হরিণীর মত ক্ষিপ্র ভঙ্গিতে খসিয়া-পড়া ঘোমটাখানি মাথায় তুলিয়া দিতে চেষ্টা করিল, কিন্তু নিতাই একটা কাণ্ড করিয়া বসিল, সে খপ করিয়া তাহার হাতখানি ধরিয়া বাধা দিয়া বলিল—দেখি! দেখি! বা-বা-বা!

মেয়েটি লজ্জায় কাঁদ কাঁদ হইয়া গেল, বলিল—ছাড়।

মুহূর্ত্তে নিতাইয়ের কাণ্ডজ্ঞান ফিরিয়া আসিল, সে তাহাকে ছাড়িয়া দিল। ছাড়া পাইয়া সঙ্গে সঙ্গে মেয়েটি চায়ের বাটিটা হাতে নতমুখে ছুটিয়া পলাইয়া গেল—বাটিটা ধুইবার অজুহাতে। নিতাই লজ্জিত স্তব্ধ হইয়া নত মুখে বসিয়া রহিল। ছি! ছি! ছি! চুপ করিয়াই সে বসিয়া ছিল, সহসা ঠং শব্দে সে মুখ তুলিয়া দেখিল—ঠাকুরঝি বাটিটা নামাইয়া দিয়া, আপনার ঘটিটি তুলিয়া লইয়া চলিয়া যাইতেছে। সে মুখ ফিরাইয়া চাহিল। সলজ্জ হাসিতে ঠাকুরঝির কাঁচা মুখখানি রৌদ্রের ছটায় কচি পাতার মত ঝলমলে হইয়া উঠিয়াছে। চোখোচোখি হইতেই ঠাকুরঝি চট্ করিয়া মুখ ফিরাইয়া লইল, সেই বেগে তাহার আবার মাথার ঘোমটা খসিয়া গেল। ঠাকুরঝি এবার ছুটিয়া পলাইয়া গেল, ঘোমটা তুলিয়া না দিয়াই; তাহার রুক্ষ কালো চুলে লাল জবা পরিপূর্ণ গৌরবে আকাশের তারার মত জ্বলিতেছে!

নাঃ, ঠাকুরঝি রাগ করে নাই। ওই যে, যাইতে যাইতে আবার ফিরিয়া চাহিয়া হাসিতেছে! কিন্তু কালো চুলে রাঙা জবা বড় চমৎকার মানাইয়াছে।

ঠাকুরঝি ক্রমে ক্রমে স্বর্ণবিন্দুশীর্ষ কাশফুলের মত ছোট হইয়া পথের বাঁকে মিলাইয়া গেল। নিতাই বসিয়া আপন মনেই ঘাড় নাড়িতে আরম্ভ করিল। দ্বিতীয় কলিটাও তাহার মনে আসিয়াছে।

'কালো কেশে রাঙা কোসম (কুসুম) হেরেছ কি নয়নে?'

সাত

কালো কেশে রাঙা কুসুমের শোভা দেখিয়া গান রচনা করিয়া কবি হওয়া চলে, কিন্তু ও শোভা দেখিতে দেখিতে পথ চলা চলে না। নিতাই সত্য সত্যই একটা হুঁচোট খাইল—বিষম হুঁচোট। পায়ের বুড়া আঙুলের নখটার চারিপাশ ফাটিয়া রক্ত বাহির হইয়া পড়িল। সে ওই গানখানা ভাঁজিতে ভাঁজিতে চণ্ডীতলায় চলিয়াছিল; নির্জ্জন পথ—বাঁ হাতখানি গালের উপর রাখিয়া নিতাই বেশ উচ্চকণ্ঠেই গান ধরিয়া চলিয়াছিল—মধ্যে মধ্যে ডান হাতের তর্জ্জনী নির্দ্দেশ করিয়া যেন 'কালো চুলে রাঙা কুসুম' দেখাইয়া দিতেছিল; দ্রুতপদে ঠাকুরঝি যেন তাহার আগে-আগে চলিয়াছে, তাহার রুক্ষ কালো চুলে রাঙা জবাটি ঝকমক করিতেছে!

হুঁচোট খাইয়া বেচারী বসিয়া পড়িল। একেই এই কয়দিনে শরীরটা তাহার বড় দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছে। নিতাই এখন একবেলা খাইয়া থাকে। উপার্জ্জন নাই, পূর্ব্বের সঞ্চয় যাহা আছে, সে অতি সামান্য; সে সঞ্চয় হইতে আবার দোকান করিতে

হইবে। সেই জন্য নিতাই একবেলা খাওয়া বন্ধ করিয়াছে; একেবারে অপরাহ্ণ বেলায় সে এখন কোনদিন রাঁধে পায়েস, কোনদিন খিচুড়ী। কথাটা সে রাজাকেও বলে নাই, ঠাকুরঝিকেও না। উহারা জানিলে বিষম আপত্তি তুলিবে। রাজা হয়তো পাঁচ-সাতটা টাকা ঝনাৎ করিয়া ফেলিয়া দিয়া বলিবে—চালাও পানসী—বানাও খানা—ফিন্ দরকার হোনেসে দেগা। রাজার মত বন্ধু আর হয় না। আর রাজা সত্য-সত্যই রাজা। বিপ্রপদ যে-সব নাম তাহাকে দিয়াছে, তাহার প্রত্যেকটি এখন নিতাইকে পীড়া দেয়, কেবল একটি ছাড়া—সে নামটি হইল সভাকবি, রাজার সভাকবি। রাজার কাছে বিশেষ লজ্জাও তাহার নাই; কিন্তু রাজার স্ত্রী রাণী নয়, রাক্ষসী। বাপরে! মেয়েটার জিবে কি বিষ! সর্ব্বাঙ্গে যেন জ্বালা ধরাইয়া দেয়। মিলিটারী রাজা কঞ্চির আঘাতে পিঠখানা ক্ষত-বিক্ষত করিয়া দেয়—তবু তাহার জিব বিষ ছড়াইতে ছাড়ে না; সে পড়িয়া পড়িয়া কাঁদে আর অবিরাম গাল দিয়া চলে; মর্ম্মচ্ছেদী জ্বালা-ধরানো অশ্লীল গালি-গালাজ। তাহার আক্রোশ পৃথিবীর উপরেই, মধ্যে মধ্যে ট্রেনকেও সে অভিসম্পাত দেয়; ট্রেনের সময় রাজা ডিউটি দিতে গেলে যদি তাহার রাজাকে প্রয়োজন হয়, তবে সে স্টেশন-মাস্টার হইতে গার্ড, ট্রেন সকলকেই গালিগালাজ দিতে আরম্ভ করে। নিতাইয়ের হাসি আসিল; রাজার বউয়ের গালিগালাজের বাঁধুনী বড় চমৎকার, কালই ট্রেনখানাকে অভিসম্পাত দিতেছিল—পুল ভেঙে প'ড়ে যমের বাড়ী যাও; যে আগুনের আঁচে 'হাঁকিড়ে' চলছ—এই আগুনের আঁচে অঙ্গ তোমার গ'লে গ'লে পড়ুক! রাজা অবসর পাইলেই নিতাইয়ের কাছে আসিয়া বসে, তাই আক্রোশ তাহার নিতাইয়ের উপর কিছু বেশী। রাজার অনুপস্থিতিতে নিতাইকে শুনাইয়া কোন অনামা ব্যক্তিকে গালি-গালাজ করে। সে হাসে। রাজার আর্থিক সাহায্য আর কিছুতেই লওয়া চলিবে না। রাণী জানিতে পারিবেই, জানিতে পারিলে আর রক্ষা থাকিবে না। কালই একটা কাণ্ড ঘটিয়া গিয়াছে, ঠাকুরঝির চা খাওয়া রানী দেখিয়াছে। চা খাইতে খাইতে নিতাইয়ের রসিকতায় ঠাকুরঝি খিলখিল করিয়া হাসিতেছিল। রাজার বউ বোধ হয় কোথাও যাইতেছিল, হাসির শব্দে সে উঁকি মারিয়া দুইজনকে দেখিয়া সঙ্গে সঙ্গেই মুখ সরাইয়া লইয়া চলিয়া গিয়াছিল। ঠাকুরঝি বেচারী মুহূর্ত্তে যেন শুকাইয়া উঠিয়াছিল, নিতাইও হইয়া গিয়াছিল শুদ্ধ। পরমুহূর্ত্তেই বাড়ীর বাহিরে রাজার স্ত্রীর শ্লেষতীক্ষ্ণ কণ্ঠ বাজিয়া উঠিয়াছিল—

"হাসিস্ না লো কালামুখী—আর হাসিস্ না,
লাজে মরি গলায় দড়ি—লাজ বাসিস না ?"

ঠাকুরঝির আর চা খাওয়া হয় নাই, এক ঘটি ঠাণ্ডা জল খাইয়া তবে সে বাড়ী গিয়াছে।

হুঁচোটের ধাক্কাটা সামলাইয়া নিতাই কোনমতে চণ্ডীতলায় আসিয়া উঠিল। চণ্ডীমাকে প্রণাম করিয়া সে মোহন্তের সম্মুখে হাত জোড় করিয়া দাঁড়াইল।

মোহন্ত সস্নেহেই বলিলেন—এস কবিয়াল নিতাইচরণ এস।

নিতাই কৃতার্থ হইয়া গেল। সে মোহন্তকে প্রণাম করিল।

—জয়স্ত! তারপর সংবাদ কি?

—আজ্ঞে প্রভু, আমাকে মেডেল দোব বলেছিলেন!

—মেডেল!

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—আচ্ছা, সে হবে। পাবে। মোহন্ত অকস্মাৎ উদাসীন হইয়া উঠিলেন। সহসা চণ্ডীদেবতার মহিমা উপলব্ধি করিয়া গভীর স্বরে ডাকিয়া উঠিলেন—কালী কৈবল্য-দায়িনী মা!

নিতাই চুপ করিয়া কিছুক্ষণ বসিয়া রহিল; এমন ভাবাবেশের মধ্যে মোহন্তকে আর বিরক্ত করিতে সাহস করিল না। কিছুক্ষণ পর ওদিকে চণ্ডীর দাওয়ার উপর একটা শব্দ উঠিল—ঠং।

মোহন্ত মুহূর্ত্তে উঠিয়া পড়িলেন। ওদিকে চণ্ডীমায়ের মন্দিরে যাত্রী আসিয়াছে, পয়সা কি টাকা কিছু প্রণামী ছুঁড়িয়াছে।

মোহন্ত ফিরিয়া আসিতেই নিতাই সুযোগ পাইয়া আবার হাত জোড় করিয়া বলিল—বাবা!

ভ্রূ-কুঞ্চিত করিয়া মোহন্ত বলিলেন—বলেছি তো, পরে হবে। আসছে বার মেলার সময়, সমস্ত লোকের সামনে মেডেল দেওয়া হবে।

নিতাই অত্যন্ত বিনয় করিয়া বলিল—আজ্ঞে, বিদায় কিছু দেবেন না?

—বিদায়! টাকা?

—আজ্ঞে।

মোহন্ত সকৌতুকে কিছুক্ষণ নিতাইয়ের দিকে চাহিয়া রহিলেন, সে দৃষ্টির সম্মুখে নিতাইয়ের অস্বস্তির আর সীমা রহিল না। অকস্মাৎ মোহন্ত কথা বলিলেন—ভালা রে ময়না; ভাল বুলি শিখেছিস! টাকা!

নিতাই কোন কথা না বলিয়া উঠিয়া একরূপ পলাইয়া আসিল। ফিরিবার পথে অকস্মাৎ চোখে তাহার জল আসিল। মনে পড়িল—সেদিন গানের আসরে মহাদেব

বলিয়াছিল, 'আঁস্তাকুড়ের এঁটোপাতা স্বগ্‌গে যাবার আশা গো!' নাঃ, আঁস্তাকুড়ের এঁটো-পাতা স্বর্গে যায় না, যাইতে পারে না। কবিয়াল মহাদেব হাজার হইলেও একটা লোক, সে ঠিক কথাই বলিয়াছে। তাহার কবি হওয়ার আশা আর আঁস্তাকুড়ের এঁটোপাতার স্বর্গে যাইবার আশা—এ দুই-ই সমান।

অকস্মাৎ আপন মনেই সে পরিস্ফুট কণ্ঠে বলিয়া উঠিল—দূ-রো! অর্থাৎ কবিয়ালত্বকে সে দূর করিয়া দিল। আবার সে এই বারোটার ট্রেন হইতেই 'মোটবহন' আরম্ভ করিবে। বিপ্রপদ ঠাট্টা করিবে, তা করুক। কবিয়াল হইয়া তাহার প্রয়োজন নাই। সে মনকে বেশ খোলসা করিয়াই সকৌতুকে গান ধরিল, মহাদেবের সেই গানটি—

আঁস্তাকুড়ের এঁটোপাতা—স্বগ্‌গে যাবার আশা গো!
ফরাৎ ক'রে উড়ল পাতা—স্বগ্‌গে যাবার আশা গো!
হায়রে কলি—কিই বা বলি—গড্ডুর হবেন মশা গো।

খানিকটা আসিয়াই তাহার কানে আসিয়া ঢুকিল একটা শব্দ। ট্রেন আসিতেছে নয়? ট্রেন বোধ হয় দ্রুততর করিল। রাজা এতক্ষণ স্টেশনে গিয়া হাজির হইয়াছে। সিগন্যাল ফেলিবে, ট্রেনের ঘণ্টা দিবে। ঠাকুরঝি বোধ হয় হতভম্ব হইয়া দাঁড়াইয়া আছে—তালাবদ্ধ ঘরের সম্মুখে! সে তো আজ কিছুতেই রাজার বাড়ী যাইবে না। কাল ছড়ার মধ্যে যে কুৎসিত ইঙ্গিত রাজার স্ত্রী করিয়াছে! নিতাই চারিদিক চাহিয়া দেখিল, কেহ কোথাও নাই। সে ছুটিতে আরম্ভ করিল।

হাঁপাইতে হাঁপাইতে সে যখন স্টেশনে আসিয়া পৌছিল, ট্রেনখানা তখন বিসর্পিত গতিতে স্টেশন হইতে বাহির হইয়া যাইতেছে। নিতাই একরূপ হতাশ হইয়া দাঁড়াইয়া গেল। ঠাকুরঝি চলিয়া গিয়াছে।

স্টেশনের স্টলে দাঁড়াইয়া বণিক মাতুল তাহাকে দেখিয়াই উৎসুক হইয়া ডাকিল—নিতাই, নিতাই!

বাতে আড়ষ্ট বিপ্রপদ বহুকষ্টে দেহসমেত ঘাড়খানা ঘুরাইয়া হাঁকিল—কপিবর, কপিবর!

নিতাই অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া উঠিল। সে একটা কঠিন উত্তর দিবার জন্যই স্টেশনে আসিয়া উপস্থিত হইল। বণিক মাতুল বেশ খানিকটা খুশি হইয়াই বলিল—নাঃ, সত্যিকারের গুণীন আমাদের নিতাই। তোর কাছে লোক পাঠিয়েছে মহাদেব কবিয়াল। বায়না আছে কোথায়?

অপ্রত্যাশিত সংবাদে নিতাই হতবাক হইয়া গেল।

মহাদেব কবিয়াল তাহার কাছে লোক পাঠাইয়াছে! বায়না আছে! তাহার সে বিস্ময়-বিমূঢ়ভাব কাটিল রাজনের ডাকে। উচ্ছ্বসিত আনন্দে রাজনের সে প্রায় গগনস্পর্শী চীৎকার!

—ওস্তাদ! ওস্তাদ!

রাজনের সঙ্গে একজন লোক। মহাদেবের দোয়ারের দলের একজন দোয়ার। এই মেলার আসরেই সে গান করিয়া গিয়াছে। নিতাই তাহাকে চিনিল।

—বায়না, ওস্তাদ, বায়না আয়া হ্যায়! রাজা আবার উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল।

লোকটি বলিল—ভাল আছেন?

এতক্ষণে নিতাই মৃদুস্বরে বলিল—আজ্ঞে হাঁ। আপনাদের কুশল? ওস্তাদ ভাল আছেন?

—আজ্ঞে হ্যাঁ। তিনিই পাঠালেন আপনার কাছে। একটা বায়না ধরেছেন ওস্তাদ, আপনাকে দলে দোয়ারকি করতে হবে।

রাজা বলিল—জরুর, আলবৎ যায়েগা! চলিয়ে তো বাসামে, বাতচিৎ হোগা, চা খায়েগা।

নিতাই রাজার কথাকেই অনুসরণ করিল, আজ তাহার সব গোলমাল হইয়া যাইতেছে। মহাদেব কবিয়াল তাহার লোক পাঠাইয়াছে—বায়না আছে! সেও বলিল—আসুন, চা খেতে খেতে কথা হবে।

বাসার দুয়ারে আসিয়া নিতাই আশ্চর্য্য হইয়া গেল, একটি ঝোপের আড়ালে—কৃষ্ণচূড়াগাছটির ছায়াতলে, ও কে বসিয়া?

ঠাকুরঝি!

উৎসুক উচ্ছ্বসিত দৃষ্টিতে ফিরিয়া চাহিয়াই ঠাকুরঝি লজ্জায় যেন কেমন হইয়া গেল। কিন্তু পরমুহূর্ত্তেই সে আত্মসম্বরণ করিয়া বেশ ধীর ভাবেই বলিল—কোথা গিয়েছিলে বাপু, আমি দুধ নিয়ে ব'সে আছি সেই থেকে!

নিতাই বলিল—কাল একটুকু সকাল ক'রে দুধ এনো বাপু! কাল বারোটায় আমি কবি গাইতে যাব। তার আগেই যেন—

রাজা কথাটা সংক্ষিপ্ত করিয়া দিল—হাঁ, হাঁ, ঠিক আওয়েগা; ঘড়িকে কাঁটাকে মাফিক আতা হামারা ঠাকুরঝি।

ঠাকুরঝি নিতাইয়ের মুখের দিকে চাহিল। তাহার মুখে সপ্রশংস মৃদু হাসি।

আট

কবিগান করিয়া নিতাই ফিরিল পাঁচদিন পর। ওই স্টেশনে ট্রেন হইতে সে নামিল। তাহার পায়ে সাদা ক্যাম্বিসের একজোড়া নূতন জুতা, ময়লা কাপড়-জামার উপর ধপধপে সাদা নূতন একখানা উড়ানি চাদর। মুখে মৃদুমন্দ হাসি—আত্মপ্রসাদের হাসি, কিন্তু বিনয়ে অত্যন্ত মোলায়েম। ট্রেনে সারা পথটা সে কল্পনা করিতে করিতে আসিতেছে স্টেশন-মাস্টার হইতে সকলেই তাহাকে দেখিয়া নিশ্চয় বিস্মিত শ্রদ্ধার সঙ্গে সম্ভাষণ করিয়া উঠিবে।

—এই যে নিতাই! আরে বাপরে বাপরে, চাদর জুতো! এই যে তোকে চেনাই যায় না রে!

উত্তর নিতাই ঠিক করিয়াই রাখিয়াছিল।

—আজ্ঞে, চাদরখানা বাবুরা শিরোপা দিলেন। আর জুতো জোড়াটা কিনলাম।

শিরোপার কথাটা অবশ্য মিথ্যা; জুতা চাদর দুইই নিতাই নগদমূল্যে খরিদ করিয়াছে। গেরুয়া না পরিলে সন্ন্যাসী বলিয়া কেহ স্বীকার করে না, 'ভেক নহিলে ভিখ মেলে না'; চাদর না হইলে কবিয়ালকে মানায় না; নগ্নপদ জনের পদবী স্বীকার করিতে মানুষ সহজে চায় না। তাই নিতাই জুতা ও চাদর কিনিয়াছে। স্টেশনে নামিয়া প্রত্যাশাভরে মুখ ভরিয়া বিনীত অথচ আত্মপ্রসাদপূর্ণ হাসি হাসিয়া সে সকলের মুখের দিকে চাহিল। কিন্তু তাহার মুখের দিকে চাহিয়া দেখিয়াও যেন তাহাকে কেহ দেখিল না; সম্ভাষণ দূরের কথা, কেহ কোন প্রশ্নও করিল না। যে প্রশ্ন করিবার, সে তখন ইঞ্জিনের কাছে কর্তব্যে ব্যস্ত। মালগাড়ী সান্টিং হইবে; গাড়ী কাটিয়া রাজা ইঞ্জিনে চড়িয়া হাঁক মারিতেছিল—এই! হট যাও, এই—এই বুরবক। হটো—হটো!

নিতাইয়ের মনটা উদাস হইয়া গেল। মানুষ বৈরাগ্যভরে যেমন জনতাকে পাশ কাটাইয়া পথ ছাড়িয়া অপথে সকলের অলক্ষিত অগোচরে চলিয়া যায়, তেমনি ভাবেই সে স্টেশনের মেহেদীর বেড়ার পাশের অপরিচ্ছন্ন স্থানটা দিয়া স্টেশন অতিক্রম করিয়া আসিয়া উঠিল আপনার বাসার দুয়ারে। উদাস মনে সে যেন গভীর অবসন্নতা অনুভব করিল।

কালো যদি মন্দ তবে কেশ পাকিলে কাঁদ কেনে?—গুন গুন করিয়া অতি মৃদুস্বরে কে গান গাহিতেছে! ওই ঝোপটার আড়ালে—কৃষ্ণচূড়াগাছটির তলায়। মুহূর্তে ভাটার নদীতে যেন বাড়াবাড়ির বান ডাকিয়া গেল। তাহারই বাঁধা গান গাহিতেছে ঠাকুরঝি। রবার-সোল ক্যাম্বিসের জুতা পায়ে নিঃশব্দে নিতাই আসিয়া

তাহার পিছনে দাঁড়াইয়া অনুরূপ মৃদুস্বরে গাহিল—'কালো কেশে রাঙা কোসোম হেরেছ কি নয়নে ?'

ঠাকুরঝি চমকিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল ভীরু বন্য কুরঙ্গীর মত!—বাবারে! কে গো?

পরমুহূর্ত্তেই সে বিস্ময়ে নির্ব্বাক্ হইয়া গেল।

নিতাইয়ের মুখ ভরিয়া আবার হাসি ফুটিয়া উঠিল, পরম স্নেহভরে সে তাহার ভক্ত অনুরাগিণীটিকে বলিল—এস, চা খেতে হবে একটুকুন।

নিতাই চাদরখানি গলা হইতে খুলিয়া রাখিতে গেল, কিন্তু বাধা দিয়া ঠাকুরঝি বলিল—খুলো না, খুলো না; দাঁড়াও দেখি ভাল ক'রে!

ভাল করিয়া দেখিয়া ঠাকুরঝি বলিল—আচ্ছা সাজ হইছে বাপু। ঠিক কবিয়াল কবিয়াল লাগছে। ভারী সোন্দর দেখাইছে।

নিতাই বলিল—বাবুরা শিরোপা দিলে চাদরখানা।

—ম্যাডেল? ম্যাডেল দেয় নাই?

—সে আসছে বার দেবে। মেডেল কি দোকানে তৈরী থাকে ঠাকুরঝি?

—তা চাদরখানাও আচ্ছা হইছে! খুব গায়েন করেছ তুমি, লয়?

—খুব। 'কালো যদি মন্দ তবে' গানখানাও গেয়ে দিয়েছি।

কালো মেয়েটির মুখ কেমন হইয়া উঠিল; চোখের পাতা দুইটি অসম্ভব রকমের ভারী হইয়া উঠিয়াছে। নত চোখে সে বলিল—না বাপু; ছি! কি ধারার নোক তুমি?

নিতাই হাসিয়া বলিল—দাঁড়াও, দাঁড়াও, ভুলেই গিয়েছিলাম একেবারে।

—কি?

—চোখ বোজ দেখি। তা নইলে হবে না।

—কেনে?

—আঃ, বোজই না কেনে চোখ। তারপর চোখ খুললেই দেখতে পাবে।

ঠাকুরঝি চোখ বন্ধ করিল; কিন্তু তবু সে তাহারই মধ্যে মিটিমিটি চাহিয়া দেখিতেছিল। নিতাই পকেটে হাত পুরিয়াছে।

—উ কি; তুমি দেখছ! নিতাই ঠাকুরঝির চাতুরী ধরিয়া ফেলিল। বোজ, খুব শক্ত ক'রে চোখ বোজ।

পরক্ষণেই ঠাকুরঝি অনুভব করিল তাহার গলায় কি যেন ঝুপ করিয়া পড়িল। কি? চকিতে চোখ খুলিয়া ঠাকুরঝি দেখিল, সুতার মত মিহি, সোনার মত ঝকমকে একগাছি সুতা-হার তাহার গলায় তখনও মৃদু মৃদু দুলিতেছে।

ঠাকুরঝি বিস্ময়ে আনন্দে যেন অবশ নির্ব্বাক্ হইয়া গেল।

—সোনার ?

—না, সোনার নয় কেমিকেলের।

না হোক সোনার, তবু ঠাকুরঝির আনন্দ কম হইল না। বুকের ভিতরটা তাহার থরথর করিয়া কাঁপিতেছে, বসন্ত দিনে অশ্বত্থগাছের নূতন কচি পাতার মত।

—ওস্তাদ! ওস্তাদ!

রাজা আসিতেছে; ট্রেনখানা চলিয়া গিয়াছে, ডিউটি সারিয়া রাজা স্টেশন প্ল্যাটফর্ম হইতেই হাঁকিতে হাঁকিতে আসিতেছে।

ঠাকুরঝি চমকিয়া উঠিল, সঙ্গে সঙ্গে নিতাইও চকিত হইয়া উঠিল। মুহূর্ত্তে ঠাকুরঝি গলার সুতা হারখানি খুলিয়া ফেলিল। শঙ্কিত চাপা গলায় বলিল—জামাই আসছে।

নিতাইও যেন কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া গেল—তা হ'লে ?

পরমুহূর্ত্তেই সে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল, তখনও তাহার গলায় চাদর, পায়ে জুতা। খানিকটা আগাইয়া গিয়াই সে সবিনয়ে রাজাকে নমস্কার করিয়া বলিল—রাজন, আপনার পুরীর কুশল তো ?

রাজার চোখ বিস্ময়ে আনন্দে বিস্ফারিত হইয়া উঠিল। আরে, বাপ রে, বাপ রে! গলামে চাদর—। বাধা দিয়া নিতাই বলিল—শিরোপা।

—শিরোপা!

—হাঁ। বাবুরা গান শুনে খুশি হয়ে দিলেন।

—হাঁ ?

—হাঁ।

—আরে, বাপ রে, বাপ রে! রাজা নিতাইকে বুকে জড়াইয়া ধরিল, তারপর বলিল—আও ভাই কবিয়াল, আও।

—কোথায় ?

—আরে, আও না! সে তাহার হাত ধরিয়া টানিতে টানিতে লইয়া গেল বণিক মাতুলের চায়ের দোকানে।

—মামা! বনাও চা। লে আও মিঠাই।

বেণে মামাও অবাক্ হইয়া গেল নিতাইয়ের পোশাক দেখিয়া। বাতে-পঙ্গু বিপ্রপদ অন্যদিকে চাহিয়া বসিয়া ছিল,—আড়ষ্ট দেহখানাকে টানিয়া সে ফিরিয়া চাহিল, তাহারও চোখে রাজ্যের বিস্ময় জমিয়া উঠিল।

নিতাই সবিনয়ে বিপ্রপদের পদধূলি লইয়া আজ কতদিন পরে স্থুপ করিয়া টানিয়া লইল। তারপর সবিনয়ে হাসিয়া বলিল—চাদরখানা বাবুরা শিরোপা দিলেন প্রভু।

বেণে মামা বলিল—আমাদিগে কিন্তু সন্দেশ খাওয়াতে হবে নিতাই।

—নিশ্চয়। খাও না মাতুল, সন্দেশ তো তোমার দোকানেই। দাম আমি দেব।

—নেহি, হাম দেঙ্গে দাম। বানাও ঠোঙ্গা। কাঠের একটা প্যাকিং বাক্স টানিয়া রাজা চাপিয়া বসিল, নিতাইয়ের হাত ধরিয়া টানিয়া পাশের জায়গায় বসাইয়া দিয়া বলিল—বইঠ্ যাও।

এতক্ষণে বিপ্রপদ কথা বলিল, সে আজ আর রসিকতা করিল না, ঠাট্টাও করিল না, সপ্রশংস এবং সহৃদয় ভাবেই বলিল—তারপর গাওনা কি রকম হ'ল বল দেখি নিতাই?

নিতাই উৎসাহিত হইয়া উঠিল; বিপ্রপদকে সে আজ জয় করিয়াছে। ইহার অপেক্ষা বড় কিছু সে কল্পনা বা কামনা করিতে পারে না। সে আবার একবার বিপ্রপদের পদধূলি লইয়া জোড়হাত করিয়া বলিল—আজ্ঞে প্রভু, গাওনা আপনার চরম। দুদিকে দুই বাঘা কবিয়াল—এ বলে আমাকে দেখ, ও বলে আমাকে দেখ; একদিকে ছিষ্টিধর, অন্যদিকে মহাদেব। লোকে লোকারণ্যি। আর মেলাও তেমনি।

বেণে মামা ঠোঙায় মিষ্টি ভরিয়া হাতে হাতে দিয়া বলিল—খেতে খেতে গল্প হোক, খেতে খেতে। সকলকে ঠোঙা দিয়া সে নিতাইয়ের ঠোঙাটি অগ্রসর করিয়া ধরিল। কিন্তু নিতাইয়ের অবসর নাই—কথার সঙ্গে তাহার হাত দুইটিও নানা ভঙ্গিতে নড়িতেছে।

বিপ্রপদ এতক্ষণে সহজ হইয়া উঠিয়াছে, সে চট করিয়া বেণে মামার হাত হইতে ঠোঙাটি লইয়া ধমক দিয়া উঠিল—ভাগ বেটা বেরসিক কাঁহাকা। কবিরা সন্দেশ খায় কোন কালে? কবিরা চাঁদের আলো খায়, ফুলের মধু খায়, কোকিলের গান খায়। তারপর নিতাইকে সম্বোধন করিয়া বলিল—হ্যাঁ, তারপর নিতাইচরণ? একদিকে ছিষ্টিধর, একদিকে মহাদেব। লোকে লোকারণ্যি! তারপর?

নিতাইয়ের উৎসাহ কিন্তু ইহাতে দমিত হইল না। সে সমান উৎসাহেই বলিয়া গেল—একদিন, বুঝলে প্রভু, মহাদেবের রঙটা খানিকটা বেশী হয়ে গিয়েছিল। সেদিন—মহাদেব হয়েছে কেষ্ট, ছিষ্টিধর রাধা। ছিষ্টিধর তো ধুয়ো ধরলে—"কালো টিকেয় আগুন লেগেছে—তোরা দেখে যা গো সাধের কালাচাঁদ।" গালাগালির চরম করে গেল। ওদিকে মহাদেব তখন বমি করছে। দোয়াররা সব মাথায় জল

—তা হ'লে আমাদের মেলাতে ওই ছোকরাকেই আন।"

নিতাই মনে মনে নিজের দরও ঠিক করিয়া রাখিয়াছে। মহাদের আট টাকা লইয়া থাকে, ছিষ্টিধর দশ টাকা, নিতাই পাঁচ টাকা হাঁকিবে, চার টাকায় রাজী হইবে। একজন ঢুলী চাই। রাজনের ছেলেটাকে দিয়া কাঁসী বাজানোর কাজ দিব্য চলিবে।

ঢং ঢং করিয়া ট্রেনের ঘণ্টা পড়িলেই সে তাড়াতাড়ি আসিয়া স্টেশনে বসে। ট্রেনের প্রতি যাত্রীটিকে সে লক্ষ্য করিয়া দেখে। মেলা-খেলা লইয়া যাহারা থাকে, তাহাদের চেহারার মধ্যে একটা বিশিষ্ট ছাপ আছে, নিতাই সেই ছাপ খুঁজিয়া ফেরে। কেবল যায় না বেলা বারোটার ট্রেনের সময়, ওই সময়টিতে আসে ঠাকুরঝি।

মাস খানেক পর।

সেদিন তাহার হাতের সম্বল আসিয়া ঠেকিল—একটি সিকিতে। তাহার মন অকস্মাৎ আবার ভাঙিয়া পড়িল। কোনরূপে আর চারিটা দিন চলিবে। তার পর? আবার কি 'মোট বহন' করিতে হইবে? উপোস করিয়া মানুষ কয়দিন থাকিতে পারে? এদিকে ঠাকুরঝির কাছে দুধের দাম বাকী পড়িয়া যাইতেছে। দশ দিন আগে অবশ্য সব সে মিটাইয়া দিয়াছে; দশ দিনে দশ পোয়া দুধের দশ পয়সা বাকী। নিতাই স্থির করিল, আজই সে দুধের রোজে জবাব দিবে।

পরদিন দ্বিপ্রহরে, রেল-লাইনের বাঁকের মুখে যেখানে লাইন দুইটা মিলিয়া এক হইয়াছে বলিয়া মনে হয়, সেইখানেই দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া সে দাঁড়াইয়া রহিল। ওই-খানেই অকস্মাৎ এক সময়ে দেখা গেল মাথায় ঘটি—সাদা ধপধপে কাপড় পরা ঠাকুরঝিকে।

ঠাকুরঝিকে দেখিয়াই নিতাই হাসিল।

ঠাকুরঝি বলিল—না বাপু, তুমি এমন ক'রে দাঁড়িয়ে থেকো না। নোকে কি বলবে বল দেখি?

একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া নিতাই বলিল—একটি কথা বলবার নেগে দাঁড়িয়ে আছি।

নিতাই এখন ভদ্রভাষায় কথা বলিতে চেষ্টা করে, তাই ল-কারকে ন-কার করিয়া তুলিয়াছে। লোহাকে বলে 'নোয়া', লুচিকে বলে 'নুচি', লঙ্কা—নঙ্কা, লোক—নোক হইয়া উঠিয়াছে তাহার কাছে। রাজন, ঠাকুরঝি তাহার ভাষার এই মার্জিত রূপের পরম ভক্ত।

নিতাইয়ের কথা শুনিয়া ঠাকুরঝি সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। কি কথা? অকারণ মেয়েটির বুকের মধ্যে হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন মুহূর্তে দ্রুত হইয়া উঠিল।

নিতাই বলিল—অনেক দিন থেকেই বলব মনে করি, কিন্তুক—

একটু নীরব থাকিয়া নিতাই বলিল—আর ভাই, দুধের পেয়োজন আমার হবে না।

ঠাকুরঝি কেমন হইয়া গেল। তাহার মুখের শ্রী মুহূর্তে মুহূর্তে পরিবর্ত্তিত হইতে আরম্ভ করিল। মুহূর্তে সে মুখ বর্ষার রসপরিপুষ্ট ঘনশ্যামপত্রশ্রীর মত; আবার পর-মুহূর্ত্তেই সে মুখ শুকাইয়া হইয়া উঠিতেছিল পাণ্ডুর হেমন্তশ্রীর মত।

ঠাকুরঝি নির্ব্বাক হইয়া শুধু নিতাইয়ের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। নিতাইয়ের কথার শেষে তাহার মুখ এবার যে পাণ্ডুর হইয়া গেল, তাহার আর পরিবর্ত্তন ঘটিল না। অনেকক্ষণ পরে সে কথা বলিল—নিতাইয়ের কথাটা সে কম্পিতকণ্ঠে যেন যাচাই করিয়া লইল—দুধ লেবে না?

—না।

—কেনে? কি দোষ করলাম আমি? তাহার চোখ দুইটি জলে ভরিয়া উঠিল।

নিতাই কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিল। তারপর বলিল—মিথ্যা কথা একেই মহাপাপ, তার ওপর তোমার নেকট মিথ্যা বললে পাপের আর আমার পরিসীমে থাকবে না। আমার সামর্থ্যে কুলাইছে না ঠাকুরঝি।

একটা গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া সে আবার বলিল—দরিদ্র ছোটনোকের কবি হাওয়া বড় বেপদের কথা ঠাকুরঝি।

কাতর অনুনয়ে ব্যগ্রতা করিয়া মেয়েটি বলিয়া উঠিল—তোমাকে পয়সা লাগবে না ওস্তাদ। অকুণ্ঠিত আবেগে সে নিতাইয়ের হাত দুইটি চাপিয়া ধরিল।

নিতাই তাহার মুখের দিকে চাহিয়া কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিল, তারপর বলিল—না। জানতে পারলে তোমার স্বামী পেহার করবে, শাশুড়ী তিরস্কার করবে, ননদে গঞ্জনা দেবে—

ঠাকুরঝি প্রতিবাদ করিয়া উঠিল—না না না। ওগো, একটি গাই আমার নিজের আছে, সেই গাইয়ের দুধ আমি তোমাকে দোব।

নিতাই চুপ করিয়া রহিল।

—লেবে না? কবিয়াল? মেয়েটির কণ্ঠস্বর কাঁপিতেছিল, দৃষ্টি ফিরাইয়া নিতাই দেখিল, আবার তাহার চোখ দুইটিতে জল টলমল করিতেছে।

'মধুকুলকুলি' পাখীগুলি নাচিয়া নাচিয়া উড়িয়া বেড়াইতেছে। রঙীন প্রজাপতির যেন মেলা বসিয়া গিয়াছে কৃষ্ণচূড়াগাছটার চারিপাশে।

ঠাকুরঝি যেন দ্রুতপদে চলিয়া আসিতেছে এই দিকে।

নিতাইয়ের শরীর যেন কেমন ঝিমঝিম করিতেছে! সে চোখ বুজিয়া বসিয়া রহিল। মনে মনে ডাকিল—এস ঠাকুরঝি, এস। তোমার মনের কথা আমি বুঝিয়াছি। তুমি এস। আমার পাপ হয় হোক, নরকে যাইতে হয় হাসিমুখেই যাইব, তবু তোমাকে বলিতে পারিব না—তুমি এস না। সে কি পারি? সে কথা কি মুখ দিয়া বাহির হইবার? এস তুমি, এস।

তাহার মনে হইল নষ্টচাঁদের কথা। সে চাঁদ দেখিলে নাকি কলঙ্ক হয়! নিতাই কিন্তু কখনও সেকথা মানে নাই। মনের মধ্যে তাহার গান গুনগুন করিয়া উঠিল। আপনি যেন কলিটা আসিয়া পড়িল—

"চাঁদ দেখে কলঙ্ক হবে ব'লে কে দেখে না চাঁদ?

ঠাকুরঝি তাহার সেই চাঁদ। ঠাকুরঝি যদি আর না আসে, তবে নিতাই বাঁচিবে কি করিয়া? এখানে থাকিয়া সে কি করিবে? কোথায় সুখ তবে? সে এইখানে বসিয়া ওই পথের দিকে চাহিয়া থাকিয়া চোখের দৃষ্টি হারাইয়া ফেলিবে।

"চাঁদ দেখে কলঙ্ক হবে বলে কে দেখে না চাঁদ?
তার চেয়ে চোখ যাওয়াই ভাল রে! ঘুচুক আমার দেখার সাধ।
ওগো চাঁদ তোমার নাগি—"

ও-হো-হো! গানের কলি হু-হু করিয়া আসিতেছে!

"ওগো চাঁদ তোমার নাগি—না হয় আমি হব বৈরাগী
পথ চলিব রাত্রি জাগি সাধবে না কেউ আর তো বাদ।"

হায়! হায়! হায়! একি বাহায়ের গান! ওগো ঠাকুরঝি! ওগো, কি মহা ভাগ্যে তুমি আসিয়াছিলে, কবিয়ালকে ভালবাসিয়াছিলে, তাই তো—তাই তো আজ এমন গান আপনা আপনি আসিয়া পড়িল!

নিতাই উঠিল। সে চলিল ওই রেল লাইন ধরিয়া যে পথে ঠাকুরঝি আসে। কিছু দূর গিয়া পথ নির্জ্জন হইতেই সে ওই গানটা ধরিয়া দিল।

রেল লাইনের বাঁধে ছেদ পড়িয়াছে নদীর উপর। বাঁধের মাথা হইতে পুল আরম্ভ হইয়াছে। বাঁধ হইতে নিতাই নামিল নদীর ঘাটে; নদীতে অল্প জল, এক হাঁটুর বেশী নয়। হাঁটিয়াই ঠাকুরঝি নিত্য নদী পার হইয়া আসে-যায়। নিতাই গিয়া নদীর ঘাটে দাঁড়াইল।

নিতাই চলিয়াছিল একেবারে বিভোর হইয়া। বাঁ হাত গালে দিয়া ডান হাতের অঙ্গুষ্ঠ ও মধ্যমা আঙুল দুইটি জোড় করিয়া সে যেন ঠাকুরঝিকেই উদ্দেশ করিয়া গাহিতে গাহিতে চলিয়াছিল। হয়তো সে একেবারে ঠাকুরঝির শ্বশুর-বাড়ীতেই গিয়া হাজির হইত। নদীর ঘাটে পা দিয়াই হঠাৎ তাহার খেয়াল হইল। তাই তো সে কোথায় যাইতেছে? এ কি করিতেছে সে? ঠাকুরঝির শ্বশুর-বাড়ীতে সে যদি গিয়া দাঁড়ায়, এই গান গায়, বলে—ঠাকুরঝি, এ চাঁদকে জান? এ চাঁদ আমার তুমি! তবে ঠাকুরঝির দশা কি হইবে? ঠাকুরঝির স্বামী কি বলিবে? তাহার শাশুড়ী ননদ কি বলিবে? পাড়া-প্রতিবেশী আসিয়া জুটিয়া যাইবে। তাহারা কি বলিবে? সকলের গঞ্জনার মধ্যে পড়িয়া ঠাকুরঝি—; তাহার চোখের উপর ভাসিয়া উঠিল ঠাকুরঝির ছবি। দিশাহারার মত তাহার ঠাকুরঝি দাঁড়াইয়া শুধু কাঁদিবে।

ঠাকুরঝির নিন্দায় ঘর-পাড়া-গ্রাম-দেশ ভরিয়া যাইবে। ঠাকুরঝি পথ হাঁটিবে, মাথা হেঁট করিয়া পথ হাঁটিবে, লোকে আঙুল দেখাইয়া বলিবে—ওই দেখ, সেই কালামুখী যাইতেছে।

কুৎসিত অভদ্র লোকে ঠাকুরঝিকে কু কথা বলিবে।

সে যদি ঠাকুরঝিকে মাথায় করিয়া দেশান্তরী হয়, তবুও লোকে বলিবে—মেয়েটা খারাপ, নিতাইয়ের সঙ্গে ঘর ছাড়িয়া পলাইয়া আসিয়াছে। ঠাকুরঝি সেখানেও মাথা তুলিতে পারিবে না।

নিতাই নদীর ঘাটে বসিল।

আপন মনেই বলিল—আকাশের চাঁদ তুমি আমার ঠাকুরঝি। তুমি আকাশেই থাক।

আঃ—আজ কি হইল নিতাইয়ের! আবার কলি আসিয়া গিয়াছে।

"চাঁদ তুমি আকাশে থাক—আমি তোমায় দেখব খালি।
ছুঁতে তোমায় চাইনাকো হে—সোনার অঙ্গে লাগবে কালি।"

নিতাই গান ভাঁজিতে ভাঁজিতে আবার ফিরিল।

রাজা বলিল—কাঁহা গিয়া রহা ওস্তাদ?

নিতাই হাসিয়া বলিল—গান, রাজন, গান। বহুৎ বঢ়িয়া বঢ়িয়া গান আজ এসে গেল ভাই। তাই গুনগুন করছিলাম আর মাঠে মাঠে ঘুরছিলাম।

—হাঁ! বঢ়িয়া বঢ়িয়া গান?

—হাঁ, রাজন, অতীব উত্তম, যাকে বলে উচ্চাঙ্গের গান।

—বইঠো। তব ঢোলক লে আতা হাম।

রাজা ঢোল আনিয়া বসিয়া গেল।

নিতাই একমনে গাহিতেছিল।

হঠাৎ বাজনা বন্ধ করিয়া রাজা বলিল—আরে ওস্তাদ! আঁখসে তুমারা পানি নিকাল গিয়া ভাই?

চোখ মুছিয়া নিতাই বলিল—হাঁ, রাজন, পানি নিকাল গিয়া।

পরদিন নিতাই সকাল হইতেই বসিয়া ছিল ওই কৃষ্ণচূড়াগাছের তলায়। আজ সকাল হইতে তাহার মনে হইতেছে—মনে তাহার কোন খেদ নাই, কোন তৃপ্তিও নাই। সে যেন বৈরাগীই হইয়া গিয়াছে।

কাল সমস্ত দিন-রাত্রি মনে মনে অনেক ভাবিয়াছে সে। সন্ধ্যায় গিয়াছিল রাজনের বাড়ী। রাজার স্ত্রী বড় মুখরা; ইদানীং রাজা নিতাইকে নানাপ্রকার সাহায্য করে বলিয়া সে নিতাইয়ের উপর প্রায় চটিয়াই থাকে। তবু সে গিয়াছিল। রাজা খুশি হইয়াছিল খুব, আশ্চর্য্যের কথা—কাল রাজার বউও তাহাকে সাদর সম্ভাষণ করিয়াছিল। ঘোমটার মধ্য হইতেই বলিয়াছিল—তবু ভাগ্যি যে ওস্তাদের আজ মনে পড়ল!

নিতাই তাহারই কাছে কৌশলে কথাপ্রসঙ্গে জানিয়াছে—ঠাকুরঝির স্বামীর সমস্ত বৃত্তান্ত।

ঠাকুরঝির স্বামীটি নাকি দিব্য দেখিতে!

—রঙ পেরায় গোরো, বুঝলে ওস্তাদ, তেমনি ললছা-ললছা গড়ন। লোকটিও বড় ভাল। দুজনাতে ভাবও খুব, বুঝলে!

অবস্থাও নাকি ভাল! দিব্য স্বচ্ছল সংসার। রাজার স্ত্রী বলিল—যাকে বলে 'ছছল-বছল'। আট-দশটা গাই গরু। দুটো বলদ। ভাগে চাষ-বাস করে। ঠাকুরঝির তোমাদের পাঁচজনার আশীব্বাদে সুখের সংসার।

নিতাই বলিয়াছিল—আহা! আশীব্বাদ তো চব্বিশ ঘণ্টাই করি মহারাণী।

রাজার স্ত্রী অদ্ভুত। সে এতক্ষণ বেশ ছিল, এবার ওই মহারাণী বলাতেই সে খড়ের আগুনের মত জ্বলিয়া উঠিল। ওই—ওই কথা আমি সইতে লারি। মহারাণী! মহারাণী তো খুব। মেথরাণী, চাকরাণী তার চেয়ে ভাল। না ঘর, না দুয়োর। ল্যাজের ঘরে বাস—আজ এখান, কাল সেখান।

রাজা মুহূর্ত্তে আগুন হইয়া উঠিয়াছিল—কেঁও হারামজাদী? ক্যেয়া বোলতা তুম?

—ক্যেয়া বোলতা তুম কি? হক কথা বলব তার ভয় কি?

তাহার পরেই কুরুক্ষেত্র। রাজা ধরিয়াছিল তাহার চুলে। তাহাদের শান্ত করিবার জন্য নিতাই বারকয়েক চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু সে চেষ্টায় কিছু হয় নাই। রাজার স্ত্রী প্রায় রাত্রি বারোটা-একটা পর্য্যন্ত কাঁদিয়াছে, রাজাকে গাল দিয়াছে, নিতাইকে গাল দিয়াছে। আজ সকালেও একদফা হইয়া গিয়াছে।

নিতাইয়ের উদাসীনতা অবশ্য সে জন্য নয়।

কাল সমস্ত রাত্রি সে মনের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া মনকে বুঝাইয়াছে। ভাল তুমি বাস, কিন্তু সে কথা মনেই রাখ, কাহাকেও বলিও না—ঠাকুরঝিকেও না। তাহার সুখের ঘর-সংসার—সে ঘর তাহার নিত্যনূতন সুখে ভরিয়া উঠুক। তুমি তাহার মনের সরমের বাঁধ ভাঙিয়া তাহার সে সুখের ঘর ভাসাইয়া দিও না।

বেলা দ্বিপ্রহরের সময় ঠাকুরঝি আসিল ঘড়ির কাঁটার মত। রেলের লাইনে জাগিয়া উঠিল সোনার বরণ একটি ঝকমকে বিন্দু, তাহার পর ক্রমশ জাগিয়া উঠিল কাশফুলের মত সাদা একটি চলন্ত রেখা। ক্রমে কাছে আসিয়া সে হইল ঠাকুরঝি। একমুখ হাসি লইয়া ঠাকুরঝি তাহার সামনে দাঁড়াইল।

—কবিয়াল!

নিতাই অশ্রুকণ্ঠে বলিল—ঘরে বাটি আছে দুধটা রেখে যাও।

—না। তুমি এস। আমি অত সব লারব বাপু! আর—

—কি আর?

—রোদে এলাম, বসব একটুকুন।

—না ঠাকুরঝি। এমন ভাবে আমার ঘরে বসা ঠিক নয়। দেখ পাঁচজনে দুষ্য ভাববে।

ঠাকুরঝি স্তব্ধভাবে স্থিরদৃষ্টিতে নিতাইয়ের দিকে চাহিয়া রহিল।

নিতাই বলিল—বিশ্রাম করবে যদি তো তোমার দিদির বাড়ী রয়েছে। আমি একা বেটাছেলে বাড়ীতে থাকি। পাঁচজনের দুষ্য ভাবার তো দোষ নাই। দেখ, তুমিই বিবেচনা ক'রে দেখ ঠাকুরঝি! তাহার মুখে নিরুপায় মানুষের সকরুণ হাসি ফুটিয়া উঠিল।

ঠাকুরঝি হনহন করিয়া চলিয়া গেল।

নিতাই একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল।

* * *

দিন এমনি ভাবেই চলিতে আরম্ভ করিল। নিতাই উদাসীন হইয়া বসিয়া থাকে। গানও আর তেমন গায় না। ঠাকুরঝি আসে, সেও আর নিতাইয়ের সঙ্গে কথা বলে না।

দ্রুতপদে আসিয়া দাঁড়ায়, দুধের বাটিতে দুধ ঢালিয়া দেয়, চলিয়া যায়। একদিন নিতাই বলিল—শোন।

ঠাকুরঝি শুনিতে পাইল, কিন্তু দাঁড়াইল না। একবার মুখ ফিরাইয়া নিতাইয়ের দিকে চাহিয়া দেখিয়াই আবার চলিতে আরম্ভ করিল।

নিতাই আবার ডাকিল—যেও না, শোন। ঠাকুরঝি!

ঠাকুরঝি এবার দাঁড়াইল।

—শোন, এদিকে ফেরো।

ঠাকুরঝি ফিরিয়া দাঁড়াইল। নিতাইয়ের চোখেও মুহূর্তে জল আসিয়া পড়িল। সে তৎক্ষণাৎ ঘুরিয়া দাঁড়াইয়া হাত নাড়িয়া ইঙ্গিত করিয়া বলিল—না না। যাও তুমি। বলব, আর একদিন বলব।

ঠাকুরঝি আর দাঁড়াইল না, চলিয়া গেল।

দিন কয়েক আবার সেই আগের মত চলিল। কেহ কাহারও সঙ্গে কথা বলে না। একদিন ঠাকুরঝি দুধ ঢালিয়া দিয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। কয়েক মুহূর্ত পরে বলিল—সে দিন যে কি বলব বলেছেলা—বললে না!?

নিতাই বলিল—বলব।

—বল।

কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া নিতাই বলিল—আর একদিন বলব ঠাকুরঝি।

ঠাকুরঝি একটু হাসিল। সে হাসি দেখিয়া নিতাইয়ের বুক একটা প্রচণ্ড দীর্ঘ-নিশ্বাসের বাতাসে ভরিয়া উঠিল। ঠাকুরঝি সঙ্গে সঙ্গেই ফিরিল, বাড়ী হইতে বাহির হইয়া চলিয়া গেল।

নিতাইয়ের বুক-ভরা নিশ্বাসের বাতাসটা এতক্ষণে ঝরিয়া পড়িল। সে কথা আর বলা হইবে না। না বলাই ভাল।

"বলতে তুমি বলো নাকো আমার মনের কথা থাকুক মনে।
দূরে থাক সুখে থাক আমিই পুড়ি মন-আগুনে।"

অনেক দিন পরে নিতাইয়ের মনে গান আসিয়াছে। দুঃখের মধ্যেও নিতাই খুশি হইয়া উঠিল। গুনগুন করিয়া গান ধরিয়া নিতাই চলিল বাবুদের বাগানের দিকে। বাবুদের বাগানে তাহার গানের অনেক সমঝদার আছে। বাগানের প্রতিটি গাছ তাহার সমঝদার শ্রোতা। এই বাগানেই সে প্রথম প্রথম কবিগান অভ্যাস করিত। গাছগুলি হইত মজলিসের মানুষ। তাহাদের সে তাহার গান শুনাইত। আজও বাগানে আসিয়া সে গান ধরিল, ওই গানটাই ধরিল—

"সাক্ষী থাক তরুলতা শোন আমার মনের কথা
এ বুকে যে কত বেথা—বোঝ বোঝ অনুমানে।"

গান শেষ করিয়া সে চুপ করিয়া বসিল। নাঃ, এমন ভাবে আর দিন কাটে না। এই মনের আগুনে সে আর পুড়িতে পারিবে না। শুধু মনের আগুনই নয়, পেটের আগুনের জ্বালা, সেও তো কম নয়! রোজগার গিয়াছে; পুঁজি প্রায় ফুরাইয়া আসিল। রোজগারের একমাত্র পথ মোটবহন, কিন্তু কবিয়াল হইয়া তো ঐ কাজ সে করিতে পারিবে না। অন্তত এখানে সে পারিবে না। এখান হইতে তাহার চলিয়া যাওয়াই ভাল। তাই করিবে সে। কালই গিয়া মা চণ্ডীকে প্রণাম করিয়া মনে মনে বলিবে—মা গো, তোমার অভাগা ছেলে নিতাইচরণকে কবিয়াল করিলে, কিন্তু তাহার মনের দুঃখ পেটের দুঃখ বুঝিলে না। কোন উপায় করিলে না। সে চলিল, তাহাকে বিদায় দাও তুমি। তাহার মনে পড়িয়া গেল অনেক দিনের আগের একটা শোনা গান, বাউলেরা গাহিত, ক্ষুদিরামের ফাঁসীর গান—

"বিদায় দে মা ফিরে আসি।"

ওই প্রথম কলিটা লইয়া তাহার পাদপূরণ করিতে করিতে সে ফিরিয়া আসিয়া চুপ করিয়া বসিল।

"বিদায় দে মা ফিরে আসি।
বলতে কথা বুক ফাটে মা চোখের জলে ভাসি।"

স্তব্ধ হইয়া সে বসিয়া ছিল। তাহার সে স্তব্ধতা ভাঙিল রাজনের ক্রুদ্ধ চীৎকারে। সে সচকিত হইয়া উঠিল। রাজা কাহাকে দুর্দান্ত ক্রোধে ধমক দিতেছে—চোপ রহো!

পরক্ষণেই স্ত্রী-কণ্ঠে তীক্ষ্ণ কর্কশ ধ্বনি ধ্বনিত হইয়া উঠিল—চা-চিনি নিয়ে যাবে! কেনে? কিসের লেগে? লাজ নাই, হায়া নাই, বেহায়া, চোখখেগো মিনসে!

আর কথা শোনা গেল না, শোনা গেল দুপ-দাপ শব্দ, আর স্ত্রীকণ্ঠের আর্ত চীৎকার। রাজা নীরবে স্ত্রীকে প্রহার করিতেছে, রাজার স্ত্রী উচ্চ চীৎকারে কাঁদিতেছে। নিতাই ছি-ছি করিয়া সারা হইল। নাঃ, এই চায়ের পর্বটা বন্ধ করিয়া দিতে হইবে।

—ওস্তাদ! ওস্তাদ! স্ত্রীকে প্রহার সারিয়া এই মুহূর্তটিতেই রাজা আসিয়া ঘরে ঢুকিল।—বানাও চা!—পন্‌রা ষোলা আদমীকে মাফিক। প্রায় পোয়াখানেক চা, আধসেরটাক চিনি সে নামাইয়া দিল। রাজার স্ত্রীর দোষ কি? এত অপব্যয় কেহ চোখে দেখিতে পারে?

নিতাই গম্ভীরভাবে বলিল—রাজন!

রাজন নিতাইয়ের কথায় কানই দিল না, সে বাসার বাহিরে চলিয়া গেল, দুয়ারের সামনে দাঁড়াইয়া হাঁকিল—হো ভেইয়া লোক হো! হাঁ হাঁ, হিয়া আও। চলে আও সব-লোক, চলে আও।

নিতাই বিস্মিত হইয়া উঠিয়া আসিল।

মেয়ে-পুরুষের একটি দল আসিতেছে। ঢোল, টিনের তোরঙ্গ, কাঠের বাক্স, পোঁটলা—আসবাবপত্র অনেক। মেয়েদের বেশভূষা বিচিত্র, পুরুষগুলির চেহারাও বিশিষ্ট একটা ছাপ-মারা চেহারা। এ ছাপ নিতাই চিনে।

—চা দাও ভাই, মরে গেলাম মাইরি! কথাটা যে বলিল, সে ছিল দলের পিছনে, দলটি দাঁড়াইতেই সে আসিয়া সর্ব্বাগ্রে দাঁড়াইল। একটি দীর্ঘ কৃশতনু গৌরাঙ্গী মেয়ে। অদ্ভুত দুইটি চোখ। বড় বড় চোখ দুইটার সাদা ক্ষেতে যেন ছুরির ধার,—সেই শাণিত-দীপ্তির মধ্যে কালো তারা দুইটা কৌতুকে অহরহ চঞ্চল। সাদা আগুনের শিখার মধ্যে নাচিয়া ফিরিতেছে যেন দুইটা কালো পতঙ্গ—মরণজয়ী কালো ভ্রমর দুইটা।

রাজন নিতাইকে দেখাইয়া বলিল—এহি হামারা ওস্তাদ।

নিতাই অবাক হইয়া গিয়াছিল, সে ইহাদের সকল পরিচয় দেখিয়াই চিনিয়াছে,—ঝুমুরের দল। কিন্তু ইহারা আসিল কোথা হইতে?

—জোর করকে উতার লিয়া। রাজা বলিল—ট্রেনসে জোর করকে উতার লিয়া। গাওনা হোগা আজ। তুমকো গাওনা করনে হোগা।

মেয়েটা ঠোঁট বাঁকাইয়া বলিয়া উঠিল—এই তুমারা ওস্তাদ নাকি? অ-মা-গ! বলিয়াই সে খিলখিল করিয়া হাসিয়া উঠিল; সে হাসির আবেগে তাহার দীর্ঘ কৃশ তনু থরথর করিয়া কাঁপিতেছিল। মেয়েটা শুধু মুখ ভরিয়া হাসে না, সর্ব্বাঙ্গ ভরিয়া হাসে। আর সে হাসির কি ধার! মানুষের মনের মনকে কাটিয়া টুকরা টুকরা করিয়া ধুলায় লুটাইয়া দেয়।

দশ

জলের বুকে ক্ষুর দিয়া চিরিয়া দিলে যেমন চকিতের মতন একটা রেখা টানিয়া মিলাইয়া যায় আর ক্ষুরটাও জলের মধ্যে অদৃশ্য হইয়া যায়, তেমনি করিয়া নিতাই মৃদুহাসি হাসিল, সেই হাসির—অতি হাসির মধ্যে দীর্ঘ কৃশতনু মেয়েটার মুখের ধারালো সশব্দ হাসি যেন ডুবিয়া মিলাইয়া গেল। উদাসীন নিতাইয়ের মৃদু চকিত

হাসিটুকুর বিনীত সহনশীলতার মধ্যে কোথাও এতটুকু শক্ত কিছু নাই, যাহা কাটিয়া বসা চলে। মেয়েটাও কিন্তু আশ্চর্য্য মেয়ে—সে মুহূর্ত্তে আত্মসম্বরণ করিয়া তীক্ষ্ণতর হইয়া উঠিল, যেন জলে ধোওয়া মালিন্যমুক্ত ক্ষুরের মত ঝকমক করিয়া উঠিল। কিন্তু সে কিছু বলিবার পূর্ব্বেই নিতাই সবিনয়ে সমস্ত দলটিকে আহ্বান জানাইয়া বলিল—আসুন, আসুন, আসুন।

সে বাড়ীর মধ্যে আগাইয়া গেল—সকলে তাহার অনুসরণ করিল। নিতাইয়ের বাসা—রেলওয়ে কুলি-ব্যারাক। কনস্ট্রাক্‌শনের সময় এখানেই ছিল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের বড় আপিস, তখনকার প্রয়োজনে এই সমস্ত ব্যারাক তৈয়ারি হইয়াছিল, এখন সব পড়িয়াই আছে। দিব্য তকতকে সিমেণ্ট বাঁধানো খানিকটা বারান্দা, বাঁধানো আঙিনা; সেই দাওয়া ও আঙিনার উপরেই দলটি বসিয়া পড়িল। দলটি ঝুমুরের দল। বহু পূর্ব্বকালে ঝুমুর অন্য জিনিস ছিল, কিন্তু এখন নিম্নশ্রেণীর বেশ্যা গায়িকা এবং কয়েকজন যন্ত্রী লইয়াই ঝুমুরের দল। আজ এখান, কাল সেখান করিয়া ঘুরিয়া বেড়ায়, গাছতলায় আস্তানা পাতে, কেহ বায়না না করিলেও সন্ধ্যার পর পথের ধারে নিজেরাই আসর পাতিয়া গান বাজনা আরম্ভ করিয়া দেয়। মেয়েরা নাচে, গায়—অশ্লীল গান। ভন্‌ভনে মাছির মত এ রসের রসিকরা আসিয়া জমিয়া যায়। দুই চারি পয়সা পেলাও পড়ে। মেয়েদের দেহের ব্যবসাও চলে। তবে অশ্লীল গানই ইহাদের সর্ব্বস্ব নয়, পুরাণের পালাগানও জানে, তেমন আসর পাইলে সে গানও গায়। যন্ত্রীদের মধ্যে নিতাইয়ের ধরণের দুই-একজন কবিয়ালও আছে, প্রয়োজন হইলে কবিগানের পাল্লায় দোয়ারকিও করে, আবার সুবিধা হইলে নিতাইয়ের মত কবিয়াল সাজিয়াও দাঁড়ায়। গাছতলায় পথের ধারে আস্তানা পাতিয়া যাহারা অনায়াসে দিন রাত্রি কাটাইয়া দেয়, এমন বাঁধানো আঙিনা ও দাওয়া পাইয়া তাহাদের কৃতার্থ হইবার কথা—কৃতার্থ ই হইয়া গেল তাহারা; খুশি হইয়া তালপাতার চ্যাটাই বিছাইয়া সকলে বসিয়া পড়িল। দীর্ঘ কৃশতনু মেয়েটি কেবল সিমেণ্ট বাঁধানো দাওয়ার উপর উপুড় হইয়া শুইয়া পড়িল, বলিল—আঃ! তাহার সে কণ্ঠস্বরে অসীম ক্লান্তি—গভীর হতাশার কারুণ্য। সে যেন আর পারে না।

—বসন। মেয়েদের মধ্যে একজন প্রৌঢ়া আছে, দলের কর্ত্রী, সেই বলিয়া উঠিল —বসন, জ্বর গায়ে ঠাণ্ডা মেঝের উপর শুলি কেনে? ওঠ, ওঠ।

মেয়েটির নাম বসন্ত। বসন্ত সে কথার উত্তর দিল না, কণ্ঠস্বর একটু উচ্চ করিয়া বলিল—কই হে ওস্তাদ না কোস্তাদ! চা দাও ভাই।

নিতাই চায়ের জল তখন চড়াইয়া দিয়াছে, সে বলিল—এই আর পাঁচ মিনিট। কিন্তু তোমার জ্বর হয়েছে—তুমি ঠাণ্ডা মেঝের ওপর শুলে কেনে? একটা কিছু পেতে দোব?—মাদুর?

বসন্ত চোখ মেলিল না, চোখ বুজিয়াই খিলখিল করিয়া হাসিয়া উঠিল, বলিল—ওলো, নাগর আমার পীরিতে পড়েছে। দরদ একেবারে গলায় গলায়! সঙ্গে সঙ্গে তাহার তরুণী সঙ্গিনীর দলও খিলখিল করিয়া হাসিয়া উঠিল।

ঠাকুরঝির নতুন মগটিতে চা ঢালিয়া নিতাই সেই মগটি বসন্তের মুখের সম্মুখে নামাইয়া দিয়া বলিল—বুঝে খেয়ো, চায়ের সঙ্গে যোগবশের রস দিয়েছি। কবিয়াল নিতাই রসের কারবারী, রসিকতার এমন ধারালো প্রতিদ্বন্দ্বিতার পাত্র পাইয়া সে যেন মাতিয়া উঠিয়াছে।

চা পাইয়া তৃষ্ণার্তের মত আগ্রহে বসন্ত ইতিমধ্যেই উঠিয়া বসিয়াছিল, সে মুখ মচকাইয়া হাসিয়া নিতাইয়ের মুখের দিকে চাহিল—বল কি? পীরিতে কুলোল না, শেষে যোগবশ!

অপর সকলকে চা পরিবেশন করিতে করিতে নিতাই গান ধরিয়া দিল—

"প্রেমডুরি দিয়ে বাঁধতে নারলেম হায়,
চন্দ্রাবলীর সিঁদুর শ্যামের মুখচাঁদে!
আর কি উপায় বৃন্দে—এইবার এনে দে এনে দে—
বশীকরণ লতা—বাঁধব ছাঁদে ছাঁদে।"

গানটা কিন্তু নিতাইয়ের বাঁধা নয়, নিতাইয়ের আদর্শ কবিয়াল তারণ মোড়লের বাঁধা গান; নিতাইয়ের মুখস্থ ছিল।

ঝুমুর দলের মেয়ে, সমাজের অতি নিম্নস্তর হইতে ইহাদের উদ্ভব, আক্ষরিক কোন শিক্ষাই নাই; কিন্তু সঙ্গীতব্যবসায়িনী হিসাবে একটা অদ্ভুত সংস্কৃতি ইহাদের আছে। পালাগানের মধ্য দিয়া ইহারা পুরাণ জানে, পৌরাণিক কাহিনীর উপমা দিয়া ব্যঙ্গ শ্লেষ করিলে বুঝিতে পারে, প্রশংসা সহানুভূতিও উপলব্ধি করে। নিতাইয়ের গানের অর্থ বসন্ত বুঝিতে পারিল, তাহার চোখ দুইটা একেবারে শাণিত ক্ষুরের মত ঝকমক করিয়া উঠিল। কিন্তু পরক্ষণেই মুখ নামাইয়া চায়ের কাপে চুমুক দিল।

পুরুষদলের একজন বলিল—ভাল! ওস্তাদ, ভাল!

অন্যজন সায় দিল—হ্যাঁ, ভাল বলেছে ওস্তাদ।

—হ্যাঁ। ভ্রূ-কুঞ্চিত করিয়া একটি মেয়ে বলিল—হ্যাঁ, ময়না বলে ভাল। নিতাইয়ের গানের অন্তর্নিহিত ব্যঙ্গ, একা বসন্ত নয়—মেয়েদের সকলেরই গায়ে

লাগিয়াছিল। অপর একটি মেয়েও সঙ্গে সঙ্গে বলিয়া উঠিল—"উনোন ঝাড়া কালো কয়লা—আগুন তাতে দিপি-দিপি!" ছেঁকা লাগে!

প্রৌঢ়া বিচারকের মতো স্মিত হাসি হানিয়া বলিল—তা তোদের হার হ'ল বাছা। জবাব তোরা দিতে নারলি।

বসন্ত কোন উত্তর দিল না, চা টুকু নিঃশেষে পান করিয়া মগটা নামাইয়া দিয়া আবার সে মাটিতে লুটাইয়া শুইয়া পড়িল। রাজা সেই মুহূর্তে ঘরে ঢুকিল, তাহার দুই হাতে হাঁড়ি মালসা, বগলে শালপাতার বোঝা। মিলিটারী রাজা—হুকুমের সুরেই ব্যবস্থা জানাইয়া দিল—ভেইয়া লোক, ও-হি বটতলামে জাগা সাফ হো গিয়া. আব পাকাওঁ খানা।

* * *

নিতাই চুপি চুপি প্রশ্ন করিল—রাজন, এই সব খরচপত্র করছ—

রাজার সময় অত্যন্ত কম এবং এ সংসারে গোপনও কিছু নাই। সে বাধা দিয়া স্বাভাবিক উচ্চকণ্ঠেই বলিল—সব ঠিক হ্যায় ভাই, সব ঠিক হ্যায়। বেনিয়া মামা আট আনা দিয়া, কয়লাওয়ালা এক আনা, মুদী আট আনা, মাস্টারবাবু চার আনা, গুদামবাবু চার আনা, গাডবাবু চার আনা, মালগাড়ীকে 'ডেরাইবার' আট আনা, হামারা এক রূপেয়া; বাস জোড় লেও। তুমারা এক রূপেয়া—উলোককে আড়াই রূপেয়া, বারো আনাকে চাউল ডাউল। বাস্, হো গিয়া।

সঙ্গে সঙ্গেই সে চলিয়া গেল, ওদিকে সান্টিং লাইন হইতে একখানা গাড়ী কুলীরা ঠেলিয়া প্রায় পয়েন্টের কাছে লইয়া গিয়াছে।

নিতাই গাছতলায় আসিয়া দাঁড়াইল; ভ্রাম্যমান সম্প্রদায়টি ইতিমধ্যেই অভ্যস্ত ক্ষিপ্র নিপুণতার সহিত গাছতলায় সংসার পাতিয়া ফেলিয়াছে; উনান পাতিয়া তাহাতে আগুন দেওয়া হইয়াছে, একটি মেয়ে জল আনিতেছে, একজন তরকারী কুটিতেছে, প্রৌঢ়া উনানের সম্মুখে বসিয়া মাটির হাঁড়ি ধুইয়া ফেলিতেছে। পুরুষেরা তেল মাখিতেছে; মেয়েদের স্নান হইয়া গিয়াছে, সকলেরই ভিজা খোলা চুল পিঠে পড়িয়া আছে, প্রান্তে একটি করিয়া গেরো বাঁধা। নাই কেবল সেই কৃশতনু গৌরাঙ্গী ক্ষুরধার মেয়েটি। নিতাইকে দেখিয়া প্রৌঢ়া তাহাকে সাদরে সম্ভাষণ করিয়া বলিল—ব'স বাবা, ব'স।

পুরুষ কয়জন প্রায় একসঙ্গেই বলিয়া উঠিল—তাই তো, আপনি দাঁড়িয়ে কেন গো? বসুন।

উনানে একটা কাঠ গুঁজিয়া দিয়া প্রৌঢ়া বলিল—বাঁসা গলা আমার বাবার;

তারপর মুখের দিকে চাহিয়া স্মিত হাসি হাসিয়া বলিল—এই 'নাইনেই' থাকবে বাবা? না, কাজকম্মও করবে—এও করবে?

—এই 'নাইনেই' থাকারই তো ইচ্ছে; তা দেখি।

—বিয়ে-টিয়ে করেছ? ঘরে কে আছে?

—বিয়ে! নিতাই হাসিল, হাসিয়া বলিল—ঘরে মা আছে, বুন আছে; মা বুনের কাছেই থাকে। আমি একা।

—তবে আমাদের দলে এসনা কেনে?

নিতাই কিন্তু এ কথার উত্তর চট্ করিয়া দিতে পারিল না। সম্মতি দিতে গিয়া মনে পড়িয়া গেল রাজাকে—মনে পড়িয়া গেল ভূইচাঁপার শ্যামল সরস ডাঁটাটির মত কোমল শ্রীময়ী ভক্ত মেয়েটি—ঠাকুরঝিকে। সে চুপ করিয়াই রহিল।

কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিয়া প্রৌঢ়া আবার প্রশ্ন করিল—কি বলছ বাবা?

—বাবা ভাবছে তোমার মনের মানুষের কথা। সঙ্গে সঙ্গে খিল-খিল হাসি। নিতাই পিছন ফিরিয়া দেখিল, ভিজা কাপড়ে দাঁড়াইয়া সদ্যস্নাতা বসন্ত। ভিজা চুল হইতে তখনও জল গড়াইয়া পড়িতেছে। নিতাই অবাক হইয়া গেল।

—বউ কেমন হে? বশীকরণের লতায় ছাঁদে ছাঁদে বেঁধেছে বুঝি!

নিতাই এতক্ষণে সবিস্ময়ে বলিল—জ্বর গায়ে তুমি চান ক'রে এলে?

—ধুয়ে দিয়ে এলাম। চন্দ্রাবলীর প্রেমজ্বর কিনা! বলিয়াই সে খিলখিল করিয়া হাসিয়া ভাঙিয়া পড়িল। সিক্তবাসের স্বচ্ছতার আড়ালে তাহার সুপরিস্ফুট সর্ব্বাঙ্গ হাসিতেছে। নিতাইয়ের লজ্জা হইল।

প্রৌঢ়া বলিল—মিছে কথা নয়, ভিজে কাপড় ছাড় বসন। তুই কোন্‌দিন মরবি ওই ক'রে।

হাসিয়া বসন বলিল—ফেলে দিও টেনে। তা ব'লে চান না ক'রে থাকতে পারি না। চান না করলে—মা-গো! গায়ে যা বাস ছাড়ে!

একটি তরুণী মুচকি হাসিয়া বলিল—চুল কেরে না লতায় পাতায়, তা বল!

বসন হাত দিয়া মাথার চুলে চাপ দিতে দিতে বলিল—আমার তো আর কেশ দিয়ে নাগরের পা মুছতে হয় না, তা চুল না ফিরিয়ে করব কি?

বহুপরিচর্য্যাই ইহাদের ব্যবসা, কিন্তু নারীচিত্তের স্বভাবধর্ম্মে একটি বিশেষ অবলম্বন ভিন্ন ইহারাও থাকিতে পারে না; সঙ্গের পুরুষগুলির মধ্যেই দলের প্রত্যেক মেয়েটিরই প্রেমাস্পদ জন আছে। সেখানে মান-অভিমান আছে, সাধ্য-সাধনাও আছে। কিন্তু বসন্তের প্রেমাস্পদ কেহ নাই, সে কাহাকেও গ্রহ করিতে পারে না। কেহ

পতঙ্গের মত তাহার শাণিত দীপ্তিতে আকৃষ্ট হইয়া কাছে আসিলে মেয়েটার ক্ষুরধারে তাহার কেবল পক্ষচ্ছেদই নয়, মর্ম্মচ্ছেদও হইয়া যায়। তাই বসন্ত সঙ্গিনীকে এমন কথা বলিল। ফলে ঝগড়া একটা বাধিয়া উঠিবার কথা; তাহাতে মেয়েটি ফণা তুলিয়াও উঠিয়াছিল; কিন্তু দলের কর্ত্রী প্রৌঢ়া মাঝখানে পড়িয়া কথাটা ঘুরাইয়া দিল। হাসিয়া বলিল—ও বসন, শোন শোন, দেখ আমাদের ওস্তাদকে পছন্দ হয় কি না!

তাহার কথা শেষ হইল না, বসন্তের উচ্চ উচ্ছল হাসিতে ঢাকা পড়িয়া গেল। নিতাই ঘামিয়া উঠিল। প্রৌঢ়া ধমক দিয়া বলিল—মরণ! এত হাসছিস কেনে?

হাসি থামাইয়া বসন্ত বলিল—মরণ তোমার নয়, মরণ আমার!

—কেনে?

—মা গো! ওই কালো কুচ্ছিৎ—; মা-গ!

সকলে নির্ব্বাক হইয়া রহিল।

বসন্ত আবার বলিল—কালো অঙ্গের পরশ লেগে আমি শুদ্ধ কালো হয়ে যাব মাসী। মুখ বাঁকাইয়া সে একটু হাসিল, তারপর আবার বলিল—যাই, শুকনো কাপড় পরে আসি। 'নিমুনি' হ'লে কে করবে বাবা! সে হেলিয়া দুলিয়া চলিয়া গেল।

একটি মেয়ে বলিল—মরণ তোমার, গলায় দড়ি।

প্রৌঢ়া ধমক দিল—চুপ কর বাছা। কোঁদল বাধাস নে।

মেয়েটি একেবারে চুপ করিল না, আপন মনেই মৃদুস্বরে গজগজ করিতে আরম্ভ করিল।

প্রৌঢ়া আবার কথাটা পাড়িল—বলি হাঁ গো, ও ছেলে!

—আমাকে বলছেন?

—হ্যাঁ। ছেলেই বলব তোমাকে। অন্য লোকে বলবে—ওস্তাদ। রাগ করবে না তো বাবা?

—না না। রাগ করব কেন?

—কি বলছ? এই 'নাইনেই' যখন থাকবে, তখন এস না আমাদের সঙ্গে।

—না। নিতাইয়ের কণ্ঠস্বর দৃঢ়।

সকলেই চুপ করিয়া রহিল। নিতাই উঠিল,—তা হ'লে আমি যাই এখন; আমাকেও রান্নাবান্না করতে হবে।

—ওহে কয়লা-মাণিক। বসন্তের কণ্ঠস্বর। নিতাই ফিরিয়া চাহিল। বসন্ত বিন্যাস করিয়া চুল আঁচড়াইয়াছে—বিন্যাস করিবার মত চুল বটে মেয়েটির। ঘন

একপিঠ দীর্ঘ কালো চুল। কপালে সিঁদুরের টিপ, পরনে ধপধপে লাল নক্সিপাড় মিলের সাড়ী।

বসন্ত হাসিয়া বলিল—তোমার নাম দিয়েছি ভাই কয়লা-মাণিক। কালো-মাণিক কি বলতে পারি? সে হাতজোড় করিয়া কালো-মাণিককে প্রণাম করিল।

নিতাই হাসিয়া বলিল—ভাল ভাল! তা বেশ তো। ময়লা-মাণিক বলতেও পার।

—সে ওই কয়লাতেই আছে। এখন আমার একটি কাজ করে দেবে?

—কি, বল?

—দু'পয়সার মাছ এনে দেবে? আমার আবার মাছ নইলে ভাত রোচে না। দেবে এনে?

—দাও। নিতাই হাত পাতিল। কিন্তু বসন্ত পয়সা দিতে হাত বাড়াইতেই আপনার হাত অল্প সরাইয়া লইল, বলিল—আলগোছে ভাই, আলগোছে।

—কেনে? চান করতে হবে নাকি? মেয়েটার ঠোঁটের কোণ দুইটা যেন গুণ-দেওয়া ধনুকের মত বাঁকিয়া উঠিল।

নিতাই হাসিয়া বলিল—কয়লার ময়লা লাগবে ভাই, তোমার রাঙা হাতে।

বসন্তের হাতের পয়সা আপনি খসিয়া নিতাইয়ের হাতে পড়িয়া গেল। মুহূর্তে ধনুকের গুণ যেন ছিঁড়িয়া গেল। তাহার অধরপ্রান্ত থরথর করিয়া কাঁপিয়া উঠিল। পরমুহূর্তেই সে কম্পন তাহার বাঁকা হাসিতে রূপান্তর গ্রহণ করিল; নিতাইয়ের মনে হইল মেয়েটা যেন গল্পের সেই মায়াবিনী, প্রতিদ্বন্দ্বী সাপ হইলে সে বেজী হয়; বিড়াল হইয়া বেজীরূপিণী তাহাকে আক্রমণ করিলে বেজী হইতে সে হয় বাঘিনী। কান্না তাহার বাঁকা হাসিতে পাল্টাইয়া গেল মুহূর্তে। হাসিয়া সে বলিল—সেই জন্যে আলগোছে দিলাম।

* * *

জেলে-পাড়ার পথে নিতাইয়ের মনে গান জাগিয়া উঠিল। নূতন গান। মনে মনে ভাবিয়া সে ওই মেয়েটার তুলনা পাইয়াছে। গুনগুন করিয়া সে কলি ভাঁজিতে আরম্ভ করিল—আহা!

আহা—রাঙা বরণ সিমুল ফুলের বাহার সার।

এগারো

সন্ধ্যায় রাজা বেশ সমারোহ করিয়া আসর পাতিল। রাজা পরিশ্রম করিল সেনাপতির মত; বিপ্রপদ বসিয়া ছিল রাজা সাজিয়া। বেচারা বাতব্যাধিতে আড়ষ্ট শরীর লইয়া নড়া-চড়া করিতে পারে না, চীৎকারেই সে শোরগোল তুলিয়া ফেলিল। অবশ্য কাজও অনেকটা হইল। মুদী, কয়লাওয়ালা বিপ্রপদের ব্যঙ্গশ্লেষের ভয়ে শতরঞ্চি বাহির করিয়া দিল, বণিক মাতুল তাহার পেট্রোম্যাক্স আলোটা আনিয়া নিজেই তেল পুরিয়া জ্বালিয়া দিল। লোকজনও মন্দ কেন—ভালই হইল। সম্ভ্রান্ত ভদ্রব্যক্তিরা কেহ না আসিলেও দোকানদার শ্রেণীই যথাসাধ্য হংসশ্রোতার মত সাজিয়া গুজিয়া বসিল, নিম্নশ্রেণীর লোকেরা একেবারে ভিড় জমাইয়া আসিল। আসর পড়িল ঝুমুর নাচের। নিতাই প্রত্যাশা করিয়াছিল উহাদের দলের কবিয়ালের সঙ্গে একহাত লড়িবে অর্থাৎ গাওনার পাল্লা দিবে। অনেক ঝুমুর দলের সঙ্গে একজন নিম্নস্তরের কবিয়াল থাকে—স্বতন্ত্রভাবে গাওনা করিবার যোগ্যতা না থাকা হেতু ওই ঝুমুর দলকে আশ্রয় করিয়া থাকে তাহারা; পথে কোন গ্রামে বা মেলায় এমনি ধারার ঝুমুর দলের দেখা পাইলে পাল্লা জুড়িয়া দেয়। মেলায় ঝুমুরের সহিত কবির আসর যোগ হইলে আসরও জোরাল হয়। এ দলেরও এমন একজন কবিয়াল আছে। কিন্তু সে আজ দলের সঙ্গে আসে নাই। কাজের জন্য পিছনে পড়িয়া আছে। দলটার গন্তব্যস্থান আলিপুরের মেলা। কথা আছে, দুইদিন পরে সে সেইখানে গিয়া জুটিবে। নইলে নিতাই একটা আসর পাইত। কবিয়ালের অভাবে আসর বসিল শুধু নাচগানের। ঢোল, ডুগি তবলা, হারমোনিয়ম, একটা বেহালা লইয়া ঝুমুর দলের পুরুষেরা আসর পাতিয়া বসিল। তাহাদের তেল চপচপে চুলে বাহারের টেরী, গায়ে রংচঙে ছিটের ময়লা জামা। মেয়েদের গায়ে গিল্টীর গহনা—কান, ঝাপটা, হার, তাগা, চুড়ি, বালা; পরনে সস্তা কাপড়ের বাতিল ফ্যাশানের বডিস, রঙীন কাপড়। কেশবিন্যাসের পারিপাট্যে আধুনিকতা অনুকরণের ব্যর্থ অপকর্ষ ভঙ্গি। ঠোঁটে, গালে, লালরঙ, তাহার উপর সস্তা পাউডার এবং স্নো'র প্রলেপ, পায়ে আলতা, হাতেও লাল রঙের ছোপ। দর্শকদের মনে কিন্তু ইহাতেই চমক লাগিতেছে। মেয়েগুলির মধ্যে বসন্তই ঝলমল করিতেছে, মেয়েটার সত্যই রূপ আছে। কবিয়াল নিতাই ফরসা কাপড় জামার উপর চাদরখানি গলায় দিয়া ঝুমুর দলেরই গা ঘেঁষিয়া বসিল। মুখে তাহার গৌরবের হাসি। এ আসরে সে বিশিষ্ট ব্যক্তি, সে কবিয়াল!

গাওনা আরম্ভ হইল। খেমটার অনুকরণে নাচ ও গান। মেয়েরা প্রথমে গান ধরে, মেয়েদের পরে দোয়ারেরা সেই গান পুনরাবৃত্তি করে, মেয়েরা তখন নাচে। প্রৌঢ়া মধ্যস্থলে পানের বাটা লইয়া বসিয়া ছিল, সে নিতাইকে বলিল—বাবা, তুমিও ধর।

নিতাই হাসিল। কিন্তু দোয়ারদের সঙ্গে সে গান ধরিল না। প্রথম গানখানা শেষ হইতেই মেয়েরা বিশ্রামের জন্য বসিল। সঙ্গে সঙ্গে নিতাই উঠিয়া পড়িল। কবিয়ালের ভঙ্গিতে চাদরখানা কোমরে বাঁধিয়া সে হাতজোড় করিয়া বলিল—আমি একটি নিবেদন পাই।

চারিদিকে নানা কলরব উঠিয়া পড়িল।

—সঙ নাকি?

—ব'স ব'স।

—এই নিতাই!

একজন রসিক বলিয়া উঠিল—গোঁপ কামিয়ে এস! গোঁপ কামিয়ে এস!

অকস্মাৎ সকল কলরবকে ছাপাইয়া রাজা হুঙ্কার দিয়া উঠিল—চোপ সব, চোপ।

বিপ্রপদও একটি ধমক ঝাড়িল—অ্যা—ও!

সকলে চুপ করিয়া গেল। নিতাই সুযোগ পাইয়া বলিল—আমি একপদ গাইব আপনাদের কাছে।

—লাগাও ওস্তাদ, লাগাও। রাজার কণ্ঠস্বর।

নিতাই গান ধরিয়া দিল। বাঁ হাতটি গালে দিয়া, ডান হাতটি মুখের সম্মুখে রাখিয়া অল্প ঝুঁকিয়া আরম্ভ করিল—

"আহা রাঙাবরণ সিমুলফুলের বাহার সার—
ওগো সখি বাহার দেখে যা।"

কলিটা প্রথম দফা গাহিয়া ফেরতার সময় সে হাতে তালি দিয়া তাল দেখাইয়া বলিল—এই—এই, এই বাজাও তবলাদার।—বলিয়াই সে আবার ধরিল—

"শুধুই রাঙা ছটা, মধু নাই এক ফোঁটা, গাছের অঙ্গে কাঁটা ধর ধার।
মন-ভোমরা যাস নে পাশে তার।"

রাজা বাহবা দিয়া উঠিল—বাহা রে ওস্তাদ, বাহা রে!

বিপ্রপদও দিল—বহুৎ আচ্ছা!

বণিক মাতুল বলিল—ভাল, ভাল!

লোকেও এবার বাহবা দিল।

নিতাই উৎসাহে মৃদু মৃদু নাচিতে আরম্ভ করিল। নিতাইয়ের কণ্ঠস্বরটি সুমিষ্ট, শ্রোতার দলও চুপ করিয়া ছিল। নিতাই চারিদিকে দৃষ্টি বুলাইয়া লইল, মুখে তাহার মৃদু হাসি। রাজার পিছনেই রাজার স্ত্রী, তাহার পাশে ঠাকুরঝি। শ্রদ্ধান্বিত বিস্ময়ে সে তাহার দিকে চাহিয়া আছে। মুহূর্তের জন্য নিতাই গান ভুলিয়া গেল, ঠাকুরঝিকে সে অবহেলা দেখাইলেও ঠাকুরঝি তাহাকে অবহেলা করে নাই। তাহার গৌরবের গোপন অংশ লইতে সে আসিয়াছে। নিতাই একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল।

ঝুমুর দলের ঢুলীটা সুযোগ পাইয়া সর্ব্বসমক্ষে প্রচার করিয়া বলিয়া উঠিল—এই কাটল। অর্থাৎ নিতাইয়ের তাল কাটিয়া গেল। মুহূর্ত্তে নিতাই সজাগ হইয়া ঢুলীর কথায় সঙ্গেই গান ধরিয়া দিল—

"ফল ধরে না ধরে তুলো, চালের বদলে—চুলো—"

হাত তালি দিয়া সে নাচিতে শুরু করিল। পরের কলি ভাবিবার এই অবকাশ। নাচিতে নাচিতে সে ফিরিয়া চাহিল—আসরের দিকে। ঝুমুর দলের মেয়েগুলি মুখ টিপিয়া হাসিতেছে—কেবল বসন্তের চোখে খেলিতেছে ছুরির ধার। নিতাই তাহার দিকে চাহিয়াই ছড়া কাটিল—

"ফুলের দরে সেই সিমুলও বিকালো, মালা হ'ল গলায়।"

নিতাইয়ের সঙ্গে চোখোচোখি হইতেই সে উঠিয়া দাঁড়াইল, প্রৌঢ়াকে বলিল—আমি চললাম মাসী।

—কোথায়?

—বাসায়, ঘুমুতে।

—ঘুমুতে!

—হ্যাঁ।

—তুই কি ক্ষেপেছিস নাকি? ব'স।

—না। এ আসরে আমি গান গাই না। যে আসরে বাঁদর নাচে সে আসরে আমি নাচি না।

বেশ উচ্চকণ্ঠেই কথা হইতেছিল। নিতাই মুহূর্ত্তে স্তব্ধ হইয়া গেল। দর্শকেরা অধিকাংশই চীৎকার করিয়া উঠিল—এই, এই, তুমি থাম।

চটিয়া উঠিল রাজা, সে উঠিয়া দাঁড়াইল—কেয়া?

বসন্ত কোনও উত্তরই দিল না, কেবল একবার ঘাড় বাঁকাইয়া নিতান্ত তাচ্ছিল্য ভরে একটা চকিত দৃষ্টি হানিয়া আসর হইতে বাহির হইয়া যাইবার উপক্রম করিল। চারিদিকে একটা রোল উঠিল, কেহ নিতাইয়ের উপর চটিয়া চীৎকার সুরু করিল, কেহ বা

অর্থের চুক্তিতে আবদ্ধ ঘৃণিত পথচারিণী মেয়েটার ছুর্বিনীত স্পর্দ্ধায় ক্রুদ্ধ হইয়া আস্ফালন তুলিল। কিন্তু মেয়েটা কোন কিছুতেই ভ্রূক্ষেপ করিল না। সম্মুখের মানুষটিকে বলিল—পথ দাও দেখি ভাই।

সে পথ ছাড়িয়া দিত কি দিত না—কে জানে, কিন্তু সে কিছু করিবার পূর্ব্বেই পিছন হইতে সম্মুখে আসিয়া পথ-রোধ করিল নিতাই। হাত জোড় করিয়া সে দাঁড়াইল, হাসিমুখে বিনয় করিয়া বলিল—আমার দোষ হয়েছে। যেও না তুমি, ব'স। আমার মাথা খাও।

বসন্ত কথার উত্তর দিল না, কিন্তু ফিরিয়া আসিয়া আসরে বসিল। গোলমাল একটু স্তিমিত হইতেই সে উঠিয়া গান ধরিল। সঙ্গে সঙ্গে আরম্ভ করিল নৃত্য। আসরটা স্তব্ধ হইয়া গেল। এমন কি, ক্রুদ্ধ রাজা পর্যন্ত মুগ্ধ হইয়া গেল। মেয়েটার রূপ আছে, কণ্ঠও সু-কণ্ঠ। তাহার উপর মেয়েটা যেন গান ও নাচের মধ্যে নিজেকে ঢালিয়া দিয়াছে। দ্রুত হইতে দ্রুততর তানে লয়ে সঙ্গীত ও নৃত্য শেষ করিয়া মেয়েটা মুহূর্ত্তে একটি পূর্ণচ্ছেদের মত স্থির হইয়া দাঁড়াইল; এতক্ষণে আসরে রব উঠিল—বাহবার রব। চারিদিক হইতে 'পেলা' পড়িতে আরম্ভ হইল—পয়সা, আনি, দোয়ানি, সিকি, ছুইটা আধুলি; দোকানী ঘনশ্যাম দত্ত একটা টাকাই ছুঁড়িয়া দিল। মেয়েটার সে দিকে লক্ষ্য করিবার বোধ হয় অবসর ছিল না, তাহার সর্ব্বাঙ্গে ঘাম দেখা দিয়াছে, বুকখানা হাপরের মত হাঁপাইতেছে; গৌরবর্ণ মুখখানা রক্তোচ্ছ্বাসে ভরিয়া উঠিয়াছে। প্রৌঢ়া নিজে উঠিয়া পেলাগুলি কুড়াইয়া লইল।

চারিদিক হইতে রব উঠিল—আর একখানা, আর একখানা!

নিতাই বসন্তের দিকে চাহিল, চোখে চোখে মিলিতেই নমস্কার করিয়া সে তাহাকে অভিনন্দিত করিল।

প্রৌঢ়া বসন্তের গায়ে হাত দিয়া বলিল—ওঠ! কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই শিহরিয়া উঠিল,—এ কি বসন, জ্বর যে আজ অনেকটা হয়েছে।

হাসিয়া বসন বলিল—একটুকুন মদ থাকে তো দাও।

সামান্য আড়াল দিয়া খানিকটা নির্জ্জলা মদ গিলিয়া সে আবার উঠিয়া দাঁড়াইল। কিন্তু প্রথম বারের মত গতি ও আবেগ আনিতে পারিল না, সে হাঁপাইতেছিল, গতির মধ্যে ক্লান্তির পরিচয় সুপরিস্ফুট। গানখানি শেষ করিয়াই সে শিথিল ক্লান্ত পদক্ষেপে আসর হইতে বাহির হইয়া গেল। কেহ কোন কথা বলিল না, যেন তাহাদের দাবী ফুরাইয়া গিয়াছে, চোখের উপর দেনা-পাওনার ওজন-দাঁড়িতে তাহার ছুইখানা গান ও নাচের ভার মাটির উপর পাথরের ভারে চাপিয়া বসিয়াছে। পথের

ধারে যাহারা দাঁড়াইয়া ছিল তাহারা আরও একটু সরিয়া দাঁড়াইয়া পথ পরিষ্কার করিয়া দিল।

প্রৌঢ়া নিতাইকে বলিল—দেখ তো বাবা। আচ্ছা একগুঁয়ে মেয়ে!

* * *

নিতাইও বাহির হইয়া আসিল। চারিদিক চাহিয়া সে বসন্তের সন্ধান করিল। মনে মনে এই মেয়েটির কাছে সে হার মানিয়াছে। 'সিমুল' ফুল বলা তাহার অন্যায় হইয়াছে—অন্যায় নয়, অপরাধ। নূতন গানের কলি তাহার মনের মধ্যে গুনগুনানি আরম্ভ করিয়াছে। কিন্তু কোথায় গেল বসন্ত? ঝুমুর দলের বাসা তো ওই বটগাছ-তলা। গাছতলাটায় একখানা চ্যাটাইয়ের উপর বসিয়া আছে একটা পুরুষ—দলের মধ্যে শক্তিশালী পুরুষটা। মহিষের মত প্রচণ্ড আকার, তেমনি কালো, রাঙা গোল চোখ; বোবার মত নীরব; তৃষ্ণার্ত্ত মহিষে যেমন করিয়া জল খায়—তেমনি করিয়া মদ খায়, সারাদিন শুইয়া থাকে, সন্ধ্যার পর হইতে পড়ে তাহার জাগরণের পালা। আগুন জ্বালিয়া আগুনের সম্মুখে বসিয়া লোকটা জিনিসপত্র আগলাইতেছে। সেখানে নিতাই দেখিল বসন্ত নাই। সে জ্যোৎস্নালোকিত চারিদিকে দৃষ্টি প্রসারিত করিল। এ কি? তাহার বাসার দরজায় কয়জন লোক দাঁড়াইয়া কেন? সে আগাইয়া আসিয়া প্রশ্ন করিল—কে?

—আমরা।

নিতাই চিনিল, ব্যাপারী কাসেদ সেখের ছেলে—নয়ান ওরফে ননাইয়ের দল। সে প্রশ্ন করিল—কি? এখানে কি?

—মেয়েটা তোর বাসায় এসে ঢুকেছে।

—এসেছে, তোমরা দাঁড়িয়ে কেনে?

দলকে দল অট্টহাসি হাসিয়া উঠিল।

নিতাই বলিল—যাও তোমরা এখান থেকে। নইলে হাঙ্গামা হবে। আমি রাজাকে ডাকব, কনেষ্টবল আছে—তাকে ডাকব। নিতাই বাড়ী ঢুকিয়া দরজা বন্ধ করিয়া দিল। কিন্তু কোথায় বসন্ত? কোথাও তো নাই! কিন্তু ঘরের দরজার শিকল খোলা। দরজায় হাত দিয়া সে দেখিল—হ্যাঁ, দরজা বন্ধ।

নিতাই ডাকিল—ওহে ভাই, শুনছ? আমি—আমি।

—কে?

—তোমার 'কয়লা মাণিক'।

—কে! ওস্তাদ?

—ওস্তাদ কি ফোস্তাদ যা বল তুমি।

এবার দরজাটা খুলিয়া গেল। নিতাই ঘরে ঢুকিয়া দেখিল—বসন্ত ততক্ষণে আবার শুইয়া পড়িয়াছে। তাহারই বিছানাটা পাড়িয়া দিব্য আরাম করিয়া শুইয়াছে। বসন্তই বলিল—দরজাটা বন্ধ ক'রে দাও।

—বাইরের দরজা বন্ধ আছে।

—পাঁচিল টপকিয়ে ঢুকবে ভাই—বন্ধ কর। বসন্ত ক্লান্ত অথচ বিচিত্র হাসি হাসিল।

নিতাই তাহার কপালে হাত দিয়া চমকাইয়া উঠিল—এ কি? এ যে অনেকটা জ্বর!

মাথাটা একটু টিপে দেবে?

হাসিয়া নিতাই মাথা টিপিতে বসিল। বসন্ত হাসিয়া বলিল—না, তুমি ফোস্তাদ নও, ওস্তাদ—গানখানি কিন্তুক খাসা। তোমার বাঁধা?

—হ্যাঁ। কিন্তু ও গানটা বাতিল করে দিলাম।

—কেনে? চোখ বন্ধ করিয়াই বসন্ত প্রশ্ন করিল।

—ওটা আমার ভুল হয়েছিল।

মেয়েটি কোন উত্তর দিল না, শুধু একটু হাসিল।

—আবার নতুন গান বাঁধছি। সে গুন গুন করিয়া আরম্ভ করিল—

"করিল কে ভুল, হায়রে!
মন-মাতানো বাসে ভ'রে দিয়ে বুক
করাত-কাঁটার ধারে ঘেরা কেয়াফুল।"

বসন্তের মুখে নিঃশব্দ মৃদু-হাসি দেখা দিল, বলিল—তারপর?

—তারপর এখনও হয় নাই।

—গানটি আমাকে নিকে দিয়ো।

—আমার গান তুমি নিকে নেবে? গাইবে?

—হ্যাঁ।

জানালার দিকে চাহিয়া নিতাই বলিল—আজ শেষ করব!—কে? কে?

জানালার পাশ হইতে কে সরিয়া যাইতেছে? বসন্ত হাসিয়া বলিল—আবার কে? যত সব নরুকেদের দল।

নিতাই তাড়াতাড়ি আসিয়া জানালার ধারে দাঁড়াইল। স্বচ্ছ কোমল-জ্যোৎস্নার মধ্যে মানুষটি রেল লাইনের দিকে চলিয়াছে। দ্রুত চলন্ত কাশফুলের মত চলিয়াছে। মাথায় উজ্জ্বল স্বর্ণবিন্দুটি নাই।

বারো

জ্যোৎস্নার রহস্যময় শুভ্রতার মধ্যে দ্রুত চলন্ত কাশফুলটি যেন মিশিয়া মিলাইয়া গেল। নিতাই কবি স্তব্ধ হইয়া জানালার ধারে দাঁড়াইয়া রহিল। চোখে তাহার অর্থহীন দৃষ্টি, মনের চিন্তা অসম্বদ্ধ অস্পষ্ট, বুকের মধ্যে শারীরিক অনুভূতিতে কেবল একটা গভীর উদ্বেগ, সে যেন পাথর হইয়া গিয়াছে। বর্ণবৈচিত্র্যময়ী পৃথিবী যেন অসীম বৈরাগ্যে জ্যোৎস্নার আবরণে নিরাভরণ সকরুণ শুভ্র হইয়া উঠিয়াছে!

মুখরা স্বৈরিণী অসুস্থ দেহেও উৎকণ্ঠিত হইয়া উঠিয়া বসিল।

জীবনের অভিজ্ঞতা তাহার যত জটিল, তত কুটিল। পথচারিণী নিম্নশ্রেণীর দেহব্যবসায়িনীর রাত্রির অভিজ্ঞতা। সে অভিজ্ঞতায়—নিশাচর হিংস্র-জানোয়ারের মত মানুষই সংসারে ষোল আনার পনেরো আনা তিন পয়সা; সেই অভিজ্ঞতার শঙ্কায় শঙ্কিত বসন্ত উঠিয়া বসিল। যে দলটি বাড়ীর দরজার গোড়ায় দাঁড়াইয়া জটলা করিতেছিল, তাহারাই দলপুষ্ট হইয়া নিঃশব্দ লোলুপতায় নখর দন্ত মেলিয়া বাড়ীর চারিপাশে জুটিয়াছে বলিয়া তাহার ধারণা হইল। আক্রমণের চেষ্টা করিতেছে কি? উৎকণ্ঠিত হইয়া সে প্রশ্ন করিল—কি?

নিতাই উত্তর দিল না। সে যেমন স্তব্ধ নিস্পন্দ হইয়া দাঁড়াইয়া ছিল, তেমনিই দাঁড়াইয়া রহিল। ঠাকুরঝির রাগ তো সে জানে। খানিকটা গিয়াই সে দাঁড়ায়, পিছন ফিরিয়া তাকায়, ইঙ্গিতে বলে—আমায় ডাক, ডাকিলেই ফিরিব। আজ কিন্তু সে দাঁড়াইল না, চলিয়া গেল; এই রাত্রে একা সে চলিয়া গেল!

বসন্ত এবার উঠিয়া আসিয়া নিতাইয়ের পাশে দাঁড়াইল, জরোতপ্ত হাতে নিতাইয়ের হাত ধরিয়া সে প্রশ্ন করিল—কই?

এতক্ষণে সচকিত হইয়া নিতাই ফিরিয়া চাহিল। রূপে গুণে ক্ষুরধার স্বৈরিণীর রুগ্ন মুখে, ডাগর দীপ্ত চোখে অপরিমেয় ক্লান্তি—গভীর উৎকণ্ঠা। নিতাই সে মুখের দিকে চাহিয়া স্নেহকোমল না হইয়া পারিল না। সস্নেহে হাসিয়া সে বসন্তের কপালে মাথায় হাত বুলাইয়া বলিল—এত জ্বর, তুমি উঠে এলে কেনে? চল, শোবে চল। উঃ! ধান দিলে যেন খই হবে, এত তাপ!

—নচ্ছারগুলো ঘুরছে বুঝি চারিদিকে?

—নচ্ছারগুলো? নিতাই সবিস্ময়ে প্রশ্ন করিল। বসন্তের ভাবনার পথে যাহারা বিচরণ করিতেছিল, তাহাদের সে কল্পনা করিতে পারিল না।

বসন্তের ভ্রূ এবার কুঞ্চিত হইয়া উঠিল—খাপ হইতে ক্ষুরের ধার এবার উঁকি মারিল, সে প্রশ্ন করিল—তবে? কি? কে গেল? কি দেখছ তুমি?

চকিতে নিতাই এবার বসন্তের কল্পনার কথা বুঝিল, হাসিয়া সে বলিল—না, তারা নয়। ভয় নাই তোমার। এস, শোবে এস। সে তাহাকে আকর্ষণ করিল।

—কে যে গেল! কাকে দেখছিলে? কে উঁকি মেরে গেল?

—কে চিনতে পারলাম না!

—চিনতে পারলে না?

—না।

—তবে এমন ক'রে দাঁড়িয়ে ছিলে যে? যেন কত সর্ব্বনাশ হয়ে গিয়েছে তোমার?

বসন্তের শাণিত দৃষ্টি অন্ধকারের মধ্যেও যেন জ্বলিতেছিল।

নিতাই কোন উত্তর দিল না, শুষ্ক হাসিমুখে সে বসন্তের দিকে চাহিয়া রহিল।

বসন্ত অকস্মাৎ খিলখিল করিয়া হাসিয়া উঠিল—তীক্ষ্ণ দ্রুতহাসি। হাসিয়া বলিয়া উঠিল—আ মরণ আমার! চোখের মাথা খাই আমি! যে উঁকি মারলে তার মাথায় যে ঘোমটা ছিল! আসর থেকে তোমার পিছু পিছু উঠে এসেছিল। আমাকে দেখে—। আবার সেই খিলখিল হাসি।

নিতাইয়ের পা হইতে মাথা পর্য্যন্ত ঝিমঝিম করিয়া উঠিল। বসন্ত হাসিতে হাসিতে ঘরের খিল খুলিয়া বাহির হইয়া গেল।

নিতাই ডাকিল—ও ভাই, ও বসন!

দুয়ারের বাহির হইতে উত্তর আসিল—বসন নয় হে, কেয়াফুল, কেয়াফুল! টেনো না, করাত-কাঁটার ধারে সর্ব্বাঙ্গ ক্ষতবিক্ষত হয়ে যাবে।

নিতাইও বাহিরে আসিল।

স্বৈরিণী তখন কাসেদ সেখের ছেলে নয়ানের সঙ্গে কথা বলিতেছে।

নিতাই ডাকিতে গিয়াও পারিল না, লজ্জাবোধ হইল। আপনার দুয়ারটিতেই সে স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। ও দিকে স্টেশনের ধারে ঝুমুরের আসরে গান হইতেছে। আলোর ছটা গাছের ফাঁকে ফাঁকে আসিয়া এখানে ওখানে পড়িয়াছে। এদিকটা প্রায় জনহীন স্তব্ধ, আকাশের চাঁদ অস্তে চলিয়াছে, অন্ধকার ঘন হইয়া উঠিতেছে। ঘন অন্ধকারের মধ্যে নয়ান ও বসন্ত অদৃশ্য হইয়া গেল। নিতাই আকাশের দিকে চাহিয়া একা দাঁড়াইয়া রহিল। থাকিতে থাকিতে আবার তাহার মনে নূতন গান গুনগুন করিয়া উঠিল। ভগবান মানুষের মন লইয়া কি মজার খেলাই না খেলেন! এক ঘটে, মানুষ তাঁহার ছলনায় অন্ধ দেখে। ঠাকুরঝি বসন্তকে দেখিয়া চলিয়া গেল, বসন্ত ঠাকুরঝিকে দেখিয়া চলিয়া গেল। সে গুনগুন করিয়া তাই লইয়াই গান বাঁধিতে বসিল।

"বঙ্কিম বিহারী হরি বাঁকা তোমার মন।"

ঘটনাটার মধ্যে সে যেন নিয়তিকে বা দৈবের অদ্ভুত পরিহাস দেখিতে পাইয়াছে আজ। ঠিক তাহার ডোমজন্মের মতই এ পরিহাস নিষ্ঠুর। সে তাই গানের মধ্যে হরিকে স্মরণ না করিয়া পারিল না।

ভোরবেলাতে রাজার হাঁকে ডাকে নিতাইয়ের ঘুম ভাঙিয়া গেল। সে ঘরে আসিয়া গান বাঁধিতে বাঁধিতে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। চেতনা হইবামাত্র সেই অসমাপ্ত গানের কলিটাই প্রথমে গুঞ্জন করিয়া উঠিল তাহার মনে—

"বঙ্কিমবিহারী হরি বাঁকা তোমার মন,
কুটিল কৌতুকে তুমি হয়কে কর নয়—অঘটন কর সংঘটন।
দ্রোণের চোখের জলে অর্জ্জুন দেখে ভুজঙ্গ
সীতা দেখেন হরিণ স্বুবর্ণ তার অঙ্গ
রঙ্গ তোমার দেখে ধন্ধ লাগে চোখে—"

বাকীটা এখনও সে মিল করিতে পারে নাই—সেই কথাটাই তাহার প্রথম মনে হইল। কিন্তু বাহিরে রাজার হাঁকডাকের উচ্ছ্বাসটা আজ অতিরিক্ত। হয়তো নূতন কোন অভিনন্দন লইয়া রাজন তাহার দুয়ারে আসিয়াছে—ধৈর্য্য তাহার আর ধরিতেছে না। স্বভাবসিদ্ধ মৃদু হাসিমুখে সে আসিয়া দরজা খুলিয়া দিল। বাহিরে দাঁড়াইয়া রাজা—তাহার পিছনে ঝুমুর দলের প্রৌঢ়া। রাজা সটান ঘরের ভিতরে আসিয়া চারিদিকে দৃষ্টি ফিরাইয়া সকৌতুকে কাহাকে যেন খুঁজিতে আরম্ভ করিল।

নিতাই সবিস্ময়ে প্রশ্ন করিল—কি?

—কাঁহা? কাঁহা হ্যায় ওস্তাদিন?

—ওস্তাদিন?

হা-হা করিয়া হাসিয়া রাজা বলিল—সব ফাঁস হোগেয়া ওস্তাদ। সব ফাঁস হো-গেয়া। কাল রাতমে—সে হা-হা করিয়াই সারা হইল। কথা আর শেষ করিতে পারিল না।

নিতাই তবুও কথাটা বুঝিতে পারিল না।

বুঝাইয়া দিল প্রৌঢ়া। সে এতক্ষণ দুয়ারের বাহিরে দাঁড়াইয়া ছিল, এবার ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া হাসিয়া বলিল—আ মরণ! ও বসন্ত! বেরিয়ে আয় না লো, এই ট্রেনেই যাব যে আমরা!

নিতাই বলিল—সে তো এখানে নাই।

—নাই? সে কি? সে আসর থেকে বেরিয়ে এল, তুমি এলে সঙ্গে সঙ্গে।

আমি বলেও দিলাম তোমাকে। তারপর আমি খোঁজও করলাম; শুনলাম, তোমার ঘরেই—

নিতাই বলিল—হ্যাঁ, কজন লোক বিরক্ত করছিল ব'লে আমার ঘরেই এসেছিল। আমি এসে দেখলাম শুয়ে আছে, গায়ে অনেকটা জ্বর। কিন্তু খানিক পরেই বেরিয়ে সেই লোকের সঙ্গেই চলে গেল।

প্রৌঢ়া চিন্তিত হইয়া উঠিল; রাজার কৌতুক-হাস্য স্তব্ধ হইয়া গেল।

নিতাই বলিল—কাসেদ সেখের ছেলে নয়ানের সঙ্গে গিয়াছে। ওই ঝোঁপ বট-গাছটার তলাতেই যেন কথা কইছিল। আসুন দেখি।

তাহারা আগাইয়া গেল।

সেইখানেই পাওয়া গেল। বসন্ত সেইখানেই ছিল। অচেতনের মত পড়িয়া আছে।

বিপুল-পরিধি ছায়া নিবিড় বটগাছটির তলদেশটা ছায়ান্ধকারের জন্য তৃণহীন পরিষ্কার; সেইখানেই মাটির উপর বসন্ত তখনও গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়া আছে। কেশরাশ বিস্রস্ত অসম্বৃত, সর্ব্বাঙ্গ ধূলায় ধূসর, মুখের কাছে কতকগুলা মাছি ভন ভন করিয়া উড়িতেছে; পাশেই পড়িয়া আছে একটা খালি বোতল, একটা উচ্ছিষ্ট পাতা। কাছে যাইতেই দেশী মদের তীব্র গন্ধ সকলের নাকে আসিয়া ঢুকিল।

প্রৌঢ়া বলিল—মরণ! এই করেই মরবে হারামজাদী! বসন, ও বসন!

রাজা হাসিয়া বলিল—বহুত মাতোয়ারা হোগেয়া।

নিতাই দ্রুত সেখান হইতে চলিয়া গেল। কিছুক্ষণ পরেই ফিরিয়া আসিল এক কাপ ধূমায়মান চা হাতে লইয়া। দুধ না দিয়া কাঁচা চা, তাহাতে একটু লেবুর রস। কাঁচা চায়ে নাকি মদের নেশা ছাড়ে। মহাদেব কবিয়ালকে সে কাঁচা-চা খাইতে দেখিয়াছে। বসন্ত তখন উঠিয়া বসিয়াও ঢুলিতেছে অথবা টলিতেছে। প্রৌঢ়া বলিতেছে—এ আমি কি করি বল দেখি?

এই চাটা খাইয়ে দেন, এখুনি ছেড়ে যাবে নেশা।

চা খাইয়া সত্যই বসন্ত খানিকটা সুস্থ হইল। এতক্ষণে সে রাঙা ডাগর চোখ মেলিয়া চাহিল নিতাইয়ের দিকে।

প্রৌঢ়া তাড়া দিয়া বলিল—চল এইবার।

নিতাই বলিল—চান করিয়ে দিলে ভাল করতেন। সুস্থও হত, আর সর্ব্বাঙ্গে ধুলো লেগেছে—

তাহার কথা ঢাকা পড়িয়া গেল বসন্তের মত্ত খিলখিল হাসিতে। সে টলিতে টলিতে উঠিয়া দাঁড়াইল, নিতাইয়ের সম্মুখে আসিয়া জড়িত-কণ্ঠে বলিল—মুছিয়ে দাও না নাগর, দেখি কেমন দরদ!

নিতাই তাহার মুখের দিকে চাহিয়া একটু হাসিল—হাসিয়া কাঁধের গামছাখানা লইয়া সযত্নে বসন্তের সর্ব্বাঙ্গের ধুলা মুছাইয়া দিয়া বলিল—আচ্ছা, নমস্কার তা হ'লে।

প্রৌঢ়া তাহাকে ডাকিল—ও বাবা!

নিতাই ফিরিল।

—আমার কথাটার কি করলে বাবা? দলে আসবার কথা?

নিতাই কিছু বলিবার পূর্ব্বেই নেশায় বিভোর মেয়েটা আবার আরম্ভ করিয়া দিল সেই হাসি। সে হাসি তাহার যেন আর থামিবে না।

বিরক্ত হইয়া প্রৌঢ়া বলিল—মরণ! কালামুখে এমন সর্ব্বনেশে হাসি কেনে? দম ফেটে মরবি যে!

সেই হাসির মধ্যেই বসন্ত কোনরূপে বলিল—ওলো মাসী লো—কয়লা-মাণিকের মনের মানুষ আছে লো! কাল রাতে—হি-হি-হি—হি-হি-হি—হি-হি-হি—

রাজা এবার অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া মেয়েটাকে একটা ধমক দিয়া উঠিল—কেঁও এইসা ক্যাক্ ক্যাক্ করতা হ্যায়?

বসন্তের চোখ দুইটা জ্বলিয়া উঠিল। কিন্তু পরক্ষণেই সে আবার হাসিতে আরম্ভ করিল—হি-হি-হি—হি-হি-হি—

ও-দিকে স্টেশনে ট্রেনের ঘণ্টা পড়িল; স্টেশন-মাস্টার নিজে ঘণ্টা দিতে দিতে হাঁকিতেছিল—রাজা! এই রাজা!

রাজা ছুটিল, নতুবা একটা অঘটন ঘটা অসম্ভব ছিল না।

নিতাই হাসিয়া বলিল—আচ্ছা, আসুন তা হ'লে। সঙ্গে সঙ্গে সেও আপনার বাসার দিকে ফিরিল।

প্রৌঢ়া এবার কঠিন-স্বরে বলিল—বসন! আসবি, না এইখানে মাতলামি করবি?

বসন্ত শিথিল পদে চলিতে আরম্ভ করিল, কিন্তু হাসি তাহার তখনও থামে নাই।

সহসা ফিরিয়া দাঁড়াইয়া হাত নাড়িয়া ইসারা করিয়া সে চীৎকার করিয়া বলিল—চললাম হে!

নিতাই আসিয়া বসিল কৃষ্ণচূড়াগাছটির তলায়। গত রাত্রির গানটি সে সম্পূর্ণ করিবার চেষ্টা করিতেছিল।

"রঙ্গ তোমার দেখে—ধন্ধ লাগে চোখে—"

বাকীটা আর কিছুতেই মনে আসিতেছে না। 'সভয়ে মুদি নয়ন'—কয়েকবার মনে আসিয়াছে কিন্তু মনঃপূত হয় নাই। 'তাই চরণে নিলাম শরণ'—এও পছন্দ হয় নাই।

ট্রেনটা স্টেশন হইতে ছাড়িয়া সশব্দে সম্মুখ দিয়া পার হইয়া চলিয়াছিল। একটা কামরায় ঝুমুরের দলটাকে দেখা গেল। বসন্ত মেয়েটি একধারে দরজার পাশেই বসিয়া জানালায় মাথা রাখিয়া একেবারে এলাইয়া পড়িয়াছে। অদ্ভুত মেয়ে! নিতাই হাসিল। ঝুমুর সে অনেক দেখিয়াছে, কবিগান করিতে ইহাদের সঙ্গে মেলা-মেশাও অনেক করিয়াছে, কিন্তু এমন নিষ্ঠুর ব্যবসায়িনী সে দেখে নাই। তবে মেয়েটার গুণ আছে, রূপও আছে। গত রাত্রের গানটা তাহার মনে পড়িয়া গেল—

"করিল কে ভুল হায় রে!
মন মাতানো বাসে ভরে দিয়ে বুক
করাত-কাঁটার ধারে ঘেরা কেয়াফুল।"

ট্রেন চলিয়া গেল। নিতাই চাহিয়া রহিল রেল-লাইনের বাঁকের দিকে, যেখানে সমান্তরাল লাইন দুইটি এক বিন্দুতে মিশিয়া গিয়াছে বলিয়া মনে হয়। বসন্ত চলিয়া গেল, আর হয়তো কখনও দেখা হইবে না। অদ্ভুত মেয়ে! ক্ষণে ক্ষণে মেয়েটার এক এক রূপ, এক রাত্রে তিন-তিনখানা গান উহাকে লইয়াই মনে আসিয়াছে। সে খানিকটা উদাস হইয়া রহিল। অকস্মাৎ সে সচেতন হইয়া উঠিল। ওইখানে এখনই এক সময় একটি স্বর্ণবিন্দু ঝকমক করিয়া উঠিবে, তাহার পর দেখা যাইবে—ওই স্বর্ণবিন্দুটির নীচে চলন্ত একটি শুভ্র রেখা। স্বর্ণবিন্দু-বিচ্ছুরিত জ্যোতিরেখাটি মধ্যে মধ্যে চমকের মত চোখে লাগিয়া চোখ ধাঁধিয়া দিবে। অসমাপ্ত গানগুলি অসমাপ্তই থাকিয়া গেল, স্থিরদৃষ্টি পথের উপর রাখিয়া নিতাই বসিয়া রহিল।

কই?

ওই কি? না, ও তো নয়। চোখের ভ্রম নিতাইয়ের। মনের প্রত্যাশিত কল্পনা—প্রত্যক্ষ দিবালোকে মরীচিকার মত মধ্যে মধ্যে স্পষ্ট হইয়া ফুটিয়া উঠিতেছে। নিতাই হাসিল। এই তো বেলা সবে দশটা। ঠাকুরঝি আসে ঘড়ির কাঁটাটির মত বারোটার ট্রেনের ঠিক আগে।

গাছের গুঁড়িতে ঠেস দিয়া নিতাই ঘুমাইতে চেষ্টা করিল। ঘণ্টাগুলা আজ যেন যাইতেই চাহিতেছে না।

ওই! হ্যাঁ, ওই আসিতেছে। চলন্ত সাদা একটি রেখার মাথায় স্বর্ণাভ একটি বিন্দু। কিন্তু না, ও তো নয়, রেখাটির গতি-ভঙ্গি তো তেমন দ্রুত নয়, রেখাটিও তেমন সরল দীঘল নয়!

ওই আর একটি রেখা, এও নয়।

নিতাইয়ের ভুল হয় নাই। রেখাগুলি নিকটবর্ত্তী হইলে নারীমূর্ত্তিগুলি স্পষ্ট হইয়া উঠিল, কিন্তু তাহাদের মধ্যে কেহই ঠাকুরঝি নয়। এ মেয়েগুলিও এই গ্রামে দুধ বেচিতে আসে। একে একে তাহারা সকলেই গেল। কিন্তু ঠাকুরঝি কই?

বেলা বারোটার ট্রেন চলিয়া গেল।

রাজা আসিয়া ডাকিল—ওস্তাদ!

সচকিত হইয়া নিতাই হাসিয়া বলিল—রাজন!

—কেয়া ধ্যান করতা ভাই, হিঁয়া বইঠকে?

অপ্রস্তুতের মত নিতাই শুধু খানিকটা হাসিল।

—তুমারা উপর হাম গোসা করেগা।

—কেন রাজন, কেন? কি অপরাধ করলাম ভাই?

—ওহি ঝুমুরওয়ালী বোলা তুমারা দিলকে আদমী, মনকে মানুষ—

নিতাই হা-হা করিয়া হাসিয়া উঠিল। তারপর রাজার হাত ধরিয়া টানিয়া বলিল—চল, চা খেয়ে আসি। চা খাওয়া হয় নাই, ঠাকুরঝি আজ আসে নাই দুধ নিয়ে। ঝুমুরওয়ালীর কথায় তুমি বিশ্বাস করেছ? আমার মনের মানুষ তা হ'লে তুমি।

—হাম? রাজা বিকট হাসিতে স্থানটি চমকিত করিয়া দিল। সে তাহাকে জড়াইয়া ধরিয়া বলিল—চুমু খাগা ওস্তাদ? আবার সেই বিকট হাসি।

তেরো

একদিন, দুইদিন, তিনদিন।

ঠাকুরঝি আসিল না। চতুর্থ দিনে উৎকণ্ঠিত হইয়া নিতাই স্থির করিল, আজ ঠাকুরঝি না আসিলে ঠাকুরঝির গ্রামে গিয়া খোঁজ করিয়া আসিবে।

বারোটার ট্রেন চলিয়া গেল, সেদিনও ঠাকুরঝি আসিল না। অন্যান্য মেয়েরা যাহারা দুধ দিতে আসে, তাহারা আসিয়া ফিরিয়া গেল। নিতাইয়ের বার বার ইচ্ছা হইল—

উহাদের কাছে সংবাদ লয়, কিন্তু সেও সে কিছুতেই পারিল না। কেমন সঙ্কোচ বোধ করিল। নিজেই সে আশ্চর্য্য হইয়া গেল—বার বার মনে হইল, কেন সঙ্কোচ, কিসের সঙ্কোচ? কিন্তু তবু সে সঙ্কোচকে নিতাই কাটাইয়া উঠিতে পারিল না। চুপ করিয়া সে আপনার বাসায় বসিয়া ভাবিতে বসিল। ভাবিতেছিল—কোন্ অজুহাতে ঠাকুরঝির শ্বশুরগ্রামে গিয়া উঠিবে? ভাবিয়া চিন্তিয়া সে ঠিক করিল হাঁস, মুরগী অথবা ডিম কিনিবার অছিলায় যাইবে। ঠাকুরঝির শ্বশুরদের হাঁস মুরগী আছে সে জানে। সংসারের তুচ্ছতম সংবাদটি পর্য্যন্ত ঠাকুরঝি তাহাকে বলিয়াছে। দেওয়ালে কোথায় একটি স্চ গাঁথা আছে, নিতাই সেটি গিয়া স্বচ্ছন্দে—চোখ বন্ধ করিয়া লইয়া আসিতে পারে।

—ওস্তাদ রয়েছ নাকি? রাজার কণ্ঠস্বর।

নিতাই আশ্চর্য্য হইয়া গেল, রাজা বাংলায় বাত বলিতেছে! বিস্মিত হইয়া সে হিন্দীতে উত্তর দিল—রাজন, আও মহারাজ, কেয়া খবর?

রাজা আসিয়া খবর দিল—বিষণ্ণভাবে বাংলাতেই বলিল—খারাপ খবর ওস্তাদ, ঠাকুরঝিকে নিয়ে তো ভারী মুশকিল হয়েছে ভাই।

নিতাইয়ের বুকের ভিতরটা ধড়াস করিয়া উঠিল। সে কোন প্রশ্ন করিতে পারিল না, উৎকণ্ঠিত শুষ্কমুখে রাজার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

—আজ দিন তিনেক হ'ল, কি হয়েছে ভাই, ওই ভাল মেয়ে—লক্ষ্মী মেয়ে, শ্বশুর-শাশুড়ী-ননদ-মরদ সবারই সঙ্গে ঝগড়া ঝাঁটি করছে—মাথামুণ্ড খুঁড়ছে। কাল রাত থেকে আবার মূর্চ্ছা যাচ্ছে। দাঁত লাগছে, হাত পা কাঠির মত করছে।

অপরিসীম উদ্বেগে নিতাইয়ের বুকের ভিতরটা অস্থির হইয়া উঠিল। রাজার হাত দুইখানা চাপিয়া ধরিয়া বলিল—দেখতে যাবে রাজন?

রাজা বলিল—বউ গেল দেখতে, ফিরে আসুক। আমরা ও-বেলায় যাব।

নিতাইয়ের চোখে জল আসিয়াছিল, মাথা নীচু করিয়া সে বসিয়া রহিল।

রাজা একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল—বড় ভাল মেয়ে ওস্তাদ। আবার কিছুক্ষণ পর রাজা বলিল—ওঃ, ঠাকুরঝির স্বামীটি যা কাঁদছে! হাউ-হাউ করে কাঁদছে। ছেলেমানুষ, ভাব-সাবটি হয়েছে ঠাকুরঝির সঙ্গে। বেচারা! রাজা একটু ম্লান হাসি হাসিল।

টপ টপ করিয়া দুই ফোঁটা চোখের জল নিতাইয়ের চোখ হইতে এবার ঝরিয়া পড়িল সে তাড়াতাড়ি খেলাচ্ছলে আঙুল দিয়া জলের চিহ্ন দুইটা বিলুপ্ত করিয়া দিল। কিছুক্ষণ পরে একটা গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া সে ডাকিল—রাজন!

—ওস্তাদ!

—ডাক্তার বদ্যি কিছু দেখানো হয়েছে?

হতাশায় ঠোঁট দুইটা দুইপাশে টানিয়া রাজা বলিল—এতে আর ডাক্তার বদ্যি কি করবে ওস্তাদ? এ তোমার নিঘ্যাত অপদেবতা, না হয় ডাইনী ডাকিনী কি কোন দুষ্ট লোকের কাজ।

কথাটা নিতাইয়ের মনে ধরিল। চকিতে মনে হইল, তবে কি ওই ক্ষুরধার মেয়েটার কাজ! ঝুমুর দলের স্বৈরিণী—উহাদের তো অনেক বিদ্যা জানা আছে, বশীকরণে তো উহারা সিদ্ধহস্ত।

রাজা বলিল—মা কালীর থানে ভরনে দাঁড় করাবে আজ ঠাকুরঝিকে। কি ব্যাপার বিত্তান্ত আজই জানা যাবে।

আরও কিছুক্ষণ বসিয়া থাকিয়া রাজা উঠিল, নিতাইয়ের হাত ধরিয়া টানিয়া হিন্দীতে বলিল—আও ভেইয়া, থোড়াসে চা পিয়েগা।

অনেকক্ষণ পর রাজা যেন সহজ হইয়া উঠিল।

* * *

রাজার বাড়ীতেই নিতাই বসিয়া রহিল। রাজার স্ত্রী সংবাদ লইয়া ফিরিয়া আসিবে—সেই সংবাদের প্রত্যাশায় উৎকণ্ঠিত ব্যগ্র হইয়া বসিয়া রহিল। রাজা দুঃখ কষ্ট শোক সন্তাপের মধ্যেও রাজা। সে প্রচুর মুড়ি, বেগুনি, আলুর চপ, কাঁচালঙ্কা, পেঁয়াজ, আধসেরটাক সন্দেশ আনিয়া হাজির করিল।

নিতাই বলিল—এ সব কি হবে? এ সমারোহ তাহার ভাল লাগিতেছিল না।

—খানে তো হোগা ভেইয়া; পেট তো নেই মানেগা! লাগাও খানা। তারপর সে চীৎকার আরম্ভ করিল—এ বাচ্চা! এ বেটা!

ডাকিতেছিল সে ছেলেটাকে। রাজার ছেলের ধরনটা অনেকটা সে আমলের যুবরাজের মতই বটে, দিনরাত্রিই সে মৃগয়ায় ব্যস্ত, একটা গুলতি হাতে মাঠে মাঠে ঘুরিয়া বেড়ায়। শালিক, চড়ুই, কোকিল, কাক—যাহা পায় তাহাই হত্যা করে। হত্যার উদ্দেশ্য হত্যা। খাওয়ার লোভ নাই। যুবরাজ বোধ হয় আজ দূরে গিয়া পড়িয়াছিল, সাড়া পাওয়া গেল না। রাজা চটিয়া চীৎকার করিয়া হাঁক দিল—এ শূয়ার কি বাচ্চা, হারামজাদোয়া—

তবুও কোন সাড়া পাওয়া গেল না। রাজা নিতাইকে বলিল—কি-ধার গিয়া ওস্তাদ। তারপর হাসিয়া বলিল—উ বাতঠো—কেয়া বোলতা তুম ওস্তাদ? কেয়া?—তেপান্তরকে মাঠকে উধার—কেয়া? মায়াবিনী, না কেয়া?

এমন ধারার চীৎকারে সাড়া না পাইলে নিতাই বলে—যুবরাজ বোধ হয় তেপান্তরের মাঠ পেরিয়ে মায়াবিনী ফড়িং কি পক্ষিণীর পেছনে ছুটেছে রাজন।

আজ কিন্তু নিতাইয়ের ও-কথাও ভাল লাগিল না। একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া সে একটু ম্লান হাসি হাসিল, কেবল রাজার মনরক্ষার জন্য।

রাজাও আর ছেলের খোঁজ করিল না, দুইটা পাত্র বাহির করিয়া আহার্য্য ভাগ করিয়া একটা নিতাইকে দিয়া, অপরটা নিজে টানিয়া লইয়া বিনাবাক্যব্যয়ে খাইতে আরম্ভ করিয়া দিল। বলিল—খানে দেও ভেইয়া শূয়ার-কি বাচ্চেকো। নসীবমে ভগবান উস্কো নেহি দিয়া, হাম কেয়া করেগা?

নিতাই স্তব্ধ হইয়া রহিল। সে ভাবিতেছিল, ঠাকুরঝির কথা। চোখের সম্মুখে হেমন্তের মাঠে প্রান্তরে ফসলে ঘাসে পীতাভ রং ধরিয়াছে, তাহার প্রতিচ্ছটায় রৌদ্রেও পীতবর্ণের আমেজ। উর্দ্ধলোকে সূক্ষ্ম ধূলি আস্তরণের ধূসরতা। নিতাই যেন চারিদিকে স্বর্ণবিন্দুশীর্ষ কাশফুল ফুটিয়া উঠিতে দেখিতেছিল। কোনদিকে কিছুক্ষণ চাহিয়া থাকিলেই মনে হইতেছিল, ধূসর দিগন্তের মধ্যে একটি একটি স্বর্ণবিন্দুশীর্ষ কাশফুল দুলিতেছে।

রাজার খাওয়া শেষ হইয়া আসিয়াছিল, সে তাগাদা দিয়া বলিল—খা লেও ভাই ওস্তাদ।

ম্লান হাসিয়া নিতাই বলিল—না।

—দূর, দূর; খা লেও। পেটমে যানেসে গুণ করেগা। ভবিয়ৎ ঠিক হোযায়েগা।

—ভবিষ্যৎ ভালই আছে রাজন, কিন্তু মুখে রুচবে না।

—কাঁহে? মুখমে কেয়া হুয়া ভাই?

অকস্মাৎ রাজার হাত দুইটি চাপিয়া ধরিয়া নিতাই বলিল—সেদিন তুমি শুধাইছিলে—মনের মানুষের কথা।

—হাঁ। রাজা কথাটা বুঝিতে পারিল না, সে ওস্তাদের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

—আমার মনের মানুষ, রাজন, ওই ঠাকুরঝি। ঠাকুরঝিই আমার মনের মানুষ। ঝরঝর করিয়া নিতাই কাঁদিয়া ফেলিল। রাজার খাওয়া বন্ধ হইয়া গেল, বিস্ময়বিস্ফারিত চোখে কবিয়ালের দিকে সে চাহিয়া রহিল। সে বিশ্বাস করিতে পারিতেছিল না। অন্য সময় হইলে সে হয়তো বিকট হাস্যে কথাটা এই মুহূর্ত্তে পৃথিবীময় প্রচার করিয়া দিত, কিন্তু ঠাকুরঝির জন্য তাহার বেদনাভারাক্রান্ত মন আজ তাহা পারিল না। স্তব্ধ হইয়া দুইজনেই বসিয়া রহিল।

কতক্ষণ পরে কে জানে চীৎকার করিতে করিতে প্রবেশ করিল রাজার স্ত্রী।

ব্যগ্র উৎকণ্ঠিত স্বরে নিতাই প্রশ্ন করিতে গিয়া শত প্রশ্নের মধ্য হইতে কম্পিত কণ্ঠে কোনমতে উচ্চারণ করিল কেবল একটি কথা—কি হ'ল ?

রাজার স্ত্রী যেন অগ্নিস্পৃষ্ট বিস্ফোরকের মত ফাটিয়া পড়িল—ডাইন, ডাকিন, রাক্ষস—

তারপর সে অশ্লীল কদর্য্য অশ্রাব্য বিশেষণে নিতাইকে বিপর্য্যস্ত করিয়া দিল।

নিতাইয়ের মুখের উপর আঙুল দেখাইয়া বলিল—তুই, তুই, তুই। তোর নজরেই কচি মেয়েটার আজ এই অবস্থা! এত লোভ তোর ? তোর মনে এত পাপ ?

আজ ঠাকুরঝিকে নাকি কালী মায়ের ভবনে দাঁড় করানো হইয়াছিল। সকাল হইতে উপবাসী রাখিয়া দ্বিপ্রহরের রৌদ্রে তাহাকে একখানা মন্ত্রপূত পিঁড়ির উপর দাঁড় করাইয়া সম্মুখে প্রচুর ধূপ-ধুনা দিয়া কালী মায়ের দেবাংশী একগাছা ঝাঁটা হাতে তাহার সামনে দাঁড়াইয়া প্রশ্ন করিয়াছিল—কালী, করালী, নরমুণ্ডমালী! ভূত, পেরেত, ডাকিনী, যোগিনী, হাকিনী, শাকিনী, রাক্ষস 'পিচাশ' যে মন্দ করেছে মা, তাকে তুমি নিয়ে এস ধরে। তার রক্ত তুমি খাও মা।

ঠাকুরঝি থরথর করিয়া কাঁপিয়াছিল।

—বল্ বল্ ? কে তোকে এমন করলে বল্ ? দোহাই মা কালীর!

ঠাকুরঝি তবুও কোন কথা বলে নাই, কেবল উন্মাদের মত দৃষ্টিতে চাহিয়া যেমন কাঁপিতেছিল তেমনি কাঁপিয়াছিল। এবার ব্রজনাদে দুর্ব্বোধ্য মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া দেবাংশী সপাসপ্ মন্ত্রপূত ঝাঁটা দিয়া প্রহার করিয়াছিল, তখন অস্থির অধীর ঠাকুরঝি বলিয়াছিল—বলছি বলছি, আমি বলছি।

সে নাম করিয়াছে নিতাইয়ের; বলিয়াছে—ওস্তাদ, কবিয়াল। আমাকে লালফুল দিলে। তারপর সে উদ্‌ভ্রান্ত মৃদুস্বরে গান আরম্ভ করিয়া দিয়াছিল—

"কাল চুলে রাঙা কোসম হেরেছ কি নয়নে ?"

রাজার স্ত্রীর মনে পড়িয়াছিল—নিতাইয়ের বাসার জানালা দিয়া দেখা ছবি—নিতাই, ঠাকুরঝির চুলে ফুল গুঁজিয়া দিয়াছিল। সে বোনকে সমর্থন করিয়া সচীৎকারে সমস্ত প্রকাশ করিয়া দিয়াছে।

রাজার স্ত্রী চীৎকার করিয়াই সমস্ত প্রকাশ করিয়া দিল; অবশেষে নিতাইকে গালিগালাজে—শরবিদ্ধ জীবের মত জর্জ্জরিত করিয়া তুলিল।

হ্যায় ? উতার আও ওস্তাদ, উতার আও।—রাজার কণ্ঠের আর্ত্ত মিনতি মুহূর্ত্তের জন্য নিতাইকে বিচলিত করিয়া তুলিল। পরক্ষণেই সে আত্মসম্বরণ করিয়া হাসিল। মনে মনেই বলিল—হ্যাঁ, দুনিয়া ভোর বায়না আয়া হ্যায় রাজন।

ইতিমধ্যেই কিন্তু ট্রেন প্ল্যাটফর্ম পার হইয়া দ্রুতগতিতে বাহির হইয়া গেল।

চৌদ্দ

ট্রেনখানা চলিতেছিল দক্ষিণমুখে। বাঁ পাশে পূর্ব্বদিগন্তে চতুর্দ্দশীর চাঁদ উঠিতেছিল—আকাশে পাতলা মেঘের আভাস দেখা দিয়াছে, কুয়াসার মত পাতলা মেঘের আবরণের আড়ালে চাঁদের রঙ ঠিক গুড়া হলুদের মত হইয়া উঠিয়াছে। নূতন বরের মত চাঁদ যেন গায়ে হলুদ মাখিয়া বিবাহ-বাসরে চলিয়াছে। নিতাই মুগ্ধ দৃষ্টিতে চাঁদের দিকেই চাহিয়াছিল। ছোট লাইনের ট্রেনগুলি বড় বেশী দোলে, আর শব্দও করে বড় লাইনের ট্রেনের চেয়ে অনেক বেশী—শূন্য কুম্ভের মত। যে লোকটি নিতাইকে লইতে আসিয়াছিল, সে ঝুমুর দলের বায়েন অর্থাৎ বাদ্যকর, সে বেশ খানিকটা নেশার আমেজে ছিল, ট্রেনের এই অত্যধিক শব্দে এবং ঝাঁকুনিতে বিরক্ত হইয়া সে বলিল—এ যে ঝাঁপতাল লাগিয়ে দিলে ওস্তাদ।

লোকটি ট্রেনের শব্দের সঙ্গে মিলাইয়া বেঞ্চ বাজাইয়া বাজনা আরম্ভ করিয়া দিল। দেখাদেখি ওপাশের বেঞ্চে দুইটা ছোট ছেলে ট্রেনের শব্দের মর্ম্মার্থ উদ্ধার আরম্ভ করিল। একজন বলিল, কাঁচা-তেঁতুল—পাকা-তেঁতুল ! কাঁচা-তেঁতুল—পাকা-তেঁতুল !

নিতাইয়ের মন কিন্তু কিছুতেই আকৃষ্ট হইল না। চাঁদের দিকে চাহিয়া সে ভাবিতেছিল—ঠাকুরঝির কথা, রাজনের কথা, যুবরাজের কথা, বণিক মাতুলের কথা, বিপ্রপদের কথা, কৃষ্ণচূড়াগাছটির কথা, স্টেশনটির কথা, গ্রামখানির কথা। মধ্যে মধ্যে ইচ্ছা হইতেছিল—পরের স্টেশনেই সে নামিয়া পড়িবে। কিন্তু তাও সে পারিল না। হঠাৎ একসময়ে সে অনুভব করিল—নিজের অজ্ঞাতসারেই তাহার চোখ কখন জলে ভরিয়া উঠিয়াছে। চোখের জল মুছিয়া ফেলিয়া একটুখানি ম্লান হাসিয়া এতক্ষণে সে সচেতন হইয়া উঠিল। পরক্ষণেই স্বাভাবিক সুকণ্ঠে সে তান ধরিল—আহা ! বার দুই-তিন তা-না—না করিয়া সুর ভাঁজিয়া গান ধরিল —

"চাঁদ তুমি আকাশে থেকো আমি তোমায় দেখব খালি।
ছোঁয়ার সাধে কাজ নাইক—সোনার অঙ্গে লাগবে কালি।"

বাজনদারটা নেশার মধ্যেও সজাগ হইয়া বসিয়া বলিল—বাহবা ওস্তাদ ! গলাখানা

পেয়েছিল বটে বাবা। বলিয়াই সে ধরতার মুখে বেঞ্চে একটা প্রকাণ্ড চাপড় মারিয়া বলিল—হেঁই—তা—তেরে কেটে—তা—তা। গাহিতে গিয়া নিতাই পরের কলি বদলাইয়া দিল। মন যেন গানে ভরিয়া উঠিয়াছে, সুরে ফেলিলেই সে গান হইয়া বাহির হইয়া আসিতেছে—

"না না, তাও করো মার্জ্জনা—আজ থেকে আর তাও দেখব না—
জানতাম নাকো এই কু-চোখের দিষ্টিতে বিষ দেয় হে ঢালি।"

স্টেশনের পর স্টেশন অতিক্রম করিয়া ট্রেন চলিয়াছিল। নিতাই গানখানা বার বার ফিরাইয়া ফিরাইয়া গাহিয়া চলিয়াছে। গাহিয়া যেন তাহার তৃপ্তি হইতেছে না।

ট্রেনটা খট্ খট্ শব্দে লাইনের জোড়ের মুখ অতিক্রম করিয়া একটা স্টেশনে আসিয়া ঢুকিল। স্টেশনে জমাদার হাঁকিতেছে—কান্দরা, রামজীবন পু—র্ ! বাজনদার জানালা দিয়া মুখ বাড়াইয়া স্টেশনটার চেহারা দেখিয়াই ব্যস্ত হইয়া বলিল—ওই, চলে আইচে লাগচে। নামো—নামো—ওস্তাদ নামো।

নিতাই নামিল, কিন্তু গান বন্ধ করিল না। গলা নামাইয়া মৃদুস্বরে গাহিতে গাহিতেই সে স্টেশন পার হইয়া পথে নামিল।

"তাই চলেছি দেশান্তরে আঁধার খুঁজেই ফিরব ঘুরে
কাকের মুখে বার্ত্তা দিও—ষোল কলায় বাড়ছ খালি।"

স্টেশন হইতে মাইল দুয়েক হাঁটা-পথ। হাঁটা-পথ ধরিয়া নিতাইয়ের মনের অবসাদ অনেকখানি কাটিয়া আসিল। রাসপূর্ণিমায় আলেপুরের মেলা বিখ্যাত মেলা। কাতারে কাতারে লোক যায় আসে। চতুর্দ্দশীর প্রায় পূর্ণচন্দ্রের জ্যোৎস্নার মধ্যেও দুই মাইল দূরবর্ত্তী মেলাটার উপরের আকাশখণ্ড আলোর আভায় ঝলমল্ করিতেছে। ইহার পূর্ব্বেও নিতাই দেখিবার জন্য এ মেলায় আসিয়াছে। কেবল আলো—আলো আর আলো, সেই আলোর ছটায় উজ্জ্বল পণ্য-সম্ভার ভরা সারি সারি দোকান, আর পথে ঘাটে মাঠে শুধু লোক—লোক আর লোক। মেলাটার স্থানে স্থানে নানা আনন্দের আসর-যাত্রা, কবি, পাঁচালী, ঝুমুর। চারিপাশে কাতারে কাতারে দর্শক। এমনই একটি আসরে আজ তাহাকে গান করিতে হইবে। কবি ও ঝুমুর দল এক হইয়া অপর একটি এমনই দলের সহিত পাল্লা দিয়া গান করিবে। সঙ্গের লোকটি বলিয়াছে, তাহাকেই মুখপাত—অর্থাৎ মুখপাত্র হিসাবে গান করিতে হইবে। তাহাদের যে লোকটা এমন আসরে গান করিত, সে লোকটা বসন্তের সঙ্গে ঝগড়া করিয়া তাহার প্রণয়িনীকে লইয়া অন্যদলে চলিয়া গিয়াছে। তাহার গলা একেবারে নষ্ট হইয়া

গিয়াছিল, লোকটাও ছিল দুর্দান্ত মাতাল, গান বাঁধিবার ক্ষমতাও তাহার আর তেমন ছিল না। গতকাল একটা গানের সুরতাল লইয়া বসন্তের সঙ্গে ঝগড়া বাধিয়াছিল। দুইজনেই ছিল মত্তাবস্থায়। শেষ পর্য্যন্ত লোকটা বসন্তকে অশ্লীল গাল দেওয়ায় বসন্ত তাহার পিঠে ঝাঁটার আঘাত বসাইয়া দিয়াছিল। ফলে লোকটা তাহার প্রণয়িনী মেয়েটাকে লইয়া অন্য দলে চলিয়া গিয়াছে। উপায়ান্তর না দেখিয়া প্রৌঢ়া নিতাইকে স্মরণ করিয়াছে। মান-সম্মানের সমস্ত ভরসা এখন নিতাইয়ের উপর। সেইজন্য একান্ত অনুরোধ জানাইয়া ঝুমুর দলের নেত্রী প্রৌঢ়া তাহার কাছে লোক পাঠাইয়াছে। মনে মনে একটা খুব ভাল ধুয়া রচনা করিতে করিতে সে পথ চলিতেছিল—দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল ওই আলোকোজ্জল আকাশের দিকে। ঠাকুরঝি, রাজন, 'যোবরাজ', কৃষ্ণচূড়ার গাছ সমস্তই সম্মুখের ওই ভাস্বর আলোকে আলোকিত তাহার নিজের পিছনের দীর্ঘ ছায়ার অন্ধকারে ঢাকিয়া গিয়াছে। সে যত সম্মুখে আগাইয়া চলিয়াছে, পশ্চাতের ছায়া দৈর্ঘ্যে পরিধিতে তত বড় এবং ঘন হইয়া উঠিতেছে—সেই ক্রমবর্দ্ধমান ছায়ার অন্ধকারে ক্রমশ যেন বিলুপ্ত হইয়া আসিতেছে।

তাহার মনকে টানিতেছে মেলার আসর। ঠাকুরঝির চিন্তা, সেখানকার সকলের চিন্তাকে দুঃখকে ছাপাইয়া মনের মধ্যে অদ্ভুত একটা উত্তেজনা জাগিয়া উঠিতেছে। আজ সে কবিয়াল হইয়া আসরে নামিবে। চণ্ডীমায়ের মেলায় মহাদেবের সঙ্গে পাল্লা হইয়াছিল বটে, কিন্তু সে এক আর এ এক। আজ সে সত্যই কবিয়াল বলিয়া স্বীকৃত হইয়া মেলায় গাওনা করিতে চলিয়াছে। এমন ভাগ্য কখনও হইবে, সে ভাবে নাই।

সে গাহিবে, বসন্ত নাচিবে। অপর মেয়েগুলিকে সে নাচিতে দিবে না। আসরে বসিয়া তাহারা দোহারকি করিবে। কল্পনা করিতে করিতে তাহার মনে একটা কলি আসিয়া গেল ;

"গোকুলের কূলে কালো কালিন্দীরই জলে—হেলে-দোলে সোনার কমলা।
কালো হাতে ছুঁয়ো নাকো, লাগিবে কালি—ওহে কুটিল কালা।"

সঙ্গে সঙ্গেই সুরে ফেলিয়া সে গুনগুন করিয়া গান ভাঁজিতে আরম্ভ করিয়া দিল। অপর দলের কবিয়াল নাকি বেজায় রঙদার লোক, গোড়া হইতেই সে রঙ তামাসা আরম্ভ করিয়া দেয়। রঙের জোরেই সে আসর জিতিয়া লয়। নিতাই কিছুতেই প্রথম হইতে রঙ আরম্ভ করিবে না। মানুষ কেবল মন্দই ভালবাসে, ভুখে তাহার অরুচি—এ কথা নিতাই বিশ্বাস করে না। যদি অরুচি দেখে তবে মন্দই সে দিবে। দেখাই যাক না।

হঠাৎ একটা লোকের সঙ্গে ধাক্কা খাইয়া নিতাইকে দাঁড়াইতে হইল। মেলার অতি নিকটে আসিয়া পড়িয়াছে, পথের জনতা ঘন হইয়া উঠিয়াছে। কবিয়ালীর চিন্তায় বিভোর হইয়াই নিতাই অত্যন্ত দ্রুতগতিতে চলিতেছিল, হঠাৎ লোকটার সহিত ধাক্কা বেশ একটু জোরেই লাগিয়া গেল। লোকটা ক্রুদ্ধ হইয়া বলিল—কানা না কি? একেবারে হন্তে হয়ে ছুটেছে!

নিতাই অবনত হইয়া হাতজোড় করিয়া বলিল—অন্যায় হয়ে গিয়েছে ভাই।

লোকটা অপেক্ষাকৃত শান্ত হইয়া বলিল—অ:, একেবারে ঠাঁই করে লেগেছে—

নিতাই বলিল—তবে দোষ একা আমার নয়, বেবেচনা ক'রে দেখুন!

লোকটা এবার হাসিয়া ফেলিল।

এই অন্ধকার মোড়টা ফিরিয়াই মেলা। মেলার এক প্রান্তে একটা গাছের তলায় খড়ের ছোট ছোট ঘর বাঁধিয়া ঝুমুরের দলটি আস্তানা গাড়িয়াছে। আশেপাশে আরও গোটা কয়েক ঝুমুরের দল। তাহার পরই একটা খোলা জায়গায়—বেশ্যাপল্লী। নেশায় উন্মত্ত জনতার উচ্ছৃঙ্খল কোলাহলে নিতাইয়ের গানের কলি দুইটা গোলমাল হইয়া গেল।

প্রৌঢ়া গাছতলায় চ্যাটাই পাতিয়া লণ্ঠনের আলোয় সুপারী কাটিতেছিল—মেয়েদের জন দুইয়েক রান্নায় ব্যস্ত। একটা খড়ের কুঠুরীতে উজ্জ্বল আলো জ্বলিতেছে, মেয়েপুরুষের সম্মিলিত হাসির উচ্ছ্বাসে উচ্ছ্বসিত। তাহার মধ্যে নিতাই চিনিল—বসন্তের হাসি; এমন ধারালো খিল-খিল হাসি বসন্ত ভিন্ন কেহ হাসিতে পারে না, অন্তত ঝুমুর দলের কোন মেয়ে পারে না।

নিতাইকে দেখিয়াই প্রৌঢ়া আনন্দে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল—এস, এস, বাবা এস। আমি তোমার পথ চেয়ে রয়েছি।

রন্ধনরতা মেয়ে দুইটি রান্না ছাড়িয়া কাছে আসিয়া দাঁড়াইল, হাসিমুখে বলিল—এসে গেয়েছে—লাগছে!

হাসিয়া নিতাই বলিল—এলাম বৈকি।

প্রৌঢ়া বলিল—ওলো, বাবাকে আমার চা ক'রে দে। মুখে হাতে জল দাও বাবা।

একটি মেয়ে বলিল—খুব ভাল ক'রে গান করতে হবে কিন্তুক।

অপর মেয়েটি ছুটিয়া গিয়া আলোকোজ্জ্বল কুঠুরীটার দুয়ারে দাঁড়াইয়া বলিল—ওলো বসন, কবিয়াল আইচে লো! তোর কালো-মাণিক!

নিতাই হাসিয়া সংশোধন করিয়া দিল—কালো-মাণিক নয়, কয়লা-মাণিক।

বসন্ত ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিল—তাহার পা টলিতেছে, ডাগর চোখের পাতা ভারী হইয়া নামিয়া আসিয়াছে, নাকের ডগায় চিবুকে কপালে ঘাম দেখা দিয়াছে;—সে আসিয়া নিতাইয়ের হাত ধরিয়া বলিল—না, তুমি আমার কালো-মাণিক। আমার মান রেখেছ তুমি, ছিদ্দ কুম্ভে জল রেখেছ—তুমি আমার কালো-মাণিক।

নেশার প্রভাবে বসন্তের কণ্ঠস্বর স্বভাবতই খানিকটা আবেগময় হইয়াছিল—কিন্তু সে আবেগ, এই কথা কয়টি বলিবার সময় যেন অনেক গুণে বাড়িয়া গেল।

প্রৌঢ়া রহস্য করিয়া বলিল—তা ব'লে যেন কাঁদতে বসিস না বসন, নেশার ঘোরে!

নেশায় অর্দ্ধনিমীলিত চোখ দুইটি বিস্ফারিত করিয়া বসন এবার খানিকক্ষণ প্রৌঢ়ার দিকে চাহিয়া রহিল, তারপর বলিল—আলবৎ কাঁদব, আমার কালো-মাণিকের গলা জড়িয়ে ধরে কেঁদে ভাসিয়ে দোব। এমন যতন ক'রে কে চা ক'রে দেয়—কে গায়ের ধূলো মুছিয়ে দেয়? আজ সারারাত কাঁদব—। বলিতে বলিতেই সে আপনার ঘরের দুয়ারের কাছে আসিয়া বলিল—এই নাগরেরা, যাও, চলে যাও তোমরা। আর আমোদ নেহি হোগা!

প্রৌঢ়া শশব্যস্ত হইয়া উঠিয়া গিয়া বসন্তের হাত ধরিয়া বলিল—এই বসন! বসন! ছি! করছিস কি? খদ্দের লক্ষ্মী—তাড়িয়ে দিতে নাই।

বসন্ত প্রৌঢ়ার মুখের দিকে চাহিয়া থাকিতে থাকিতে ফোঁপাইয়া কাঁদিতে আরম্ভ করিল—আমি কাঁদতেও পাব না মাসী, আমি কাঁদতেও পাব না!

নিতাই উঠিয়া আসিয়া বলিল—না, কাঁদবে কেনে? ছি!

—তবে তুমিও এস। তুমি গান করবে আমি নাচব।

—আচ্ছা, আচ্ছা। প্রৌঢ়া বলিল—যাবে। এই এল, চা খেয়ে জিরুক খানিক, তারপর যাবে; তু চল ততক্ষণ।

—চা? না, চা খাবে কি? চা খাবে কেনে? খুব ভাল মদ আছে—মদ খাবে! এস। বসন্ত নিতাইয়ের হাত ধরিয়া আকর্ষণ করিল।

নিতাই হাত টানিয়া লইয়া বলিল—ছাড়।

—না।

—মদ আমি খাই না।

—খেতে হবে তোমাকে। আমি খাইয়ে দোব।

—না।

বসন্ত ঘাড় বাঁকাইয়া নিতাইয়ের দিকে চাহিয়া বলিল—অলবৎ খেতে হবে তোমাকে।

প্রৌঢ়া বলিল—মাতলামী করিস না বসন, ছাড়, ঘরে যা।

তেমনি বঙ্কিমগ্রীবাভঙ্গি করিয়া চাহিয়া বসন নিতাইকে বলিল—যাবে না তুমি? মদ খাবে না?

—না।

—আমার কথা তুমি রাখবে না?

—এ কথাটি রাখতে পারব না ভাই।

বসন্ত নিতাইকে ছাড়িয়া দিল। তারপর টলিতে টলিতে ঘরের মধ্যে গিয়া প্রবেশ করিয়া বলিল—বন্ধ কর দেও দরজা।

প্রৌঢ়া আক্ষেপ করিয়াই বলিল—মেয়েটা ওই মদ খেয়েই নিজের সব্বনাশ করলে। এত মদ খেলে কি শরীল থাকে?

নিতাই একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল। যে মেয়েটি চা করিতে গিয়াছিল, সে একটা কলাই-করা গ্লাসে চা আনিয়া বলিল—লাও, চা খাও ওস্তাদ।

হাসিয়া নিতাই চায়ের গ্লাসটি লইয়া বলিল—লক্ষ্মী দিদি আমার, বাঁচালে ভাই!

প্রৌঢ়া হাসিয়া বলিল—বাঃ, বেশ হয়েছে। নির্মলা, তু ওস্তাদকে দাদা বলে ডাকবি। ভাইদ্বিতীয়েতে ফোঁটা দিবি, ওস্তাদকে কিন্তুক কাপড় লাগবে!

নিতাই পরম প্রীত হইয়া বলিল—নিচ্চয়!

অপর মেয়েটি রান্নাশাল হইতেই বলিল—আমি কিন্তুক ঠাকুরঝি সম্বন্ধ পাতালাম।

প্রৌঢ়া খুশী হইয়া সায় দিয়া বলিল—বেশ বলেছিস ললিতে, বেশ বলেছিস! বসন তোকে দিদি বলে।

নিতাইয়ের হাত হইতে চায়ের গ্লাসটা খসিয়া পড়িয়া গেল—ঠাকুরঝি! ঠাকুরঝি!

* * *

রাত্রির অগ্রগতির সঙ্গে সে এক বীভৎস দৃশ্য। নিতাইয়ের কাছে এ দৃশ্য অপরিচিত নয়। মেলা উৎসবের আলোকোজ্জ্বল সমারোহের একটি বিপরীত দিক আছে। সে দিকটি সহজে মানুষের চোখে পড়ে না। আলোকের বিপরীত অন্ধকারে ঢাকা সে দিক। গাঢ় অন্ধকার ঢাকা বিপরীত দিকটিতে মাটির তলার সরীসৃপের মত মানুষের বুকের আদিম প্রবৃত্তির ভয়াবহ আত্মপ্রকাশ সেখানে। অবশ্য নিতাইয়ের যে পারিপার্শ্বিকের মধ্যে জন্ম, সে পারিপার্শ্বিকও অবস্থাপন্ন সভ্যসমাজের ছায়ায় অন্ধকারে ঢাকা বিপরীত দিক।

সভ্যসমাজের আবর্জনা ফেলার স্থান। সেখানেও অনাবিষ্কৃত চির অন্ধকার—প্রেতলোকের মত চির-অন্ধকার। এ ধরনের বীভৎসতার সঙ্গে তাহার পরিচয় না-থাকা নয়। তবুও নিতাই হাঁপাইয়া উঠিল।

নির্মলা এবং ললিতার ঘরেও আগন্তুক আসিয়াছে। মত্ত জড়িত কণ্ঠের অশ্লীল হাস্য-পরিহাস চলিতেছে।

বসন্তের ঘর হইতে সে লোক দুইটা চলিয়া গিয়াছে, আবার নূতন আগন্তুক আসিয়াছে।

প্রৌঢ়া দলের পুরুষগুলিকে লইয়া মদ খাইতে বসিয়াছে। নিতাইকে আবার একবার চা দেওয়া হইয়াছে। সে ভাবিতেছিল ঠাকুরঝিকে; ইচ্ছা হইতেছিল—এখনই এখান হইতে ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়া সে পলাইয়া যায়। কলঙ্ক তো তাহার হইয়াই গিয়াছে, সে কলঙ্কের ছাপ ঠাকুরঝির অঙ্গেও লাগিয়াছে। হয়তো তাহার স্বামী এ জন্ম তাহাকে পরিত্যাগই করিবে—বাড়ী হইতে তাড়াইয়া দিবে। দশের ভয়ে তাহার বাপও হয়তো তাহাকে বাড়ীতে স্থান দিবে না। আজ আর তাহার লজ্জা নাই, ঘর ভাঙিবার ভয় নাই। তবে! আজ তো নিতাই গিয়া ঠাকুরঝির হাত ধরিয়া বলিতে পারে—"এস, আজ হইতে তোমারও যে গতি, আমারও সেই গতি। নিতাই চঞ্চল হইয়া উঠিল। আবার অনেকক্ষণ ভাবিয়া সে স্থির করিল—চলিয়াই সে যাইবে, ইহাদের এই মেলার গানের আসর সারিয়া চলিয়া যাইবে; কিন্তু গ্রামে নয়, অন্য যেখানে হোক—এত বড় দুনিয়ায় যেদিকে মন চায় সেই দিকে চলিয়া যাইবে। মুহূর্ত্তে পূর্ব্বের চিন্তা কল্পনা সব তাহার পালটাইয়া গিয়াছে—না না, সে হয় না। ঠাকুরঝির ভাঙা ঘর আবার জোড়া লাগিবে, তাহার সুখের সংসার আবার সুখে ভরিয়া উঠিবে।

ঠাকুরঝি তাহাকে ভুলিয়া যাক। না দেখিলেই ভুলিয়া যাইবে। সন্তান সন্ততিতে তাহার কোল ভরিয়া উঠুক, সুখে সম্পদে সংসার উথলিয়া পড়ুক, স্বামী সন্তান সংসার লইয়া সে সুখী হোক।

পনেরো

প্রায় বিনিদ্র রাত্রিই সে যাপন করিয়াছিল। ভোরে উঠিয়াই সে বাহির হইয়া পড়িল। একটা প্রকাণ্ড দীঘিকে মাঝখানে রাখিয়া দীঘির চারি পাশে মেলা বসিয়াছে। রাসপূর্ণিমায় রাসোৎসবে মেলা; দীঘির পূর্ব দিকে রাধাগোবিন্দের মন্দির; পাশেই সেবাইত বৈষ্ণব বাবাজীর আখড়া; মুখ হাত ধুইয়া নিতাই সেই রাধাগোবিন্দের মন্দিরে গিয়া বসিল।

রাসমঞ্চে অষ্টসখীপরিবৃতা রাধাগোবিন্দ তাহার বড় ভাল লাগিল। সেইখানেই বসিয়া সে গান রচনা আরম্ভ করিয়া দিল। রাধাকৃষ্ণের যুগল রূপের স্তবগান। প্রথমে গুন গুন করিয়া গানখানি রচনা শেষ করিয়া—বেশ গলা ছাড়িয়াই গান আরম্ভ করিল। মিষ্ট গলার গানে বেশ কয়েকজন লোকও জমিয়া গেল। আখড়ার মোহন্তও বাহির হইয়া আসিলেন।

নিতাই গাহিতেছিল—

"আশ মিটায়ে দেখ রে নয়ন যুগল-রূপের মাধুরী"

মোহন্ত চোখ বুজিয়া ঘাড় নাড়িয়া তাল দিতে দিতে একজনকে বলিলেন—খোল আন তো বাবা।

মোহন্ত খোল লইয়া নিজেই সঙ্গত আরম্ভ করিয়া দিলেন। গান শেষ হইলে বলিলেন—পদাবলী জান বাবা?

নিতাই পদাবলী জানে না। সে বিনীত ভাবে প্রশ্ন করিল—আজ্ঞে?

—মহাজন-পদাবলী বাবা—চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি, জ্ঞানদাসের পদ?

নিতাই হাত জোড় করিয়া বলিল—প্রভু, অধীনের অধম ডোমকুলে জন্ম। কি করে জানব বাবা?

হাসিয়া মোহন্ত বলিলেন—জন্ম তো বড় নয় বাবা, কর্ম্মই বড়, মহাপ্রভু আমার আচণ্ডালে কোল দিয়েছেন।

নিতাইয়ের চোখ জলে ভরিয়া উঠিল, বলিল—কর্ম্মও যে অতি হীন প্রভু; ঝুমুর দলে—বেশ্যাদের সঙ্গে থাকি, কবিগান করি।

—কবিগান কর?

—আজ্ঞে হ্যাঁ প্রভু।

—যে গান তুমি গাইলে, সে কি তোমার গান?

মাথা নত করিয়া সলজ্জ হইয়া নিতাই বলিল—আজ্ঞে হ্যাঁ।

মোহন্ত সাধুবাদ দিয়া বলিলেন—ভাল ভাল! চমৎকার গান! তারপর বলিলেন—কর্ম্ম তোমার তো অতি উচ্চ কর্ম্মই বাবা। তোমার ভাবনা কি! যাঁরা কবি, তাঁরাই তো সংসারে মহাজন, তাঁরাই তো সাধক। কবির গানে ভগবান বিভোর হন। চণ্ডীদাসের পদাবলী শুনে মহাপ্রভু ভাবে বিভোর হয়ে নাচতেন।

টপ্ টপ্ করিয়া কয়েক ফোঁটা জল নিতাইয়ের চোখ হইতে ঝরিয়া পড়িল, সে বলিল—কিন্তু সঙ্গ যে অতি নীচ সঙ্গ বাবা, বেশ্যা—

মোহন্ত হাসিয়া হাত তুলিয়া ইঙ্গিতে নিতাইকে বাধা দিলেন, বলিলেন—প্রভুর

সংসারে নীচ কেউ নাই বাবা। নিজে, পরে নয়—নিজে নীচ হলে সেই ছোঁয়াচে পরে নীচ হয়। নীল চশমা চোখে দিয়েছ বাবা? সূর্য্যের আলো নীলবর্ণ দেখায়। তোমার চোখের চশমার রঙের মত তোমার মনের ঘৃণা পরকে ঘৃণ্য করে তোলে। মনের বিকারে এমন সুন্দর পৃথিবী ছেড়ে যেতে মানুষ আত্মহত্যা করে। আর বেশ্যা? বাবা, চিন্তামণি বেশ্যা—সাধক বিল্বমঙ্গলের প্রেমের গুরু। জান বাবা, বিল্বমঙ্গলের কাহিনী?

নিতাই ব্যগ্র-ব্যাকুলতায় মোহন্তের মুখের দিকে চাহিয়া বলিল—দয়া করে যদি বলেন বাবা—

মোহন্ত সস্নেহে হাসিয়া পাশে অল্পদূরে স্থান নির্দ্দেশ করিয়া বলিলেন—এইখানে এসে ব'স বাবা। না না, কোনো সঙ্কোচ নাই, মহাপ্রভুর দাসানুদাস—আমাদের কাছে ছোট কেউ নয়, আর তুমি তো কবি, তুমি মহাজন—এস, এইখানে ব'স।

তিনি বিল্বমঙ্গলের কাহিনী আরম্ভ করিলেন। কাহিনী শেষ করিয়া হাসিয়া বলিলেন—অবস্থা গতিকে যেখানেই পড়বে বাবা, সেইখানেই সন্তুষ্ট মনে থাকবে—আপনার কর্ম্ম করে যাবে। পাঁকাল মাছ পাঁকে থাকে—কিন্তু একবিন্দু পাঁক তার গায়ে লাগে না। কথা শেষ করিয়া তিনি সস্নেহে খানিকটা হাসিলেন। তারপর আবার বলিলেন—আচ্ছা বাবা, তুমি দুপুরে এখানে এস—গোবিন্দের প্রসাদ পাবে এইখানে।

নিতাই ফিরিয়া আসিল—অদ্ভুত এক মন লইয়া। ঝুমুর দলের মেয়েগুলি গান বাজনায় নাচে সুরে তালে পারদর্শিনী বলিয়া কবিয়াল নিতাই তাহাদের সম্ভ্রম করিত, কিন্তু মনের গোপন কোণে ঘৃণা সঞ্চিত ছিল; আজ এই মুহূর্ত্তে সেটুকুও যেন নাই। মনটা যেন তাহার জুড়াইয়া গিয়াছে। ফিরিবার পথে বার বার তাহার চোখে জল আসিল। কাপড়ের খুঁটে সে চোখ মুছিল আর মনে মনে বাবাজীকে প্রণাম করিল। মনে মনে সংকল্প করিল গোবিন্দের প্রসাদের সঙ্গে সে বাবাজীর প্রসাদকণাও চাহিয়া লইবে।

ঝুমুর দলের আস্তানায় আসিয়া সে অবাক হইয়া গেল। মনে হইল, এ বুঝি গোবিন্দের কৃপা!

আশ্চর্য্য! আজিকার প্রভাতের এই স্থান ও পাত্র-পাত্রীগুলির রূপের সহিত গতরাত্রির স্থান ও পাত্র-পাত্রীগুলির এতটুকু মিল নাই! সমস্ত স্থানটা গোবর-মাটি দিয়া অতি পরিপাটীরূপে নিকাইয়া ফেলা হইয়াছে। গাছতলায় একটি কলার পাতায় অনেকগুলি ফুল; মেয়েগুলি স্নান সারিয়া জলসিক্ত চুল পিঠে এলাইয়া দিয়া শান্ত ভাবে বসিয়া আছে; সকলের

পরনেই লাল পাড় শাড়ী—একটি নিবিড় এবং গভীর শান্ত পবিত্রতার আভাস যেন সর্বত্র পরিস্ফুট!

বসন্ত পিছন ফিরিয়া বসিয়া ছিল, নির্ম্মলা ও ললিতা বসিয়া ছিল এইদিকে মুখ ফিরাইয়া। তাহারা অভ্যর্থনা করিয়া বলিল—বেশ মানুষ যা হোক তুমি! এই এত বেলা পর্য্যন্ত কোথা ছিলে বল দেখি?

বসন্ত মুখ ফিরাইয়া চাহিল। নিতাই মৃদু হাসিল। বসন্ত মুখ ফিরাইয়া লইল এবং পরক্ষণেই সে উঠিয়া রান্নাশালে চলিয়া গেল। নিতাই আসিয়া নির্ম্মলা ও ললিতার কাছে বসিয়া বলিল—বাঃ, ভারী ভাল লাগছে কিন্তুক; চারিদিক নিকোনা, তোমরা সব চান করেছ, লাল পেড়ে কাপড পরেছ—

হাসিয়া নির্ম্মলা বলিল—আজ যে লক্ষ্মীপূজো গো দাদা!

—লক্ষ্মীপূজো?

—হ্যাঁ। পূর্ণিমে বেরস্পতিবার, আমাদের বারোমেসে লক্ষ্মী আজ।

নিতাই অবাক হইয়া গেল। এতদিন মেলামেশা করিয়াও এ কথাটা সে জানিত না। ইহাদেরও ধর্ম্মকর্ম্ম আছে! সে প্রশ্ন করিল—কখন হবে লক্ষ্মীপূজো?

—সেই সন্ধ্যেবেলায়। আজ তোমার পাল্লা আরম্ভ হতে সেই ল'টার আগে লয়।

প্রৌঢ়া বলিল—বাবা আমার ভক্তিমান লোক। ভাল লোক।

ললিতা বিচিত্র হাসি হাসিয়া বলিল—লোক ভাল কিন্তুক পাল্লা মোগলের। খাঁনা—

প্রৌঢ়া ইঙ্গিত করিয়া বলিল—চুপ।

বসন্ত আসিয়া দাঁড়াইল তাহার হাতে একটি গ্লাস। গ্লাসটি বাড়াইয়া দিয়া বলিল—লাও!

নিতাই তাহার মুখের দিকে চাহিয়া প্রশ্ন করিল—কি?

মুখ মুচকাইয়া বসন বলিল—মদ লয়, ধর।

নিতাই গ্লাসটি লইয়া দেখিল—সদ্য প্রস্তুত করা ধূমায়িত চা।

ললিতা হাসিয়া বলিল—বুঝে-সুঝে খেও ভাই, জামাই-বশীকরণের ওষুধ দিয়েছে।

বসন চলিয়া যাইতেছিল, সে ঘুরিয়া দাঁড়াইয়া মুখ বাঁকাইয়া বলিল—আগুন পোড়ারমুখে!

নিতাই হাসিয়া কথাটা নিজের গায়ে লইয়া বলিল—তাই দাও ভাই, কয়লায় ময়লা

ছুটে যাক। আগুনের পারা বরণ হোক আমার। জান তো? "আগুনের পরশ পেলে কালো আঙার রাঙা বরণ!"

ললিতা খিলখিল করিয়া হাসিয়া বলিল—যাও কেনে, আগুনের শিষ তো জলছেই, গায়ে গায়ে পরশ নিয়ে আগুন ধরিয়ে নিয়ে এস।

বসনের চোখে ছুরির ধার খেলিয়া গেল, কিন্তু পরমুহূর্তে সে হাসিয়া বলিল—মদ জলে দেখেছিস? বলিয়া নিজের দেহখানা দেখাইয়া সে বলিল—এ হ'ল মদের আগুন! বলিয়া সে ঘরের মধ্যে চলিয়া গেল।

নিতাইয়ের মনে পড়িল গত রাত্রের কথা। সে হাসিল।

মেয়েদের সেদিন সমস্ত দিন উপবাস। সে উপবাস তাহারা নিষ্ঠার সহিত পালন করিল। সন্ধ্যায় ফলমূল, সন্দেশ, দুধ, দই, নানা উপচারে ও ফুল, ধুপ, দীপ নানা আয়োজনে পরম ভক্তির সহিত তাহারা লক্ষ্মীপূজা করিল। পূজা শেষে প্রৌঢ়াকে কেন্দ্র করিয়া এক একটি সুপারি হাতে ব্রতকথা শুনিতে বসিল। নিতাই অদূরেই বসিয়া ছিল। অপর পুরুষগুলি দূরে মদ্যপান করিতে বসিয়াছে। মদ খাইতে খাইতেই তাহারা রাত্রির আসরের জন্য সাজ-সজ্জা করিতেছে। বেহালাদার বেহালার পরিচর্য্যায় ব্যস্ত। বার্নিশের শিশি, তার, রজন লইয়া বসিয়াছে। দোহারটা ঢুলীর সহিত তাল লইয়া তর্ক বাধাইয়াছে। হাতে তাল দিতেছে, আর বলিতেছে—এই—এই—এই ফাঁক। বাজনদার আপন মনেই বাজাইয়া চলিয়াছে। সে দোহারের কথা গ্রাহ্যও করিতেছে না।

মহিষের মত লোকটা মদের ঝোঁকে ঝিমাইতেছে। মেয়েদের খাওয়া দাওয়া শেষ হইলেই গান আরম্ভ হইবে। তাহারা যুদ্ধের ঘোড়ার মত মাতিয়া প্রস্তুত হইতেছে।

প্রৌঢ়া ব্রতকথা বলিতেছিল—

"পুরাকালে এক বেশ্যা ছিল অতি গরীব—তার না ছিল রূপ, না ছিল সুকণ্ঠ। কিন্তু তার ছিল ভক্তি। সেই ভক্তির বশেই সে নিত্য স্নান করিত, লক্ষ্মীর ব্রত করিত, সন্ধ্যায় ঘরে ধূপ দিত, তাহার ঘরের প্রদীপটি নিত্য মার্জ্জনায় ঝকমক করিত। লক্ষ্মীকে প্রণাম করিয়া সে প্রসাধন করিয়া নাগর আহ্বান করিতে আপনার দুয়ারে আসিয়া দাঁড়াইত। নাগর আসিলে তাহাকে সে স্বামীর মত ভক্তি করিত, যত্ন করিত। তাহার মুখের কথায় ঝরিত মধু। ব্যবহারে থাকিত পত্নীর নিষ্ঠা, বাক্যে থাকিত বিনয়; লোকে খুসী হইয়া যাহা দিত তাহাতেই সে তুষ্ট হইত।

প্রভাতে উঠিয়া সে গৃহ মার্জ্জনা করিত, নিত্য বিছানাগুলি পরিষ্কার করিত, অতিথি অভ্যাগতকে ভাবিত দেবতা।

আর একজন ছিল অতি সুন্দরী ধনী মাতার কন্যা। রূপের অহঙ্কারে অহঙ্কৃতা দর্পিতা। নাগরকে সে বলিত কটু কথা। ব্রত বার উপবাসে ছিল তার বিষম বিরাগ। লক্ষ্মীর চৌকির উপরে সে রাখিত চুলের দড়ি, তেলের বাটি, মদের বোতল।

তারপর ক্রমে লক্ষ্মীর কৃপায় ওই কালো ভক্তিমতী মেয়েটি একদা রূপসায়রে স্নান করিয়া হইল সুন্দরী, কণ্ঠস্বর হইল মধুক্ষরা। সে এক নাগরকে ভজনা করিয়া পরিশেষে সাগর-সঙ্গমে তাহাকেই পতি-কামনা করিয়া করিল দেহত্যাগ। আর দর্পিতা উচ্ছৃঙ্খলা রূপবতী মেয়েটা লক্ষ্মীর ছলনায় রূপসায়রে স্নান করিতে গিয়া একবার স্নান করিয়া দেখিল—রূপ অপরূপ হইয়া উঠিয়াছে। লুব্ধা আরও রূপের প্রত্যাশায় আবার স্নান করিল—ফলে সকল রূপ ঝরিয়া গিয়া সে জরতী বৃদ্ধার মত হইয়া গেল, কাকের মত কর্কশ হইল তার কণ্ঠস্বর। অবশিষ্ট জীবন ভিক্ষায় অতিবাহিত করিতে হইল।"

কথা শেষ করিয়া হুলুধ্বনি দিয়া সকলে প্রণাম করিল। তারপর প্রসাদ লইয়া যে যাহার ঘরে চলিয়া গেল। প্রৌঢ়া পুরুষদের ডাকিয়া বলিল—যাও, সব প্রসাদ নিয়ে এস।

বসন্ত ঘরের দুয়ারে দাঁড়াইয়া নিতাইকে ডাকিল—শোন।

—আমাকে বলছ?

—হ্যাঁ।

আজ এই নিষ্ঠাবতী বসন্তের কাছে যাইতে নিতাইয়ের এতটুকু সঙ্কোচ হইল না। ঘরে ঢুকিয়া সে পরমাত্মীয়ের মত স্নেহমধুর হাসি হাসিয়া বলিল—কি বলছ বল?

বসন্ত তাহার মুখের দিকে চাহিয়া অকস্মাৎ চোখ নামাইয়া মৃদু মিষ্ট স্বরে বলিল—একটু প্রসাদ খাও। পরিপাটি করিয়া ঠাঁই করিয়া একখানি পাতায় সে ফল মূল সন্দেশ সাজাইয়া দিল। বসনের এই রূপ দেখিয়া নিতাই মুগ্ধ হইয়া গেল; সেই বসন এমন হইতে পারে?

নিতাই আসনের উপর বসিয়া পড়িল। খাইতে খাইতে বলিল—জয়-জয়কার হোক তোমার!

বসন বলিল—এক টুকরো পেসাদ রেখো যেন।

চকিত হইয়া নিতাই বলিল—পেসাদ?

—হ্যাঁ, নাগরের পেসাদ খেতে হয়। সে হাসিল; বসনের মুখে এমন হাসি নিতাই

কখনও দেখে নাই। সে অবাক হইয়া তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। বসন জিনিসপত্র গুছাইবার অজুহাতে তাহার দিকে পিছন ফিরিল। গুনগুন করিয়া সে গান করিতেছিল। নিতাই সে গান শুনিয়া মুগ্ধ হইয়া গেল।

তোমার চরণে আমারই পরাণে লাগিল প্রেমের ফাঁসি
জাতি কুলমান সব বিসর্জ্জিয়া নিশ্চয় হইনু দাসী।

বা! বা! বা! এমন গান! নিতাই উৎকর্ণ হইয়া শুনিতেছিল।

কহে চণ্ডীদাস—

—কি? কি? বসন! চণ্ডীদাস কি?

দুই হাত কপালে ঠেকাইয়া প্রণাম করিয়া বসন বলিল—মহাজনের গান—চণ্ডীদাসের পদ যে!

—চণ্ডীদাসের পদ তুমি জান?

—ঝুমুরের হাতেখড়ি যে কেত্তনের পদে গো! বসন্ত হাসিল।—আমাদের গানের খাতায় কত পদ লেখা আছে।

ষোল

রাত্রি নয়টার পর দুই দলে পাল্লা দিয়া গান আরম্ভ হইল। আলোকোজ্জ্বল মেলায় নৈশ-আনন্দসন্ধানী মানুষের জনতা। বক্ষভাণ্ডের মধ্যে প্রবৃত্তির উত্তাপে আনন্দরস গাঁজিয়া যেন স-ফেন মত্তরসে পরিণত হইয়াছে।

প্রথম আসর পাইয়াছিল বিপক্ষ দল। সে দলের কবিয়ালটি রঙ-তামাসায় দক্ষ লোক। আসরে নামিয়াই সে নিজে হইল বৃন্দে দূতি—নিতাইকে করিল কৃষ্ণ; পালা ধরিল—মানের, 'খণ্ডিতা' নায়িকার দূতীরূপে সে গান আরম্ভ করিল—

"কা-দা জা-মের বো-দা – কষের রসে ওলে মজেছে কালা
আমের গায়ে মিছে—ধরিল রঙ—মিছে সুবাস ঢালা।
চন্দ্রাবলী কাদা জাম—
রাধে আমার পাকা আম—"

তাহার পরই সে আরম্ভ করিল খেউড়। চন্দ্রাবলীর রূপ গুণ কাদা জামের সহিত তুলনা উপলক্ষ্য করিয়া সে বসন্তের রূপ গুণের বিকৃত অশ্লীল ব্যাখ্যা আরম্ভ করিয়া দিল। তবে লোকটার ছন্দে দখল আছে, আসরটাকে অশ্লীল রসে মাতাল করিয়া তুলিল। এ দলের পুরানো কবিয়াল, বসন্তের চড় খাইয়া যে দল ত্যাগ করিয়াছে, সেই লোকটাই বসন্তের প্রতিটি দোষ ও খুঁতের সংবাদ ওই দলের কবিয়ালকে

দিয়াছে। কবিয়ালটা বসন্তের দিকে আঙুল দেখাইয়া চন্দ্রাবলীর খেউড় গাহিয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে অশ্লীল ভঙ্গিতে নৃত্য। তাহাদের দলের যে মেয়েগুলি নাচিতেছিল তাহারা পর্য্যন্ত বসন্তের দিকে প্রায় আঙুল দেখাইয়া নাচিল।

নিতাই শঙ্কিত না হইয়া পারিল না। এই খেউড়ের আসরে তাহার গান জমিবে না, সে বেশ বুঝিয়াছে। কিন্তু নিজের পরাজয়ের কথাই সে ভাবিতেছিল না; সে বসন্তের কথা ভাবিয়াই শঙ্কিত হইয়া উঠিয়াছিল। যে মেয়ে বসন্ত! একদণ্ডে সে আগুন হইয়া উঠে! আসরেই সে একটা কাণ্ড না করিয়া বসে! বার বার সে বসন্তের মুখের দিকে চাহিতেছিল। কিন্তু এই পাল্লার ক্ষেত্রে আশ্চর্য্য ধৈর্য্য বসন্তের; চুপ করিয়াই বসন্ত বসিয়া আছে—যতবার নিতাইয়ের চোখে চোখ মিলিল, ততবার তাহার মুখে হাসি ফুটিয়া উঠিল। সে হাসির অর্থ বুঝিতে নিতাইয়ের ভুল হইল না, হাসিয়া বসন্ত ইঙ্গিতে বলিতে চাহিতেছে—শুনছ? এর শোধ দিতে হবে। নিতাইয়ের মনে পড়িল গত রাত্রের কয়টি কথা, বসন্ত তাহাকে প্রথম সম্ভাষণে বলিয়াছিল—কয়লা-মাণিক নয়, তুমি আমার কালো-মাণিক। আমার ছিদ্র কুম্ভে জল রেখেছ, আমার মান রেখেছ তুমি।

বসন্তকে আজ বড় ভাল দেখাইতেছে। নাচের আসরের সাজসজ্জা করিবার অবকাশ হয় নাই; এলোচুলই পিঠের উপর পড়িয়া আছে, লালপেড়ে তসরের সাড়ীখানিই সে একটু আঁটসাট করিয়া পরিয়াছে; সকলের চেয়ে ভাল লাগিতেছে তাহার চোখের সুস্থ দৃষ্টি। মেয়েরা আজ কেহই মদ খায় নাই, সেও খায় নাই। কিন্তু তাহার চোখের সুস্থ দৃষ্টিই সকলের দৃষ্টির চেয়ে নিতাইয়ের ভাল লাগিল। অদ্ভুত দৃষ্টি বসন্তের! চোখে, মদের নেশার আমেজ ধরিলে তাহার দৃষ্টি যেন রক্তমাখা ছুরির মত রাঙা এবং ধারাল হইয়া উঠে। সুস্থ বসন্তের চোখের দৃষ্টি দেখিয়া নিতাইয়ের আজ মনে হইল—এ চোখ যেন রূপার কাজললতা।

বিপক্ষ দলের ওস্তাদ গান শেষ করিয়া বসিল। আশেপাশে শ্রোতার দল জমিয়াছিল, পচা মাছের বাজারে মাছির মত। পয়সা-আনি-দোয়ানি-সিকি-আধুলিতে প্যালার থালাটা একেবারে ভরিয়া উঠিল, গোটা টাকাও পড়িল দুই-তিনটা। গান শেষ হইতেই তাহারা হরিবোল দিয়া উঠিল—ওই উহাদের সাধুবাদ।

পাশেই সস্তা তেলেভাজা ও মাংসের দোকান—মদও বিক্রী হয় গোপনে—সেখানে আর এক দফা ভিড় জমিয়া গেল। ও দলের দুইটা মেয়েকে লইয়া দোকানের ভিতর চেয়ার টেবিলে আদর করিয়া বসাইয়া কয়েকটি সৌখিন চাষী খাবার খাইতে বলিয়া গেল।

নিতাই উঠিল। তাহার হাত পা ঘামে ভিজিয়া উঠিয়াছে। গলা যেন শুকাইয়া যাইতেছে ;—এই এতবড় মত্ততৃষ্ণাতুর জনতা, ইহাদের কি করিয়া সে তৃপ্ত করিবে? অনেক ভাবিয়া সে গান ধরিল—

"মদ সে সহজ বস্তু নয়,
চোখেতে লাগায় ধাঁধাঁ—কালোকে দেখায় সাদা—
রাজা সে খানায় পড়ে রয়।"

কবিয়ালদের সকলের চেয়ে বড় বুদ্ধি হইল দুষ্টবুদ্ধি ; এবং বড় শক্তি হইল গলাবাজী, অর্থাৎ জোর করিয়া আপন বক্তব্যকে প্রতিষ্ঠিত করা। হয়-কে নয় এবং নয়-কে হয় করিয়া গলার জোরে মুখের জোরেই কবিয়ালরা জিতিয়া যায়। অশ্লীল রসের গালিগালাজ বাদ দিয়া নিতাই সেই চেষ্টা করিল। সে ধরিল—

"বৃন্দে তুমি নিন্দে আমার কর অকারণ
নয় অকারণ—কারণ খেয়ে মত্ত তোমার মন।"

'নতুবা ওগো মাতাল বৃন্দা, তুমি নিশ্চয় চন্দ্রাবলীর নিন্দা করিতে না। চন্দ্রাবলী কে? যে রাধা, সেই চন্দ্রাবলী। যে কালী, সেই কৃষ্ণ। চন্দ্রাবলীর দিকে ভাল করিয়া চাহিয়া দেখ। আগে তেঁতুল খাও, মাথায় জল দাও—নেশা ছুটাও, তারপর চন্দ্রাবলীর দিকে চাও। দেখিবে চন্দ্রাবলীর মধ্যে রাধা, রাধার মধ্যেই চন্দ্রাবলী। রাধাতন্ত্রের মানের পালার দশ পৃষ্ঠার দশম লাইন পড়িয়া দেখিও।' তারপর সে আরম্ভ করিল—চন্দ্রাবলীর রূপবর্ণনা। বসন্তের রূপকে সে বর্ণনা করিল। একেবারে সপ্তম স্বর্গের বস্তু করিয়া তুলিল। বসন্ত নাচিতেছিল। সুস্থ দেহে মনে আজ সে বড় ভাল নাচিতেছিল ;—কিন্তু রূপ যৌবন আজ কামনাময় লাস্যে তীব্র তীক্ষ্ণ হইয়া উঠে নাই। সেটা নেশার অভাবেও বটে এবং নিতাইয়ের গানে ঐ রসের অভাবেও বটে। শুধু বসন্তের নাচই নয়, ক্রমে ক্রমে আসরটা ধীরে ধীরে ঝিমাইয়া পড়িতে আরম্ভ করিল ; জনতা কমিয়া আসিতে সুরু হইল। দুই চারি জন যাইবার সময় বলিয়া গেল—দূর! থালায় প্যালা পড়িল না বলিলেই হয়।

প্রৌঢ়া কয়েকবার নিম্নস্বরে নিতাইকে বলিল—রঙ চড়াও, ওস্তাদ, রঙ।

দুলিদার বসনের কাছে গিয়া বলিল—একটুকুন হেলেদুলে, চোখ একটুকুন খেলাও!

বসন্তের চোখ খেলিবে কি, চোখ ভরিয়া তার বার বার জল আসিতেছে। হেলিয়া দুলিয়া হিল্লোল তুলিবে কি, দেহ যেন অবসাদের ভারে ভাঙিয়া পড়িতেছে।

আসরে নামিয়া শ্রোতাদের এমন অবহেলা তাহাকে বোধ করি কখনও সহ্য করিতে হয় নাই। নিতাইয়ের গানের তত্ত্বকথায় বিরক্ত হইয়া তাহার দিকে লোকে ফিরিয়া চাহিতেছে না। নিতাইয়ের ধর্ম্মকথায় জলো রসে তাহার নাচে রঙ ধরিতেছে না। সর্ব্বোপরি দলের পরাজয়টাই তাহার কাছে মর্ম্মান্তিক হইয়া উঠিয়াছে। নিম্নশ্রেণীর দেহ-ব্যবসায়িনী রূপপসারিণী তাহারা, দেহ ও রূপ লইয়া অহঙ্কার তাহাদের আছে, কিন্তু সে শুধু অহঙ্কারই—জীবনের মর্য্যাদা নয়। কারণ তাহাদের দেহ ও রূপের সে অহঙ্কারকে পুরুষেরা আসিয়া অর্থের বিনিময়ে পায়ে দলিয়া চলিয়া যায়। পুরুষের পর পুরুষ আসে। দেহ এবং রূপকে এতটুকু সম্ভ্রম করে না, রাক্ষসের মত ভোগ করে, চলিয়া যায়। তাই ইহাদের জীবনের সকল মর্যাদা পুঞ্জীভূত হইয়া আশ্রয় লইয়াছে নৃত্যগীতের সম্পদ বৃক্ষের ছায়ায়। ওই দুইটা বস্তুই যে তাহাদের জীবনের একমাত্র সত্য—সে কথা তাহারা বুঝে; তাহারা বেশ ভাল করিয়াই জানে যে, ভাল নাচগানের যে কদর—তাহা মেকী নয়। হাজার মানুষ চুপ করিয়া শোনে তাহাদের গান, বিস্ফারিত মুগ্ধ দৃষ্টিতে দেখে তাহাদের নাচ। মরুভূমির মত জীবনে ওই সাধনাই তাহাদের একমাত্র পুষ্পিত তরু। গান ও নাচের কুশলতাই তাহাদের একমাত্র মর্য্যাদাময় অহঙ্কার। সমাজের সাধারণে এ বস্তু তাহাদের মত বুঝিতে পারে না—এই শ্রেষ্ঠত্ববোধেই তাহারা অগণ্য শ্রোতার উপস্থিতিকে নগণ্য করিয়া মাথা তুলিয়া নাচে, গায়। সমাজে, গণ্যমান্য প্রতিষ্ঠাসম্পন্ন লোকের সঙ্গেও অকুণ্ঠিত দাবীতে গানের তাল মান লইয়া তর্ক করে। খেউড় কবির দলের অপরিহার্য্য অঙ্গ, বিশেষ করিয়া ঝুমুরযুক্ত কবির দলের পক্ষে। খেউড় জানাটাও দলের পক্ষে একটা অহঙ্কারের কথা। আজ দলের পরাজয়ের সঙ্গে—সেই মর্য্যাদা যেন ধূলায় লুটাইয়া পড়িতেছে বলিয়া অবসাদে বসন্ত যেন ভাঙিয়া পড়িতেছে।

পরাজয়ের বোঝার ভারে মাথা হেঁট করিয়া নিতাই বসিল। ঢোলের বাজনায় তেহাই পড়িল—বসন্তও নাচ শেষ করিল। নাচ শেষ করিয়া সে আসরে আর বসিল না, শ্রান্ত শিথিল পদক্ষেপে বাহির হইয়া গেল। প্রৌঢ়া দলনেত্রী তাহার দিকে চাহিয়া কেবল প্রশ্নের সুরে বলিল—বসন ?

—শরীর খারাপ করছে, মাসী।

প্রৌঢ়া হাসিল, বলিল—দেখ না, দোসরা আসরে বাবা আমার কি করে!

বসন্ত একবার ফিরিয়া চাহিয়া একটু হাসিল। বসন্তের মুখে এমন শান্ত বিষণ্ণ হাসি নিতাই কল্পনা করিতে পারে না। রাজনের স্ত্রী যখন তিরস্কার করিত, তখন এই হাসি হাসিত ঠাকুরঝি। বসন্তের মত মেয়ের মুখে ঠাকুরঝির হাসি আরও

লকফণ বোধ হইতেছে। ঠাকুরঝির এ হাসি দেখিয়া মায়া হইত, বসন্তের মুখে সেই হাসি দেখিয়া নিতাইয়ের চোখে জল আসিতেছে।

প্রৌঢ়া কিন্তু অদ্ভুত। সে যেন এতটুকু বিচলিত হয় নাই। দলের বেহালাদারকে নির্ব্বিকার ভাবেই বলিল—প্যালার থালাটা আন।

লোকটি প্যালার থালা আনিয়া নামাইয়া দিয়া বলিল—কয়েকটা দোয়ানির বেশী আর পড়ে নাই। সবসুদ্ধ দু টাকাও হইবে না।

প্রৌঢ়া বলিল—গুনে দেখ কত আছে। তারপর সে পানের বাটাটা টানিয়া লইয়া বলিল—মেলার আসর, রঙ-তামাসা খেউড়-খোরাকী লোকেরই ভিড়! নইলে বাবার গানে আর ওই ফচকে ছোঁড়ার গানে? গান তো বোঝ তুমি, তুমিই বল কেনে?

বেহালাদার বলিল—তা বটে। তবে রঙেরই আসর যখন, তখন রঙ না গাইলে হবে কেনে বল? রঙের গানও তো গান।

প্রৌঢ়াকে স্বীকার করিতে হইল—তা বটে! একটা মোটা পান মুখে পুরিয়া সে আবার বলিল—ওস্তাদের মার শেষ আসরে! দেখ না, বাবা আমার কি করেই দেখ না!

নিতাই চুপ করিয়া বসিয়া ভাবিতেছিল।

নির্ম্মলা, ললিতা মেয়ে দুইটির মুখেও হাসি নাই, পরস্পরে তাহারা কথা বলিতেছে—বোধ হয় এই হারজিতের কথাই তাহারা বলিতেছে! তাহাদের চোখে মুখেও এই পরাজয়ের লজ্জা সুপরিস্ফুট। দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া নিতাই মাথা হেঁট করিল। সকলের লজ্জা যেন সমষ্টিভূত বোঝা হইয়া তাহার মাথার উপর প্রচণ্ড ভারে চাপিয়া বসিয়াছে। শুধু তো লজ্জাই নয়, দুঃখেরও তাহার সীমা ছিল না। মানুষ সংসারে মদই চায়? অমৃত রস চায় না? হায় রে!

ওদিকে বিপক্ষদলের ঢুলী বাজনা আরম্ভ করিয়া দিল; লোকটার বাজনার মধ্যে যেন জয়ের ঘোষণা বাজিতেছে। বাজানোর ভঙ্গীর মধ্যেও হাতের সদম্ভ আস্ফালন। ও দলের কবিয়াল বোধ হয় বাহিরে ছিল—সে একেবারে নাটকীয় ভঙ্গীতে একটা ছড়া কাটিতে কাটিতে ছুটিয়া আসরে আসিয়া প্রবেশ করিল—

"হায়—হায়—হায়—হায় কালাচাঁদ বলে গেল কি?"

'কুকুরী আর ময়ুরী, সিংহিনী আর শূকরী, শিমুলে আর বকুলে, কাকে আর কোকিলে, ওড়না আর নামাবলী, রাধা আর চন্দ্রাবলী—তফাৎ নাইক একই?' ইহার পরই সে আরম্ভ করিল অশ্লীলতম উপমা। সঙ্গে সঙ্গে আসরে যেন বৈদ্যুতিক স্পর্শ বহিয়া গেল। লোকে হরিবোল দিয়া উঠিল। লোকটা একটু থামিয়া গাহিল—

"কালাচাঁদের কালো মুখে আগুন জেলে দে গো—
টিকের আগুন দিয়ে রাধে তামুক খেয়ে লে গো!"

অর্থহীন উপমায় যে-কোন প্রকারে গালি-গালাজ দিয়া এবং অশ্লীল কদর্য্য বস্তুর অবতারণা করিয়া সে আসরটা অল্প সময়ের মধ্যেই জমাইয়া তুলিল।

নিতাই আসর হইতে উঠিয়া চলিয়া গেল।

ও দলের একটা মেয়ে নাচিতে নাচিতে আসিয়া তাহাকে ধরিয়া নিজেই আখর দিয়া গাহিয়া উঠিল—

"ধর—ধর কালাচাঁদে, পলায়ে যায় গো।"

আসরে একটা হাসির রোল পড়িয়া গেল। নিতাই কিন্তু রাগ করিল না। সে হাসিমুখেই মেয়েটির এই তীক্ষ্ণ উপস্থিতবুদ্ধির জন্য আন্তরিক প্রশংসা করিয়া বলিল—ভাল, ভাল! ভাল বলেছ তুমি।

* * * *

নিতাই আসিযা বাসায় বসন্তের ঘরের দুয়ারে দাঁড়াইল। ভিতরে আলোর ক্ষীণ আভাস। বাহিরে একটা অগ্নিকুণ্ড জ্বালাইয়া তাহারই সম্মুখে মহিষের মত প্রচণ্ডকায় লোকটা বসিয়া আছে। উদরপূর্ণ হিংস্র পশুর মত বাসা আগলাইয়া একা অন্ধকারের মধ্যে বসিয়া রহিয়াছে। পদশব্দে সে ফিরিয়া চাহিল, কিন্তু নিতাইকে দেখিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া আবার মুখ ফিরাইল। নিতাই বসন্তের ঘরে ঢুকিতে সাহস করিল না। দেহব্যবসায়িনীর ঘর! সে বাহির হইতেই ডাকিল—বসন!

—কে? ঘরের ভিতর হইতে বিরক্তিভরা কণ্ঠস্বরে বসন্ত উত্তর দিল।

—আমি নিতাই। রসিকতা করিয়া 'কয়লা-মাণিক' বলিতেও তাহার মন উঠিল না।

—কি?

—ভেতরে যাব?

—কি দরকার?

—একটুকুন কাজ আছে।

মুহূর্ত্তে বসন্ত নিজেই বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল। অধীর অস্থির ক্ষিপ্র পদক্ষেপে সে ঘরের ভিতর হইতে নিতাইয়ের সম্মুখে আসিয়া ঝলকিয়া উঠিল ঠিক খাপখোলা তলোয়ারের মত। বাহিরের অগ্নিকুণ্ডের আলোর রাঙা আভা পূর্ণ দীপ্তিতে তাহার সর্ব্বাঙ্গে প্রতিফলিত হইয়া উঠিল। নিতাই দেখিয়া শঙ্কিত হইল—আজিকার অপরাহ্ণের পূজারিণী শান্ত স্নিগ্ধ নম্র সে বসন্ত আর নাই, এ সেই পুরানো চেনা বসন্ত।

তাহার সর্বাঙ্গে ক্ষুরের ধার ঝলসিয়া উঠিয়াছে। রাঙা আলোর প্রতিচ্ছটায় সে যেন রক্তাক্ত।

বসন্ত বলিল—আমি যাব না। আমি যাব না। কেনে এসেছ তুমি?

নিতাই কোন উত্তর দিতে পারিল না। শঙ্কিত দৃষ্টিতে বসন্তের মুখের দিকে চাহিয়া চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

অকস্মাৎ কঠিনতম আক্রোশে বসন্ত তাহার গালে সজোরে একটা চড় বসাইয়া দিল, বলিল—হ্যাকার মত আমার ছামুতে তবু দাঁড়িয়ে কেন, কেন, কেন? বেরো বলছি, বেরো! বলিয়া সে মুহূর্তে আবার ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া গেল। যে অধীর অস্থির গতিতে সে বাহির হইয়া আসিয়াছিল সেই গতিতেই সে ঘরে ঢুকিল; এই আঘাত করিয়াও যেন তাহার ক্ষোভ মেটে নাই।

নিতাই কিছুক্ষণ চুপ করিয়া দাঁড়াইল রহিল, তারপর সেই আগলদার লোকটার কাছে আসিয়া ডাকিয়া বলিল—পালোয়ান!

লোকটা দলের মধ্যে পালোয়ান বলিয়া পরিচিত। নেশায় ভাম হইয়া লোকটা বসিয়া ছিল, সে কথার উত্তর দিল না। রাঙা চোখ তুলিয়া শুধু চাহিল মাত্র।

—তোমার কাছে মাল আছে? মদ?

নিরুত্তর লোকটা এদিক ওদিক হাতড়াইয়া একটা বোতল বাহির করিয়া আগাইয়া দিল। বোতলটা হাতে করিয়াও নিতাই একবার ভাবিল—তারপর এক নিশ্বাসে খানিকটা গিলিয়া ফেলিল। বুকের ভিতরটা যেন জ্বলিয়া গেল; সমস্ত অন্তরাত্মা যেন চীৎকার করিয়া উঠিল; দুর্দমনীয় বমির আবেগে—সমস্ত দেহটা মোচড় দিয়া উঠিল, কিন্তু প্রাণপণে সে-আবেগ সে রোধ করিল। ধীরে ধীরে আবেগটা যখন নিঃশেষিত হইল তখন একটা দুর্দান্ত অধীরতাময় চঞ্চল অনুভূতি তাহার ভিতরে জাগিয়া উঠিতেছিল—যাহার উপর তাহার কোন হাত ছিল না।

সে-কালের ভীষণ বীরবংশী বংশের রক্তের বর্বরত্বের মৃতপ্রায় বীজাণুগুলি, মদের স্পর্শে—জলের স্পর্শে মহামারীর বীজাণুর মত, পুরাণের রক্তবীজ হইয়া অধীর চঞ্চলতায় জাগিয়া উঠিতেছে।

দ্বিতীয়বার আসরে যখন সে প্রবেশ করিল তখন তাহার রূপই পাল্টাইয়া গিয়াছে। সামাজিক জীবনে মানুষের যত কিছু পাপ, যাহা কিছু কদর্য্য, যত কিছু উলঙ্গ অশ্লীলতা, আবর্জনা-স্তূপের মত যেখানে জমা হয় সেই পরিবেশের মধ্যে দারিদ্র্য ও বহু নিষেধে ঘেরা গণ্ডীর ভিতর বহু যুগ যাহারা বাস করিয়া আসিতেছে, তাহাদেরই সন্তান সে। মা সেখানে অশ্লীল গালি-গালাজে শাসন করে, উচ্ছৃঙ্খল

স্নেহে অশ্লীল কথায় আদর করে, সন্তানকে সকৌতুকে অশ্লীলতা শিক্ষা দেয়। অশ্লীলতা, কদর্য্য ভাষা, ভাব নিতাইয়ের অজানা নয়। কিন্তু জীবনে সামান্য শিক্ষা এবং কবিয়ালীর চর্চ্চা করিয়া সে-সব ভুলিতে চাহিয়াছে। সে-সবের উপর একটা অরুচি—ঘৃণা জন্মিয়াছে। কিন্তু আজ সে মদ খাইয়া উন্মত্তের মত সেই সমস্তকে উদগীরণ করিতে আরম্ভ করিল। ছন্দ এবং সুরে তাহার অধিকার ছিল, কণ্ঠস্বরও তাহার সুমিষ্ট; দেখিতে দেখিতে আসর এবার জমিয়া উঠিল। জীবনে প্রথম নেশার প্রভাবে সমস্ত আসর ও আলো তাহার চোখের সম্মুখে যেন দুলিতেছিল। একটা মানুষ দুইটা বলিয়া বোধ হইতেছে। নাচিতেছে—দুইটা নির্ম্মলা, দুইটা ললিতা; বাজাইতেছে দুইটা বায়েন; প্রৌঢ়াও দুইটা হইয়া বসিয়া মৃদু মৃদু হাসিতেছে। অকস্মাৎ এক সময়ে সে দেখিল—বসন্তও দুইটা হইয়া নাচিতেছে। বাহবা—বাহবা—সে কি নাচ!

চরমতম অশ্লীলতায় আসরটাকে আকণ্ঠ পঙ্ক-নিমগ্ন করিয়া দিয়া সে বসিল। এবার তাহাদের প্যালার থালাটা ভরিয়া উঠিয়াছে। তাহার গান শেষের সঙ্গে সঙ্গেই এবার বিপুল কলরবে হরিধ্বনি উঠিল।

প্রৌঢ়া তাহার পিঠে হাত বুলাইয়া বলিল—বাবা আমার! এই দেখ, মাল না খেলে কি মেলা-খেলায় গান হয়? যে বিয়ের যে মন্তর! বসন, বাবাকে আমার আর এক পাত্য দে। গলা শুকিয়ে গিয়েছে।

বসন! এতক্ষণে নিতাই স্থির দৃষ্টিতে বসন্তের মুখের দিকে ফিরিয়া চাহিল।

রক্তরাঙা নিতাইয়ের চোখ, পায়ের তলায় সমস্ত পৃথিবী দুলিতেছে, শঙ্কা সঙ্কোচ, সমস্ত ভুলিয়া নিতাই জয়ের আনন্দে অধীর। বসন্ত অসঙ্কোচ দৃষ্টিতে নিতাইয়ের দৃষ্টিতে দৃষ্টি মিলাইয়া চাহিয়া রহিল। আশ্চর্য্য বসন্ত! কিছুক্ষণ পূর্ব্বে সে নিতাইয়ের গালে চড় মারিয়া যে নিষ্ঠুর অপমান করিয়াছে, তাহার জন্য বিন্দুমাত্র লজ্জা বোধ করিতেছে না; বরং উচ্ছ্বসিত আনন্দে তাহার চোখ মুখ এখন ঝলমল করিতেছে। নিতাইয়ের গরবে সে গরবিনী হইয়া উঠিয়াছে।

—দাও, পাত্য দাও। নিতাই হাসিল।

—এস, ঘরে এস, ভাল মদ আছে—বেলাতী। বসন্ত তাহার হাত ধরিয়া গরবিনীর মত উঠিয়া গেল। ঘরে কাচের গেলাসে বিলাতী মদের সঙ্গে জল মিশাইয়া বসন্ত নিতাইকে দিল। নিঃশব্দে গেলাসটি শেষ করিয়া নিতাই বসনের দিকে চাহিয়া হাসিল। বলিল—তুমি খাও।—আজ আমাকে খেতে নাই। এ বসন্ত আজিকার সন্ধ্যার সেই নূতন বসন্ত; নিতাইয়ের নেশার ঘোর যেন কমিয়া আসিল।—কেনে?

নিতাই কথার উত্তর দিল না, টলিতে টলিতে বাহির হইয়া গেল। তাহার পায়ের তলার মাটি এখনও যেন কাঁপিতেছে।

প্রাতঃকৃত্য সারিয়া যখন ফিরিল, তখন সে অপেক্ষাকৃত সুস্থ হইয়াছে। দীঘির ঘাটে মাথার যন্ত্রণা উপশমের জন্য বার বার মাথা ধুইয়া ফেলিয়াছিল। ভিজা চুল হইতে তাহার সর্ব্বাঙ্গে জল ঝরিতেছিল, জলের ধারাগুলি তাহার দেহে পড়িতেছিল যেন উত্তপ্ত লোহার পাত্রে জলবিন্দুর মত। বসন্ত তখন একগাদা কাপড় লইয়া কাচিবার জন্য বাহির হইতেছিল। নিতাইকে দেখিয়া সে কাপড় রাখিয়া তাড়াতাড়ি চা করিয়া দিল। লেবুর রস দিয়া কাঁচা চা নিতাইয়ের বড় ভাল লাগিল। চায়ের বাটিটা শেষ করিয়া সে আবার ঘরের মেঝেয় বিছানো খড়ের উপরেই শুইয়া পড়িল। বসন্ত ইতিমধ্যেই সমস্ত বিছানা বাহিরে রৌদ্রে দিয়াছে। শুইবামাত্র সে আবার ঘুমাইয়া পড়িল—ঠিক ঘুম নয়, অশান্ত তন্দ্রা।

—খড়ের ওপরেই ঘুমিয়েছ ?

বসন্তের সাড়ায় সে চোখ মেলিয়া চাহিল। একগাদা ভিজা কাচা কাপড় কাঁধে ফেলিয়া আপাদমস্তক সিক্ত বসন্ত দুয়ারের গোড়ায় দাঁড়াইয়া তাহাকে ডাকিতেছিল।

—ওঠ, একটা মাদুর পতে একটা বালিশ দি। অ ভাই নির্ম্মলা, তোর দাদাকে একটা মাদুর আর বালিশ দিয়ে যা, আমার সর্ব্বাঙ্গ ভিজে।

নিতাই চোখ বুজিয়া জড়িত কণ্ঠে বলিল—না।

বসন্ত এবার আসিয়া তাহার হাত ধরিয়া আকর্ষণ করিয়া শাসনের সুরে বলিল—না নয়, ওঠ, ওঠ।

নিতাই এবার উঠিয়া বিস্ফারিত চোখে বসন্তের দিকে চাহিল।

—কই ? দাদা কই ? বলিয়া হাসিমুখে নির্ম্মলা মেয়েটি আসিয়া ঘরে ঢুকিল। যত্নে মাদুর ও বালিশ পাতিয়া দিতে দিতে বলিল—ওঃ। দাদা আমার আচ্ছা দাদা! যে গান কাল গেয়েছ !

নিতাইয়ের এতক্ষণে গত রাত্রির কথা মনে পড়িল। মস্তিষ্কের মধ্যে একটা বিদ্যুৎচমক খেলিয়া গেল।

এই মুহূর্ত্তেই ও-পাশের খড়ের ঘর হইতে দলের নেত্রী প্রৌঢ়া বাহির হইয়া আসিল।—বাবা আমার উঠেছে ? পরমুহূর্ত্তেই সে শিহরিয়া বলিয়া উঠিল—ও, মা-গো। তোর কি কাণ্ড বসন ? এই ক'দিন জ্বর ছেড়েছে, আর আজ এই সকালেই তু এমনি করে জল ঘাঁটছিস।

মৃদু হাসিয়া বসন্ত বলিল—সব কাচতে হ'ল মাসী। এইবার চান করব।

—কাচবার কি দরকার ছিল ?

নির্ম্মলা খিলখিল করিয়া হাসিয়া উঠিল—পিরীতি সামান্য নয় মাসী। দাদা কাল বমি ক'রে বিছানা পত্য ভাসিয়ে দিয়েছে।

প্রৌঢ়াও এবার মৃদু হাসিল, হাসিয়া বসন্তকে বলিল—যা যা, ভিজে কাপড় রেখে চান করে আয়। কাপড় ছেড়ে বরং ও-গুলান মেলে দিবি।

দুই চোখ বিস্ফারিত করিয়া নিতাই প্রশ্ন করিল—আমি বমি করেছি ?

নির্ম্মলা আবার খিলখিল করিয়া হাসিয়া উঠিল।

ঘাড় হেঁট করিয়া নিতাই ভাবিতেছিল—এই দুর্গন্ধ তাহা হইলে তাহারই বমির দুর্গন্ধ! অনুভব করিল, তাহার সর্ব্বাঙ্গে ওই বমির ক্লেদ লাগিয়া আছে। সেই গন্ধই নিশ্বাসের সঙ্গে তাহার ভিতরটাকে অস্থির করিয়া তুলিয়াছে! সর্ব্বাঙ্গের ক্লেদ তাহার অসহ্য হইয়া উঠিল!

—মাথা ধরেছে, লয় গো দাদা ? তুমি শোও, আমি খানিক মাথা টিপে দি। নির্ম্মলা তাহার কপালে হাত দিল। বড় ঠাণ্ডা আর বড় নরম নির্ম্মলার হাতখানি। কপাল যেন জুড়াইয়া গেল। ভারী আরাম বোধ হইতেছে। কিন্তু নিতাই স্নান না করিয়া আর থাকিতে পারিতেছে না। সে উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল—না, চান করব আমি।

বসন্ত কাপড়গুলি রাখিতেছিল, সে বলিল—নির্ম্মলা, ওই দেখ, 'বাসকো'র পাশে ফুলেল 'ত্যালের' বোতল রইছে, দে তো 'বুন' বার ক'রে। তারপর সে নিতাইকে বলিল—বেশ 'আবাং' ক'রে 'ত্যাল' মাখো। মগজ ঠাণ্ডা হবে, শরীলের আরাম পাবে। আর সাবান লাও তো তাও দেখ।

সে যখন স্নান করিয়া ফিরিল, তখন বসন্ত স্নান করিয়া কাপড় চোপড় ছাড়িয়া বাক্স লইয়া কিছু করিতেছিল। নিতাই ঘরে ঢুকিতেই সে হাসিয়া বলিল—আজ কেমন সাজব, তা দেখবা। ওই দেখ, আয়না আছে, চিরুণী আছে, 'হেমানী' আছে মুখে লাও খানিক।

স্নান করিয়া নিতাই সুস্থ হইয়াছে কিন্তু মনের অশান্তি অত্যন্ত তীক্ষ্ণ হইয়া উঠিয়াছে। ছি ! সে করিয়াছে কি ! ছি! ছি! ছি! স্নান করিয়া ফিরিয়া আসিবার পথে সে সংকল্প করিয়া আসিয়াছে, আজই সে পলাইয়া যাইবে। ইহারা যাইতে দিবে না, সুতরাং পলাইয়া যাওয়া ভিন্ন উপায় নাই। জিনিষপত্র পড়িয়া থাক, 'বাজার ঘুরিয়া আসি' বলিয়া সে বাহির হইয়া চলিয়া যাইবে। অন্য জিনিষপত্রের জন্য দুঃখ নাই, কিই বা জিনিষপত্র। কয়েকখানা কাপড়, দুইটা জামা, একটা কম্বল,

দুইটা কাঁথা বালিশ। দুঃখ তাহার কেবল দপ্তরটির জন্য। দপ্তর তো তাহার এখন নেহাত ছোটটি নয় যে গায়ের আলোয়ানের অড়াল দিয়া বগলে পুরিয়া লইয়া পালাইবে! শিশু-বোধ, রামায়ণ, মহাভারতের কথা, জানোয়ারের গল্প ও একখানা খাতা লইয়া সে ছোট দপ্তরটি তো আর নাই—ক্রমে ক্রমে অনেক বাড়িয়াছে। মেলায়, বাজারে—যেখানে সে গিয়াছে—দুই একখানা করিয়া বই কিনিয়াছে। কবিগান, পাঁচালী, তর্জ্জার গান, কৃত্তিবাসী রামায়ণ, কাশীদাসের মহাভারত, মনসার ভাসান, চণ্ডীমাহাত্ম্য, সত্যপীরের গান—অনেক বই সে কিনিয়াছে। বাবুদের পাড়ায় ছেঁড়া বইয়ের পাতা কুড়াইয়া পড়িয়া ভাল লাগিলে সংগ্রহ করা তাহার একটা রোগ ছিল। বাবুদের থিয়েটারের আশপাশ ঘুরিয়া কয়েকখানা আদি-অন্তহীন নাটকও সে সংগ্রহ করিয়াছে। এ ছাড়া নিজের লেখা গানের খাতা, সেও যে এখন অনেক হইয়াছে—সব গানই যে সে খাতায় লিখিয়া রাখে।

একখানা কাপড় তুলিয়া ধরিয়া দেখাইয়া বসন বলিল—'ওলঙ্গবাহার' সাড়ী। এই কাপড় আজ পারব।

কথাটার ইঙ্গিত নিতাই বুঝিল। অর্থাৎ বসন্ত আজ প্রায় নগ্নরূপে নৃত্য করিবে। সে শিহরিয়া উঠিল।

বসন্ত বলিল—দেখব, আজ কার জিত হয়, তোমার গানের, না আমার নাচের।

নিতাই আয়না চিরুণীটা রাখিয়া দিয়া জামা পরিতে আরম্ভ করিল। মুহূর্ত্তে সে দ্বিধাশূন্য হইয়াছে, থাক্ তাহার দপ্তর পড়িয়া—সে চলিয়া যাইবে। এখানে সে থাকিতে পারিবে না।

—জামা পরছ যে? যাবা কোথা?

—এই আসি।

বসন্ত নিতাইয়ের আকস্মিক ব্যস্ততা দেখিয়া বিস্মিত হইল, বলিল—মানে?

—এই একটুকুন বাজার ঘুরে আসি।

—না। এখন বাজার যেতে হবে না। একটুকুন ঘুমিয়ে লাও। ওই দেখ খানিকটা মাল ঢেলে রেখেছি খাও, খোঁয়াড়ী ছেড়ে যাবে।

—না। আমি একবার মন্দিরে যাব।

—মন্দিরে?

—হ্যাঁ।

—এই বলছ বাজার, এই বলছ মন্দির। কোথা যাব ঠিক করে বল কেনে?

বাজারে যাব। রাধা-গোবিন্দের মন্দিরেও যাব।

—চল। আমিও যাব।

নিতাই বিব্রত হইয়া চুপ করিয়া বসন্তের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। রূপোপজীবিনীর কিন্তু অদ্ভুত তীক্ষ্ণ দৃষ্টি—নিতাইয়ের মুখের দিকে সেও চাহিয়া ছিল, হাসিয়া সে বলিল—কি ভাবছ বল দেখি? নিতাই উত্তর দিল না। বসন্ত এবার বলিল—আমাকে সঙ্গে নিয়ে যেতে মন সরছে না? লজ্জা লাগছে?

নিতাই এ প্রশ্নের জন্য প্রস্তুত ছিল না। অতর্কিত আকস্মিক প্রশ্নে সে চকিত হইয়া উঠিল; অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া বলিল—না—না—না। কি বলছ তুমি, বসন! এস—এস।

বসন্ত বলিল—মুখ দেখে কিন্তু তাই মনে হচ্ছে আমার, তুমি যেন পালাতে পারলে বাঁচ। কে যেন তোমাকে দড়ি বেঁধে টানছে। আচ্ছা, বাইরে চল তুমি, আমি কাপড় ছেড়ে যাই।

নিতাই অবাক হইয়া গেল। বসন্তের চোখের দৃষ্টি তো ছুরি নয়—সুচ, একেবারে বুকের ভিতর বিঁধিয়া ভিতরটাকে তন্ন তন্ন করিয়া দেখিতে পায়। সে বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল। কেমন করিয়া বসন্তকে এড়াইয়া যাইতে পারা যায়, সেই সে ভাবিতে আরম্ভ করিল।

ওদিকে নির্ম্মলা, ললিতা তাহাদের প্রিয়জন বেহালাদার ও প্রধান দোহারকে লইয়া মদের আসর পাতিয়াছে। মহিষের মত বিরাটকায় লোকটা—প্রৌঢ়া দলনেত্রীর মনের মানুষ; লোকটা অদ্ভুত। উহাকে দেখিলেই নিতাই লোকটির সমস্ত কথা স্মরণ না করিয়া পারে না। লোকটা কথাবার্ত্তা বলে না, আমড়ার আঁটির মত সৌষ্ঠবহীন রাঙা চোখ মেলিয়া কেবল চাহিয়া দেখে। রাক্ষসের মত খায়; সমস্ত দিনটা প্রায়ই ঘুমায়, রাত্রে আকণ্ঠ মদ গিলিয়াও ঠায় জাগিয়া বসিয়া থাকে। তাহার সামনেই থাকে একটা আলো—আর একটা প্রজ্জ্বলিত অগ্নিকুণ্ড; এই ভ্রাম্যমাণ পরিবারটির পথে-পাতা ঘরের গণ্ডীর ভিতর রূপ ও দেহের খরিদ্দার যাহারা আসে তাহাদের দৃষ্টি তাহার উপর না পড়িয়া পারে না। অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রচণ্ড মাতালগুলা চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া তাহাকে দেখিয়া—অনেকটা শান্ত প্রকৃতিস্থ হইয়া ভদ্র সুবোধ হইয়া উঠে। লোকটা ভাম হইয়া একটা মদের বোতল লইয়া বসিয়া আছে, নির্ব্বিকার উদাসীনের মত। রান্নাশালার চালায় প্রৌঢ়া তেলেভাজা ভাজিতে বসিয়াছে! ওই এক অদ্ভুত মেয়ে। মুখে হাসি লাগিয়াই আছে, আবার মুহূর্ত্তে চোখ দুইটা রাঙা করিয়া এমন গম্ভীর হইয়া উঠে যে, দলের সমস্ত লোক ত্রস্ত হইয়া

পড়ে। আবার পরমুহূর্ত্তেই সে হাসে। গানের ভাণ্ডার উহার পেটে। অনর্গল ছড়া—গান মুখস্থ বলিয়া যায়। গৃহস্থালী লইয়া চব্বিশ ঘণ্টাই ব্যস্ত। উন্মত্ত বুনো একপাল ঘোড়াকে রাশ টানিয়া চালাইয়া লইয়া চলিয়াছে। রথ-রথী-সারথী সবই সে একাধারে নিজে।

নির্ম্মলা হাসিয়া ডাকিল—এস গো দাদা, গরীব বুনের ঘরে একবার এস।

হাসিয়া নিতাই বলিল—কি হচ্ছে তোমাদের ?

—কালকে লক্ষ্মীর বার গিয়েছে, পারণ করছি সকালে। বসন কই ? সে আসছে না কেনে ? মদের বোতলটা তুলিয়া দেখাইয়া সে খিলখিল করিয়া হাসিয়া উঠিল।

নিতাই সবিনয়ে নীরবে হাত দুইটি কেবল জোড় করিয়া মার্জ্জনা চাহিল।

বেহালাদারটি হাসিয়া বলিল—হ্যাঁ হ্যাঁ। তাকেই ডাক। কান টানলেই মাথা আসবে।

নিতাইয়ের পিছনেই বসন্তের সকৌতুক কণ্ঠস্বর ধ্বনিত হইয়া উঠিল—মাথা এখন পুণ্যি করতে চলেছে, সঙ্গে সঙ্গে কানকেও যেতে হবে। তবে যদি কেটে দাও কানকে, সে আলাদা কথা।

বসন্তের কথা কয়টি নিতাইয়ের বড় ভাল লাগিল। বাঃ, চমৎকার কথাটি বলিয়াছে বসন! খুশী হইয়া নিতাই পিছন ফিরিয়া দেখিল—গত কালকার ভক্তিমতী পূজারিণীর সাজে সাজিয়া বসন্ত দাঁড়াইয়া আছে। বসন্ত হাসিয়া বলিল—চল।

পথের দুইধারেই দোকানের সারি।

বসন্ত সামগ্রী কিনিল অনেক। ফলমূল মিষ্টিতে পুরা একটা টাকাই সে খরচ করিয়া ফেলিল। একটা সিকি ভাঙাইয়া চার আনার আধলা লইয়া নিতাইয়ের হাতে দিয়া বলিল—পকেটে রাখ।

নিতাই আবার চিন্তাকুল হইয়া উঠিয়াছিল। সে ভাবিতেছিল—এ বাঁধন কেমন করিয়া কাটিয়া ফেলা যায়, সেই কথা। মন্দির হইতে ফিরিলেই তাহাকে লইয়া আবার সকলে টানাটানি আরম্ভ করিয়া দিবে। বসন্তও তখন আর এ বসন্ত থাকিবে না। হিংস্র দীপ্তিতে ক্ষুরধার বসন্তের রূপ তাহার চোখের উপর ভাসিয়া উঠিল। সে ঠিক করিল, ফিরিবার পথে বসন্তকে বাসায় পাঠাইয়া দিয়া পথ হইতেই সে সরিয়া পড়িবে। অজুহাতের অভাব হইবে না। তাহার কোন গ্রামবাসীর সন্ধান

করিবার জন্ম মেলাটা একবার ঘুরিবার অজুহাত সে ঠিক করিয়া ফেলিল। আধলাগুলি তাহার হাতে দিতেই ভ্রূ-কুঞ্চিত করিয়া সে প্রশ্ন করিল—কি হবে ?

—ও মা গো ! রাজ্যের কানা খোঁড়া মন্দিরের পথে বসে আছে। দান করব। মৃদু হাসিয়া নিতাইয়ের মুখের দিকে চাহিয়া সে বিস্ময়ে ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া প্রশ্ন করিল—কি ভাবছ তুমি বল দেখি ?

ব্যস্ত হইয়া নিতাই অভিনয় করিয়া হাসিয়া বলিল—কিছু না।

—কিছু না ?

—ভাবছি, তোমাকে চিনতে পারলাম না। নিতাই হাসিল।

বসন্তও এবার হাসিয়া বলিল—আমার ভারি মায়া লাগে ! আহা ! কি কষ্ট বল দিকিনি কানা খোঁড়া রোগা লোকদের ? বাপরে ! বলিতে বলিতে সে শিহরিয়া উঠিল। নিতাই সত্যই এবার অবাক হইয়া গেল—বসন্তের চোখ মুহূর্ত্তে জলে ভরিয়া উঠিয়াছে।

চোখ মুছিয়া বসন্ত আবার হাসিয়া বলিল—সে হাসি বিচিত্র হাসি—এমন হাসি নিতাই জীবনে দেখে নাই ; হাসিয়া বসন্ত বলিল—আমার কপালেও অনেক কষ্ট আছে গো ! কাল তো তোমাকে বলেছি, আমার কাশির সঙ্গে রক্ত ওঠে। কাশের ব্যামো ! এত পান দোক্তা খাই তো ওই জন্মে। রক্ত উঠলে লোকে বুঝতে পারবে না। আর আমিও বুঝতে পারব না, দেখলেই ভয়, না দেখলেই বেশ থাকি। দলের কেউ জানে না, জানে কেবল মাসী। কিন্তু এখনও নাচতে গাইতে পারি, চটক আছে, পাঁচটা লোক দেখে বলেই দলে রেখেছে। যেদিন পাড়ু হয়ে পড়ব, সেদিন আর রাখবে না, নেহাৎ ভালমানুষের কাজ করে তো নোক দিয়ে বাড়ি পাঠিয়ে দেবে। নইলে, যেখানে রোগ বেশী হবে, সেইখানেই ফেলে চলে যাবে, গাছতলায় মরতে হবে। জ্যান্তেতেই হয়তো শ্যাল কুকুরে ছিঁড়ে খাবে। কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া সে আবার বলিল—দুব্বো ঘাসের রসে আর কতদিন উপকার হবে! রোজ সকালে বসন দুর্ব্বাঘাস থেতো করিয়া রস খায়। অত্যন্ত গোপনে সে এই কাজটি করে। নিয়মিত খাওয়া হয় না। তাহার অনিয়মিত উচ্ছৃঙ্খল জীবনযাত্রায় সম্ভব হইয়া উঠে না। মধ্যে মধ্যে প্রৌঢ়া মনে করিয়া দেয়—বসন, সকালবেলায় দুব্বোর রস খাস তো ?

বসন্ত কখনও কখনও সজাগ হইয়া উঠে, কখনও বা ঠোঁট উল্টাইয়া বলে—ম'লে, ফেলে দিয়ো মাসী। ও আমি পারি না।

আবার কাশি বেশী হইলেই সে সভয়ে গোপনে দুর্ব্বাঘাস সংগ্রহ করিতে ছোটে। ঘাস ছেঁচিতে ছেঁচিতে আপন মনেই কাঁদে।

নিতাইয়ের মনটা উদাস হইয়া উঠিল। সে একটা গভীর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল। হাসিতে হাসিতে বসন্ত বলিল, তাহার কাশীর অসুখের কথা, নিতাইয়ের মনে হইল, বসন্তের ওই ক্ষীণ হাসিতে ঈষৎ বিস্ফারিত ঠোঁট দুইটির কোলে-কোলে লাল কালির কলমে টানা রেখার মত রক্তের টকটকে রেখা ফুটিয়া উঠিয়াছে। 'ফেলিয়া চলিয়া যাইবে; গাছতলায় মরিতে হইবে। জীবন্তেই হয় তো শেয়াল কুকুরে ছিঁড়িয়া খাইবে!' অগ্র পশ্চাৎ সে সব ভুলিয়া গেল; নীরবে মাথা হেঁট করিয়া পথ চলিতে আরম্ভ করিল।

কিছুক্ষণ পরেই বসন্ত আবার কথা বলিল—তাহার সে কণ্ঠস্বর আর নাই; কৌতুক সরস কণ্ঠে মৃদু শব্দে হাসিয়া বলিল—গাঁটছড়া বাঁধবা নাকি? গাঁটছড়া?

নিতাই তাহার মুখের দিকে চোখ তুলিয়া চাহিল। স্থির দৃষ্টিতে বসন্তকে কিছুক্ষণ সে দেখিল। শাণিত ক্ষুরের মত ঝকঝকে ধারালো বসন্তের ধার ক্ষয় হইয়া একদিন টুকরা-টুকরা, হয়তো গুঁড়া হইয়া যাইবে উখায় ঘষা ইস্পাতের গুঁড়ার মত।

বসন্ত হাসিয়া বলিল—ঘরে বসে দেখো। এক নজর দেখে কি আশ মেটে?

নিতাইও হাসিল। মুখে কোন উত্তর না দিয়া সে বসন্তের আঁচলখানি টানিয়া নিজের চাদরের খুটে বাঁধিতে আরম্ভ করিল।

আশ্চর্য্য! মুখে বলিয়াও কাজের সময় বসন্তই লজ্জায় পড়িয়া গেল, আপনার কাপড়ের আঁচলখানা আকর্ষণ করিয়া বলিল—না না, মাইরি, না। ছি!

নিতাই হাসিয়া বলিল, গিঁঠ পড়ে গিয়েছে বসন। আমি যদি আগে মরি, তবে তুমি সেদিন খুলে লিও গিঁঠ; আর তুমি যদি আগে মর, তবে সেই দিন আমি খুলে লেব গিঁঠ।

বসন্তের মুখ যেন কেমন হইয়া গেল।

ঠোঁট দুইটা শীতশেষের পাণ্ডুর অশ্বত্থপাতা উতলা বাতাসে যেমন থরথর করিয়া কাঁপে, তেমনি করিয়া কাঁপিতেছিল। গরবিনী দর্পিতা বসন্ত যেন এক মুহূর্তে কাঙালিনী হইয়া গিয়াছে।

নিতাই এবার হাসিয়া বলিল—এস এস, আমার আর তর সইছে না ঠাকুরের দরবারে রাগ করে না।

—রাগ? বসন্ত বলিল—আমার রাগ সইতে পারবে তো তুমি?

—পায়ে ধরে ভাঙাব? নিতাই হাসিল।—এস এস।

—এই যে বাবা! কবিয়াল এস। আহ্বান করিল আখড়ার সেই বাবাজী।

হাতজোড় করিয়া নিতাই বলিল—আজ্ঞে হাঁ প্রভু! তারপর সে মুখ ফিরাইয়া বসন্তকে বলিল—পেন্নাম কর বসন! দুজনেই তাহারা একসঙ্গে প্রণাম করিল। প্রণাম করিয়া উঠিয়া নিতাই স্মিতমুখেই বলিল—বাবা, ইনিই আমাকে আশ্রয় দিয়েছেন।

—প্রেমের গুরু তোমার। বেশ—বেশ। বাবাজী হাসিল।

বসন্ত ফলমূল মিষ্টান্নগুলি নামাইয়া দিল। আঁচল খুলিয়া সওয়া পাঁচ আনা পয়সা বাহির করিয়া নামাইয়া দিয়া মৃদুস্বরে বলিল—আশীর্ব্বাদী দেবেন বাবা।

বাবাজী দুইগাছি ফুলের মালা আনিয়া দুইজনকে পরাইয়া দিলেন।

ফিরিবার পথে নিতাই বলিল—আমার গুরু হতে হবে কিন্তু।

—গুরু! বসন্ত চকিত দৃষ্টিতে নিতাইয়ের দিকে চাহিল। বসন্ত যেন পাল্টাইয়া গিয়াছে। গুরুগিরির রহস্যে সে হাসিতেও পারিল না।

—হ্যাঁ। আমাকে পদাবলী শেখাতে হবে।

—পদাবলী? মহাজনের পদ?

—হ্যাঁ।

বসন্ত চলিতে চলিতেই গান আরম্ভ করিল—অতি মৃদুস্বরে—নিতাই মুগ্ধ হইয়া শুনিতেছিল। গত রাত্রির সেই গানখানি। সমস্ত পথ ধরিয়া গানখানি সম্পূর্ণ গাহিয়া বসন্ত বলিল—এই হাতেখড়ি দিলাম।

নিতাই দেখিল, বসন্তের মুখ চোখের জলে ভাসিয়া গিয়াছে।

বসন্ত হাসিতে হাসিতে চোখমুখ মুছিয়া বলিল—মহাজনের পদ। চোখ ফেটে জল আসে।

বাসায় ফিরিতেই একটা কলরব পড়িয়া গেল। মদের নেশা তখন তাহাদের জমিয়া আসিয়াছিল! ফুলের মালা গলায়—গাঁঠছড়া বাঁধিয়া নিতাই ও বসন ফিরিতেই হুলুধ্বনি দিয়া তাহারা হৈ-চৈ করিয়া উঠিল। গাঁটছড়াটা খুলিবার কথা নিতাই বসন—দুইজনের কাহারও মনে হয় নাই।

নিতাই হাসিতেছিল।

বসন্ত কিন্তু লজ্জা পাইল। সে গাঁঠছড়াবাঁধা নিতাইয়ের কাঁধের চাদরখানা টানিয়া লইয়া লজ্জায় ছুটিয়া ঘরের মধ্যে গিয়া ঢুকিল।

অপরাহ্ণে বসন্ত নিতাইকে ডাকিয়া বলিল—এই লাও। গেরুয়া কাপড়ের মলাট দেওয়া একখানা খাতা সে নিতাইয়ের হাতে তুলিয়া দিল।

—কি? নিতাই খাতাখানা উল্টাইল। ভগডগে কাল কালিতে মোটা কলমে আঁকা বাঁকা মোটা হরপে লেখা গান। গানে গানে খাতাখানি ভর্ত্তি।

—আমাদের গানের খাতা। পদাবলীর গান পেথমেই আছে দেখ।

নিতাই কিন্তু সে লেখার একবর্ণও বুঝিতে পারিল না।

বসন্ত বলিল—পেথম পদ হ'ল—গৌরচন্দ—

"গৌরাঙ্গের দুটি পদ—যার ধন সম্পদ—সে জানে ভকতি রস সার।"

তারপরে দু লম্বর হ'ল কেত্তনের পদ। সে গড় গড় করিয়া বলিয়া গেল—

"ঢল ঢল কাঁচা অঙ্গের লাবনি অবনী বহিয়া যায়।
ঈষৎ হাসির তরঙ্গ হিল্লোলে মদন মুরছা পায়।"

নিতাই বলিল—সুর দিয়ে গেয়ে বল বসন—সুর দিয়ে, সুর দিয়ে।

বসন্ত হাসিয়া মৃদু স্বরে গান ধরিল। সঙ্গে সঙ্গে নিতাইও গুনগুন করিয়া সুরে সুর মিলাইয়া গাহিতে আরম্ভ করিল। খাদেও নিতাইয়ের গলা বেশ মিষ্ট। গান শেষ করিয়া বসন্ত হাসিয়া বলিল—তোমার নাম আজ পাল্‌টিয়ে দিলাম। কয়লামাণিক আর বলব না।

হাসিয়া নিতাই বলিল—কেনে? কয়লা-মাণিক তো বেশ নাম, কালো-মাণিক তো সবাই বলে।

সকৌতুকে বার বার ঘাড় নাড়িয়া বসন্ত বলিল—না। কালো-মাণিকও লয়।

—তবে?

—কালো-কোকিল!—বসন্তের কোকিল।

আঠারো

ভ্রাম্যমাণ দল। নাচ ও গানের ব্যবসায়ের সঙ্গে দেহের বেসাতি করিয়া বেড়ায়—গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে, দেশ হইতে দেশান্তরে। কবে কোন্ পর্ব্বে কোন্ পথে কোথা হইতে কোথায় যাইতে হইবে সেও ইহাদের নখদর্পণে। বীরভূম হইতে মুর্শিদাবাদ, পদব্রজে, গরুর গাড়ীতে, ট্রেনে, নৌকায়—মালদহ পর্য্যন্ত ঘুরিয়া আষাঢ়ের প্রারম্ভে বাড়ি ফেরে।

প্রৌঢ়া বলে—আগে আমরা পদ্মাপার পর্য্যন্ত যেতাম। পদ্মাপারে বাঙাল দেশে আমাদের ভারী খাতির ছিল।

নির্ম্মলা প্রশ্ন করে—পদ্মাপার তুমি গেয়েছ মাসী?

মাসী পদ্মাপারের গল্প বলিতে বসে। বেশ আরাম করিয়া পা ছড়াইয়া বসিয়া সুপারী কাটিতে কাটিতে বলে—বাতের 'ত্যাল' খানিক মালিস ক'রে দে দেখি; পদ্মাপারের কথা বলি শোন। আফসোস করিয়া দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলে—আঃ মা, তোরা আর কি দেখলি—কিই বা রোজগার করলি! সে 'ত্যাশ' কি! সোনার 'ত্যাশ'! মাটি কি! বারোমাস মা লক্ষ্মী যেন আঁচল পেতে বসে আছেন। সুপুরী কিনতে হয় না মা। সুপুরীর বন। যাও—কুড়িয়ে নিয়ে এস। ডাব-নারকেল—আমাদের 'ত্যাশের' তালের মতন। দু-ধা-রি পাটের 'ক্ষ্যাত'। সে একখানা হাত দীর্ঘ ভঙ্গীতে বাড়াইয়া দিয়া সুবিস্তীর্ণ পাট চাষের কথা বুঝাইয়া দিতে চেষ্টা করে। তারপর আবার বলে—এক এক পাটের ব্যাপারী কি! পয়সা কত! এই বড় বড় লৌকো। ব্যাপারীদের নজর কি, হাত দরাজ কত? প্যালা দেয় আধুলি, টাকা, সিকির কম তো লয়। আর তেমনি কি খাবার সুখ! মাছই কত রকমের! ইলিশ-ভেটকি—কত মাছ মা—'আছলি্যি' মাছ। আঃ, তেমনি কি লঙ্কা খাবার ধুম!

ললিতা বলে—আমাদের একবার নিয়ে চল মাসী ওই ত্যাশে।

মাসী বলে—মা, সি রামও নাই আর সি অযুধ্যেও নাই! সি ত্যাশে আর আমাদের আদরও নাই মা। সি কালে আমরা যেতাম—পালা গান গাইতাম। পদাবলীর গান—আমাদের সি কালের ওস্তাদেরা আবার বেশ রসান দিয়ে পালাগান 'নিকতো'—সেই সব গান আমরা গাইতাম। যে যেমন আসর আর কি! তেলক কাটতে হ'ত, গলায় কণ্ঠী পরতে হ'ত। আবার বাজারে হাটে হালফেসানী গান হ'ত। আজকাল আর পালাগান কে শোনে বল? লইলে পালাগান নিয়েই তো ঝুমুর!

নির্ম্মলার প্রিয়জন বেহালাদার বেশ মানুষ; সারাদিন বেহালাটি লইয়াই ব্যস্ত। ছড়িতে রজন ঘষিতেছে, বেহালার কান টানিয়া টানিয়া তার ছিঁড়িতেছে, আবার তার পরাইতেছে, বেহালাখানি ঝাড়িতেছে, মুছিতেছে, মাঝে মাঝে সযত্নসঞ্চিত বার্নিশের শিশি হইতে বার্নিশ লইয়া মাখাইতেছে; কিন্তু বড় একটা বাজায় না। আসরে বাজায়, বাসায় নতুন গানের মহলা বসিলে বাজায়, সে স্বতন্ত্র কথা। কিন্তু সারাদিন বেহালা লইয়া থাকিলেও আপন মনে সে বাজায় না, ছড়ি টানিয়া সুর বাঁধে মাত্র। গভীর রাত্রে সবাই যখন ঘুমায়, তখন সে মধ্যে মধ্যে এক-একদিন বেহালা বাজাইতে বসে। সে দিনটিও এখন নিতাই পূর্ব্ব হইতেই বুঝিতে পারে। নির্ম্মলার ঘরে আগন্তুক আসিয়া মহোৎসব জুড়িয়া দিলেই নিতাই বুঝিতে পারে যে, আজ বেহালাদার বেহালা বাজাইবে।

সে বাজনা অদ্ভুত। নিতাই সে বাজনা শুনিয়াছে। কিন্তু কাছে আসিয়া বসিলেই বেহালাদারের আর জমে না। নিতাই সে রাত্রে বাজনার জন্য ঘুমের মধ্যেও উদ্গ্রীব হইয়া থাকে; বাজনার সুর শুনিয়া তাহার ঘুম ভাঙিয়া যায়, কিন্তু সে উঠে না, শুইয়া শুইয়াই শোনে। মহিষের মত লোকটা অবশ্য থাকে —চুপ করিয়া রাঙা চোখ দুইটা মেলিয়া নেশা-বিহ্বল দৃষ্টিতে অন্ধকারের দিকে চাহিয়া বসিয়া থাকে; কিন্তু বেহালাদার তাহাকে গ্রাহ্য করে না। তাহার উপস্থিতিটা যেন উপস্থিতিই নয়।

বেহালাদার মাসীর কথা শুনিতে শুনিতে বলিল—উ ছাশের মাঝিদের গান শুনেছ মাসী?

—শুনি নাই? ভারী মিষ্টি সুর। প্রৌঢ়া নিজের মনেই গুন গুন করিয়া সুর ভাঁজিতে আরম্ভ করিল। বার দুয়েক ভাঁজিয়া নিজেই ঘাড় নাড়িয়া বলিল—উঁহু, আসছে না ঠিক।

বেহালাদার কি মনে করিয়া বার দুয়েক বেহালার উপর ছড়ি টানিল, প্রৌঢ়া বলিয়া উঠিল—হ্যাঁ হ্যাঁ। ওই বটে। কিন্তু বেহালাদার সঙ্গে সঙ্গেই থামিয়া গেল।

নির্মলা সুরটি শুনিবার জন্য উদ্গ্রীব হইয়াছিল, বেহালাদার থামিয়া যাইতেই সে অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া বলিল—ওই এক ধারার মানুষ। বাজাতে আরম্ভ করে থেমে গেল।

ললিতার প্রিয়জন দোহার লোকটি অত্যন্ত তার্কিক, তর্ক তাহার অধিকাংশ সময় ওই বাজনাদার লোকটির সঙ্গে। বাজনার বোল ও তাল লইয়া তর্ক তাহাদের লাগিয়াই আছে। মধ্যে মধ্যে ললিতার সঙ্গেও তর্ক হইতে ঝগড়া বাধিয়া যায়। ললিতা তাহাকে ঘর হইতে বাহির করিয়া দেয়, লোকটা মাসীর কাছে নালিশ করে, মাসীর বিচারে পরাজয় যাহারই হউক, সেই ললিতার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া বলে—দোষ হইছে আমার, ঘাট মানছি আমি। আর কখুনও এমন কম্ম করব না। কান মলছি আমি। লোকটা সত্যই কান মলে।

নির্মলা, বসন লোকটার নাম দিয়াছে—'ছুঁচো। ছি চরণের ছুঁচো।' কথাটা অবশ্য আড়ালে বলিতে হয়, নহিলে ললিতা কোঁদল বাধাইয়া তুমুল কাণ্ড করিয়া বসে। দোহার লোকটি কিন্তু রাগে না, হাসে।

বাজনাদারটির প্রিয়তমা কেহ নাই। জুটিলেও টিকিয়া থাকে না। লোকটির কেমন স্বভাব—যে নারীটির সহিত সে প্রেম করিবে, তাহারই টাকা পয়সা সে চুরি করিয়া বসিবে। লোকটি প্রৌঢ়। নির্মলা, ললিতা দুইজনেই এক এক সময় তাহার

প্রিয়তমা ছিল। কিন্তু ঐ কারণেই বিচ্ছেদ ঘটিয়া গেছে। লোকটা কিন্তু বাজায় খুব ভাল, যেমন তাহার তালজ্ঞান—বাজনার হাতটিও তেমনি মিঠা। কতবার চুরি করিয়া ঝগড়া করিয়া দল হইতে চলিয়া গিয়াছে, আবার কিছুদিন পর ফিরিয়া আসিয়াছে। লোকটা অতিমাত্রায় চরিত্রহীন। রাত্রে বাজনা বাজায়, দিনে সে ঘুরিয়া বেড়ায় নারীর সন্ধানে।

এই পারিপার্শ্বিকের মধ্যে নিতাইয়ের দিন কাটিয়া যায়। ইহারই মধ্যে সে নিস্পৃহ নিরাসক্তির এমন একটি আবরণ তৈয়ারী করিয়া লইয়াছে যে, সব কিছুই তাহার সহ্য হয়, অথচ সহনশীলতার গণ্ডী তাহাকে সঙ্কুচিত করে না। অহরহ তাহার মনের মধ্যে ঘোরে গানের কলি। বসন্ত কোকিল নাম দেওয়ায় সে একটা গান বাঁধিয়াছে, কবিগানের পাল্লার আসরে যে কোন রকমে খাপাইয়া লইয়া সে সেই গানটি গায়।

"তোরা—শুনেছিস কি—বসন্তের-কোকিল ঝঙ্কার!
বাঁশী কি সেতার—তার কাছে ছার—
সে গানের কাছে সকল গানের হার।

'কোকিল' নামটা তাহার চারিদিকেই রটিয়া গিয়াছে। ওই নামেই সে এখন চারিদিকে পরিচিত। ইহারই মধ্যে সে অনেক শিখিয়াছে, অনেক সংগ্রহ করিয়াছে। প্রাচীন প্রসিদ্ধ কবিয়ালগণের অনেক প্রসিদ্ধ পাল্লাগানের লাইন তাহার মুখস্থ। হরুঠাকুর, গোপাল উড়ে, ফিরিঙ্গী কবিয়াল অ্যাণ্টনী সাহেব, কবিয়াল ভোলা ময়রা হইতে নিতাইয়ের মনে মনে বরণ করা গুরু কবিয়াল তারণ মণ্ডল পর্য্যন্ত কবিয়ালদের গল্প গান সে সংগ্রহ করিয়া ফেলিয়াছে। অবসর সময়ে কত খেয়ালই হয় নিতাইয়ের! বসিয়া বসিয়া ঝুমুর দলের মেয়েদের 'লক্ষ্মীর কথা'টিকে সে পয়ার ছন্দে কবিতা করিয়া ফেলিয়াছে।

লক্ষ্মীর বারের দিন সে বসন্তকে অবাক করিয়া দিয়াছিল। বসন্ত যখন কথা শুনিয়া ঘরে আসিয়া সযত্নে ঠাঁই করিয়া প্রসাদ খাইতে দিল, তখন নিতাই বলিল—কথা শোনা হ'য়ে গেল?

—হ্যাঁ।

—তবে আমার কাছে একবার শুনে লাও।

সবিস্ময়ে বসন্ত বলিল—কি?

—লক্ষ্মীর কথা! বলিয়াই নিতাই হাতখানি বসন্তের দিকে প্রসারিত করিয়া কবিগানের ছড়া বলার সুরে আরম্ভ করিয়া দিল—

"নমো নমো লক্ষ্মী দেবী—নমো নারায়ণী—
বৈকুণ্ঠের রাণী মাগো—সোনার বরণী।
শতদল পদ্মে বৈস—তুঁই সে কমলা।
সামান্ত সহে না পাপ—তাই তো চঞ্চলা।"

বসন্ত অবাক হইয়া গিয়াছিল।—কোথা থেকে যোগাড় করলে? নতুন পাঁচালীর বই কিনেছ, তাতেই আছে বুঝি?

নিতাই কথার জবাব না দিয়া শুধু হাসিয়াছিল।

—বল কেনে?

—আগে শোনই কেনে। ভনিতেতেই সব পাবে।

"অধম নিতাই কবি বসন্তের কোকিল—
লক্ষ্মীর বন্দনা গায় শুনিবে নিখিল।"

মুখরা দর্পিতা বসন্ত উল্লাসে বিস্ময়ে অধীর হইয়া ছুটিয়া গিয়া সকলকে ডাকিয়া আনিয়াছিল—শোন মাসী, তোমার বাবা লক্ষ্মীর পাঁচালী নিকেছে, শোন।

নিতাইয়ের পাঁচালী শুনিয়া দলের সকলে বিস্মিত হইয়া গেল! সত্যই পাঁচালীটি ভাল হইয়াছিল। তাহা ছাড়া তাহাদের পরিচিত কবিয়ালেরা কবিগান করে, ছড়া কাটে, দুই চারিটা গান লেখে, কিন্তু এমনভাবে ধর্ম্মকথা লইয়া পাঁচালী রচনা কেহ করে না। সে-কালের বড় বড় কবিয়ালরা করিয়া গিয়াছে, তাই আজ পর্য্যন্ত চলিতেছে; ভনিতার সময়ে—সেই সব কবিয়ালদের উদ্দেশ্যে—ইহারা প্রণাম জানায়। নিতাই তেমনি পাঁচালী রচনা করিয়াছে। সেই দিন হইতেই তাহার সম্ভ্রম আরও বাড়িয়া গিয়াছে।

নিতাইয়ের পাঁচালীই এখন এই দলটিতে ব্রতকথা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। শুধু এই দলেই নয়, আরও পাঁচ সাতটা দলের ওস্তাদে এই পাঁচালী লিখিয়া লইয়া গিয়াছে। পূর্ণিমার বৃহস্পতিবারে যখন মেয়েরা বসিয়া তাহার রচনা করা লক্ষ্মীর পাঁচালী বলে, তখন নিতাই বেশ একটু গম্ভীর হইয়া উঠে। মনে মনে ভাবে, আর কি এমন রচনা করা যায়, যাহা দেশে দেশে, লোকের মুখে মুখে ফেরে!

তাহার দপ্তরটিও ক্রমশঃ বড় হইয়া উঠিতেছে। অনেক নূতন বই সে মেলায় কিনিয়াছে, আজকাল কলিকাতা হইতেও বই আনায়। এই সন্ধানটি শিখাইয়াছে দলনেত্রী ওই মাসী। মাসী অনেক জানে। নিতাই এক এক সময় অবাক হইয়া যায়। সে তাহাকে সত্যই শ্রদ্ধা করে। 'বিদ্যাসুন্দরের' সন্ধান তাহাকে মাসীই দিয়াছিল। বসন্ত একদিন চুল বাঁধিতে বাঁধিতে খোঁপা না বাঁধিয়াই বেণী ঝুলাইয়া কি কাজে

বাহিরে আসিয়াছিল; নিতাই বলিয়াছিল—বিনুনীতেই তোমাকে মানিয়েছে ভাল বসন, খোঁপা আর বেঁধো না।

মাসী সঙ্গে সঙ্গে ছড়া কাটিয়া দিয়াছিল—

"বিননিয়া বিনোদিয়া বেণীর শোভায়,
সাপিনী তাপিনী তাপে বিবরে লুকায়।"

নিতাই বিস্ময়বিস্ফারিত চোখে মাসীর দিকে চাহিয়াছিল। তাহার চোখের দৃষ্টি দেখিয়া হাসিয়া মাসী বলিয়াছিল—'বিদ্যেসোন্দর' জান বাবা? রায় গুণাকরের 'বিদ্যেসোন্দর'।

বসন্ত, ললিতা, নির্ম্মলা ধরিয়া বসিয়াছিল—আজ কিন্তু 'বিদ্যেসোন্দর' বলতে হবে মাসী।

—সব কি মনে আছে মা! ভুলে গিয়েছি।

—তবে সেই তোমার কথাটি বল। সেটি তো মনে আছে। বসন্ত হাসিয়া ভাঙিয়া পড়িয়াছিল।

—মেলেনী মাসীর কথা? মাসী হাসিয়া আরম্ভ করিয়াছিল—

"কথায় হীরার ধার—হীরা তার নাম।
দাঁত ছোলা মাজা দোলা হাস্য অবিরাম॥"

মাসী গড় গড় করিয়া বলিয়া যায়—

"বাতাসে পাতিয়া ফাঁদ কন্দল ভেলায়।
পড়শী না থাকে পাছে কন্দলের দায়॥"

নিতাই মাসীর কাছে বসিয়া বিনয় করিয়া বলিয়াছিল—আমাকে বলবে মাসী, আমি খাতায় লিকে রাখব?

—আমার তো সব মনে নাই বাবা। তুমি বিদ্যেসোন্দর বই আনাও কেনে। বটতলার ছাপাখানায় লিকে দাও, ডাকে চলে আসবে। তুমি দাম দিয়ে ছাড়িয়ে লেবে। বটতলার ঠিকানাটি পর্য্যন্ত মাসীর মুখস্থ।

বিদ্যাসুন্দরের সঙ্গে সে অন্নদামঙ্গল পাইয়াছে। বইয়ের পৃষ্ঠায় বিজ্ঞাপন দেখিয়া দাশু রায়ের পাঁচালী, উদ্ভট কবিতার বইও আনাইয়াছে। দাশু রায় পড়িয়া তাহার মনের একটা সংশয় কাটিয়াছে। "ননদিনী ব'লো নাগরে। ডুবেছে রাই রাজনন্দিনী কৃষ্ণ কলঙ্ক সাগরে।" এবং "গিন্নি, গৌরী আমার এসেছিল,—স্বপ্নে দেখা দিয়ে, চৈতন্য করায়ে চৈতন্যরূপিনী কোথায় লুকাল," দাশু রায়ই লিখিয়াছেন।

আবার খেউড়েও দাশু রায় চরম লেখা লিখিয়া গিয়াছেন। আসরে খেউড়ের পালা গাহিবার আগে সে দাশু রায়কে স্মরণ করিয়া মনে মনে প্রণাম করে।

খেউড় আর তাহাকে খুব বেশী গাহিতে হয় না। কিছুদিনের মধ্যেই কবিয়াল এবং কবিগান-শ্রোতাদের মধ্যে তাহার বেশ একটা সুখ্যাতি রটিয়া গিয়াছে। যাহার ফলে লোকে এখন তাহার গান মন দিয়া শোনে, অশ্লীল খেউড়, গালিগালাজের উত্তরে সে চোখা-চোখা বাঁকা রসিকতায় গান আরম্ভ করিলে লোকে এখন তাহারই তারিফ করে। কিছুদিন আগে একটা আসরে এমনি এক কবিয়ালের সঙ্গে আসর পড়িয়াছিল। লোকটা বুড়া হইয়াছে, তবুও যত তাহার টেরীর বাহার তত লোকটা অশ্লীল। খেউড়ে নাকি বুড়ার নাম ডাক খুব।

সেও একটা ঝুমুর দলের সঙ্গে থাকে। বুড়াই আগে আসর লইয়া নিতাইকে কালাচাঁদ খাড়া করিয়া নিজে বৃন্দে সাজিয়া বসিল। চন্দ্রাবলীটি কে, সে কথা খুলিয়া না বলিলেও সে যে বসন্ত একথা বুঝাইয়া দিতে বাকী রাখিল না। এই সম্বন্ধটা কবির পালায় বড় সুবিধার সম্বন্ধ। বিশেষ যে আগে আসরে নামে, সে বৃন্দা হইয়া প্রতিপক্ষকে কালাচাঁদ করিয়া গালি-গালাজের বিশেষ সুবিধা করিয়া লয়। তাহা ছাড়া প্রথম আসরে যেদিন বসন্ত তাহাকে চড় মারিয়াছিল, সেদিন প্রতিপক্ষ কবিয়াল নিতাইয়ের সঙ্গে এই সম্বন্ধ পাতাইয়াই তাহাকে জব্দ করিয়াছিল, সে কথাও কাহারও অজানা নাই। তাই প্রায় ক্ষেত্রেই সুবিধা পাইলেই প্রতিপক্ষ এই সম্বন্ধ পাতাইয়া বসে। লোকটা আসরে নামিয়াই খেউড় আরম্ভ করিল। নিতাইয়ের চেহারা, বসন্তের চেহারা লইয়া এবং অশ্লীল গালিগালাজ করিয়া আসর শেষ করিল।

নিতাই আসরে নামিতেই প্রৌঢ়া বলিল—বাবা খানিকটা রঙ চড়াবে নাকি?

নিতাই হাসিয়া বলিল—দেখি এক আসর, তারপর হবে। বলিয়াই সে আরম্ভ করিল—

"এ বুড়ো বয়সে বৃন্দে—কুঁচকো মুখে—আর রসকলি কাটিস্ নে।
রসের ভিয়েন না-জানিস যদি—গেঁজলা তাড়ি ঘাঁটিস নে।
শোনের নুড়ি পাকা চুলে—কাজ নাই আর আলবোট তুলে—
ও তোর—ফোকলা দাঁতে—পড়ছে লালা—জিভ দিয়ে আর চাটিস্ নে॥
—ও—হায়,—বুড়ী মরে না—মরণ নাই—
ও—ভয়ে যম—আসে নাকো—ও—তাই মরণ নাই।"

—ভয় কিসের? দোহারগণ জান তোমরা—যমের ভয়টা কিসের?

একজন বলিল—অরুচি, যমের অরুচি।

—উঁহু।

অন্য একজন বলিল—পাছে সেখানে পেজোমি করে তাই।

—উঁহু। বলি, চন্দ্রাবলী, তুমি জান?

বসন্ত বিব্রত হইল, কি বলিলে কবিয়ালের মনোমত হইবে—সে জানে না, তবু সে ঠকিবার মেয়ে নয়, সে বলিল—বুড়ি বলছে যমের সঙ্গে পিরীত করতে চায়, তাই সে ওকে নেয় না।

নিতাই বাহা-বাহা করিয়া উঠিল। ঠিক ঠিক। বলিয়াই সে গান ধরিয়া দিল—

"ও পাছে, পিরীত করিতে চায়—যম ওরে নেয় না তাই—
ও তোর পায়ে ধরি—ওরে বুড়ি—ফোকলা দাঁতে হাসিস নে।"

নিতাইয়ের মিলের বাহারে, মিঠাগলার মাধুর্য্যে, ব্যঙ্গ শ্লেষের তীক্ষ্ণতায় জমিয়া উঠে বেশ। সঙ্গে সঙ্গে বসন্ত নাচে। বসন্তও আজকাল তেমন অশ্লীল ভঙ্গি করিয়া নাচে না, তবে নাচে সে বিভোর হইয়া। লোকে পছন্দ করে। জনতার এক একটা অংশ অবশ্য অশ্লীল ইঙ্গিত করিয়া চীৎকার করে, কিন্তু বেশী অংশ তারিফই করে। দুই-দশজন ভদ্রলোককেও ক্রমে জমিতে দেখা যায় নিতাইয়ের পালার আসরে। নিতাইও অবসর বুঝিয়া গানকে আনিয়া ফেলে মিষ্ট রসের খাতে।

সে গান ধরে—

"তোমায় ভালবাসি ব'লেই তোমার সইতে নারি অসৈরণ,
নইলে তোমায় কটু বলার চেয়ে ভাল আমার মরণ॥"

সে আরম্ভ করে, তুমি বৃন্দে—তুমিই তো আমার প্রেমের গুরু—তুমিই তো আমাকে রাধাকে চিনাইয়াছ—তুমিই তো রচনা করিয়াছ—পূর্ণিমায়—পূর্ণিমায়—কুঞ্জশয্যা,—আমাদের সম্মুখে রাখিয়া—তুমিই তো গাহিয়াছ—যুগল রূপের মাধুরী—! ওগো দূতী—সেই তোমার এই বৃদ্ধ বয়সে এই মতিভ্রংশ দেখিয়া মনের যাতনায় তোমাকে কটু কথা বলিয়াছি। তুমি নিজেই একবার ভাবিয়া দেখ তোমার নিজের কথা।

"রসের ভাণ্ডারী তুমি—কথা তোমার মিছরীর পানা—
সেই তুমি আজ হাটে বেচ—সস্তা খেউড় ঘুগনীদানা।"

আসরের মোড় ফিরাইয়া দেয় নিতাই।

বসন্ত রাগ করে। কেন শেষকালে লোকটাকে এমন ধারায় মিষ্ট কথা বলিলে?

সে বলে—ওকে বিঁধে বিঁধে মারতে হ'ত। খাতির কিসের?

নিতাই হাসিয়া বলে—বসন, নরম গরম পত্রমিদং, বুঝলে? নরম গরম—মিঠে কড়া—বুঝলে কিনা—ওতেই আসর মাৎ। তারপর বুঝাইয়া বলে—লোকটার বয়েস হয়েছে—প্রাণে বেথা দেওয়া কি ভাল হ'ত? তুমিই বল!

বসন্ত ইহার পর চুপ করিয়া বসিয়া থাকে। নিতাই হাসিয়া বলে—রাগ করলে বসন?

বসন্ত হাসিয়া বলে—না।

—তবে?

—তবে ভাবছি, তুমি আমাকে সুদ্ধ নরম ক'রে দিলে।

নিতাই হাসে।

বসন্ত বলে—সে চড় মনে পড়ে?

—সে চড় না খেলে কোকিল তোমার ডাকতে শিখত না। ওঃ আমার গুরুর চড়।

বসন্ত আজ তাহার গলা জড়াইয়া ধরে। নিতাই তাহার মাথায় সস্নেহে হাত বুলাইয়া দেয়।

খেউড়, যাহাকে বলে কাঁচা খেউড়—সেও তাহাকে গাহিতে হয়। না গাহিলে চলে না। এমন আসর আসে, এমন প্রতিদ্বন্দ্বীর সম্মুখীন হইতে হয় যে, সেখানে খেউড়ের উত্তরে খেউড় ছাড়া অন্য কিছু অচল হইয়া পড়ে। আসর ও প্রতিদ্বন্দ্বী বুঝিয়া খেউড় গায় সে। আসরে একটা পালা গানের পরই সে প্রয়োজনীয়তা বুঝিতে পারা যায়। প্রথমেই সেদিন তাহার চেহারাটা হইয়া উঠে থমথমে। চোখ দুইটা উগ্র হইয়া উঠে। প্রথম হইতেই সে স্তব্ধ হইয়া যায়। দলের লোকেরাও বুঝিতে পারে, আজ লাগিল—বসন্ত এবং প্রৌঢ়া বুঝিতে পারে সর্ব্বাগ্রে।

প্রৌঢ়া বলে—বসন! ইঙ্গিত করিয়া সে হাসে।

বসন উত্তর দেয়—হ্যাঁ মাসী।

সে আসর হইতে বাহির হইয়া যায়, সেখান হইতে নিতাইকে ডাকে—শোন।

প্রৌঢ়া তাহাকে সচেতন করিয়া দেয়—বাবা! ডাকছে তোমাকে। বাবা গো!

নিতাই চমকিয়া উঠে। তারপর গম্ভীর মুখেই বাহিরে যায়, বসন্তের কাছে দাঁড়াইয়া হাত বাড়ায়। গ্লাস পরিপূর্ণ করিয়া বসন্ত মদ ঢালিয়া হাতে তুলিয়া দেয়। নিতাই ফিরিয়া আসিয়া আসরে বসে—আর এক চেহারা লইয়া বসে সে।

তারপর রাত্রির অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে আসর মাতিয়া উঠে—খেউড়ে অশ্লীলতায়। প্রতি আসরের পূর্ব্বেই বসন্ত পরিপূর্ণ গ্লাস মদ তুলিয়া দেয় তাহার হাতে। সে খায়।

মধ্যে মধ্যে নিজে ঢালিয়া বসন্তকে খাওয়ায়। বসন্তের মুখে হাসি ফুটিয়া ওঠে। সেদিন আসরে আর কিছু বাকী থাকে না। নিতাইয়ের রক্তের মধ্যে, মস্তিষ্কের মধ্যে সেদিন মদের বিষের স্পর্শ পাইয়া জাগিয়া উঠে—তাহার জন্মলব্ধ বংশধারার বিষ; সমাজের আবর্জ্জনা-স্তূপের মধ্য হইতে যে বিষ শৈশবে তাহার মধ্যে সঞ্চারিত হইয়াছিল, সে বিষ তাহার মধ্যে জাগিয়া উঠে রক্তবীজের মত। ভাষায়—ভাবে—ভঙ্গিতে অশ্লীল কদর্য্য কোন কিছুই তাহার মুখে বাধে না। শুধু তাই নয়—সেদিন সে এমন উগ্র হইয়া উঠে যে, সামান্য কারণেই লোককে সে মারিতে উদ্যত হয়।

প্রৌঢ়া সেদিন দলের লোককে সাবধান করে। বলে—হাতী আজ মেতেছে বাবা। তোরা একটুকুন সমীহ ক'রে স'য়ে থাক। তোরা তো সব কত সময়ে কত বলিস। ও তো সব সয়।

নির্ম্মলা হাসিয়া বলে—মাউতকে (মাহুত) বল মাসী।

প্রৌঢ়াও হাসে—সে বসন্তের দিকে চায়। বসন্তও হাসে। এমন দিনে বসন্তের হাসি অদ্ভুত হাসি।

নির্ম্মলা খিলখিল করিয়া হাসে বসন্তের এই হাসি দেখিয়া; বলে—কি লো হাসতে গিয়ে যে গলে পড়ছিস বসন।

বসন্তের মস্তিষ্কেও মদের নেশা—চোখ তাহার ঢুলঢুল করে। সে তবুও হাসে কারণ এমন দিনটি তাহার বহু প্রত্যাশা করা দিন। এমন দিনেই নিতাই—বসন্তকে পরিপূর্ণভাবে ধরা দেয়; বসন্তকে লইয়া সে অধীর হইয়া উঠে।

সবল বাহুর দোলায় বসন্তকে তুলিয়া লইয়া দোলায়; কখনও কখনও শিশুর মত উপরের দিকে ছুঁড়িয়া দিয়া আবার ধরিয়া লয়। মাথার উপর বসন্তকে তুলিয়া লইয়া নিজে নাচে। আর একটা অদ্ভুত খেয়াল আছে তার। সে হঠাৎ শুইয়া পড়িয়া বলে—নাচ বসন, আমার বুকের ওপর চড়ে কালীর মত নাচ। বসন্ত নির্জ্জীবের মত ক্লান্ত হইয়া এলাইয়া পড়িলে তবে তাহার নিষ্কৃতি। এমন দিনটি বসন্তের বহু-প্রত্যাশার দিন।

সহজ-শান্ত নিতাই আর এক মানুষ—সে আদরে যত্নে বসন্তকে আকণ্ঠ নিমজ্জিত করিয়া রাখে, কিন্তু দাঁড়াইয়া থাকে বসন্তের নাগালের বাহিরে।

তখন বসন্ত আপনা হইতে তাহার গলা জড়াইয়া ধরিলে সে তাহাকে টানিয়াও লয় না, আবার ঠেলিয়া সরাইয়াও দেয় না। তাহার মাথায় কিংবা পিঠে হাত বুলাইয়া দেয়—বসন্ত যেন কত ছেলেমানুষ। কিন্তু তাহাকে উপেক্ষাও করা যায় না—এমন পরম সমাদর আছে তাহার মধ্যে।

বসন্ত ছুতানাতা করিয়া অভিমান করে, কাঁদে।

নিতাই হাসিয়া তাহার চোখ মুছাইয়া দেয়। বলে—তুমি কাঁদলে আমি বেথা পাই বসন।

তারপর গুন গুন করিয়া গান ধরে—

"তোমার চোখে জল দেখিলে সারা ভোবন আঁধার দেখি।
তুমি আমার 'জেবনাধিক' জেনেও তুমি জান নাকি ?"

বসন্ত এবার খুসী হয়। তাহার মুখে হাসি ফোটে। নিজেই চোখ মুছিয়া সে বলে—হ্যাঁ, কোকিল বটে আমার! বাহারের গান হয়েছে। শেষ কর। লিকে রাখ।

এক একদিন—এই সেদিন—নিতাই যে গান গাহিল, সে গান শুনিয়া বসন্তের কান্না দ্বিগুণ হইয়া উঠিল।

নিতাইয়ের মনে পড়িয়া গেল বসন্তের সেই প্রথম রূপ। বসন্তের চোখে সে কি প্রখর চাহনি! আর সেই বসন্ত আজ কাঁদিতেছে!

নিতাই হাসিয়া গান ধরিয়া দিল—

"সে আগুন তোমার গে-লো কোথা শুধাই তোমারে ?
ও তোমার নয়নকোণে আগুন ছিল জ্বলত ধিকি ধিকি হে,
আয়নাতে মুখ দেখতে গিয়ে—দেখো নিকি সখি হে ?
ও হায়—সে আগুন জল হ'ল কি ও নয়নে পুড়াইয়ে আ-মারে ?
শুধাই তোমারে !"

গান শুনিয়া বসন্তের কান্না দ্বিগুণ হইয়া উঠিল। অনেক সাধ্য সাধনা করিয়া বসন্ত তবে ক্ষান্ত হইল।

পরদিন সকালে উঠিয়াই কিন্তু বলিল—গানটি শেষ কর, আমি শিখে তবে উঠব। তারপর বলিল—তোমাকে চড় মেরেছিলাম, সে কথা তুমি ভোল নাই তা হ'লে ?

নিতাই বলিল—ভগবানের দিব্যি বসন—

বাধা দিয়া বসন্ত বলিল—না না। আমি ঠাট্টা করছিলাম। আবার হাসিয়া বলিল—এই তো, তুমিও তো ঠাট্টা বুঝতে লার।

বসন্তও তাহাকে অনেক শিখাইয়াছে। পদাবলীর সঙ্গে সে তাহাকে টপ্পাগান শিখাইয়াছে। টপ্পাগান নিতাইয়ের বড় ভাল লাগে। এই তো গান। পদাবলীর 'পিরীতি' এক, আর টপ্পার ভালবাসা অন্য জিনিব—একেবারে খাঁটি ঘরোয়া পিরীতি।

টপ্পার সঙ্গে সঙ্গে নিধুবাবুর নামও সে জানিয়াছে। বসন্তই বলিয়া দিয়াছে। মনে মনে সে নিধুবাবুকে হাজার বলিহারী দেয়। এই না হইলে গান!

"তারে ভুলিব কেমনে।
প্রাণ সঁপিয়াছি যারে আপন জেনে!"

কিংবা—

"ভাল বাসিবে ব'লে ভাল বাসি নে।
আমার স্বভাব এই, তোমা বই আর জানি নে।"

আহা-হা! এ যেন মিছরীর পানা। নিতাই মিছরীর পানার সহিত তুলনা দেয়। নিতাইয়ের সাধ, সে এমনই গান বাঁধিবে—সে মরিয়া যাইবে, নূতন কবিয়াল নূতন ছোকরারা তাহার গান গাহিবে আর বলিবে—বাহবা! বাহবা! বাহবা! অহরহই তাহার মনে মনে গানের কলি গুন গুন করে।

মধ্যে মধ্যে নিতাই কেমন উদাসীন হইয়া উঠে।

গ্রাম পথে চলিবার সময় দ্বিপ্রহরে—দূরে পথের বাঁকে—রোদের ছটায় ঝকমক করিয়া উঠে স্বর্ণবিন্দুর মত একটি বিন্দু। বাঙলা দেশে পল্লীগ্রামে—এই সময়টাই জলখাবারের সময়, গরু খুলিবার বেলা, এই সময়েই কৃষকবধূরা মাঠে যায় পুরুষের জলখাবার লইয়া, গৃহস্থঘরে দুধের যোগান দিবার সময়ও এই। মাঠের পথে—গ্রামের পথে—ঘটী মাথায় লইয়া কৃষকবধূরা যায়; দূর হইতে রৌদ্রচ্ছটাপ্রতিবিম্বিত ঝকমকে বিন্দুটি দেখিলেই নিতাইয়ের মন উদাস হইয়া উঠে।

তাহার মনে পড়ে কাশফুলের মাথায় সোনার টোপর। ঠাকুরঝিকে মনে পড়ে। এসব তাহার কিছুই আর ভাল লাগে না। ইচ্ছা হয়—সে আজই ফিরিয়া যায় সেই গ্রামে। কৃষ্ণচূড়ার তলাটিতে বসিয়া রেললাইনের বাঁকের দিকে তাকাইয়া থাকে। মনে পড়িয়া যায় পুরানো বাঁধা গান—"চাঁদ দেখে কলঙ্ক হবে ব'লে কে দেখে না চাঁদ!"

পরক্ষণেই দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলে—নাঃ। চাঁদ তুমি আকাশে থাক। ঠাকুরঝি তুমি সুখে থাক। সংসার তোমার সুখের হোক।

আর ফিরিয়া যাইবারই বা তাহার সময় কই? পাঁচদিন আবার আসর বসিবে, এবার আর ঝুমুরদলের কবিয়ালের সঙ্গে পাল্লা নয়। আসল কবিয়ালের সঙ্গে পাল্লা। তারণ কবিয়াল, মহাদেব কবিয়াল, নোটন কবিয়ালের মত দস্তুরমত কবিয়ালের সঙ্গে পাল্লা হইবে। একটা মেলার আসরে কবিয়াল হিসাবে পাল্লা দিবার জন্য তাহাকেই

শুধু বায়না করিতে আসিয়াছিল। ঝুমুরদলের সঙ্গে কোন সংস্রবই নাই। তবু সে বলিয়াছে—উহারা ভিন্ন তাহার দোহারের কাজ কেহ করিতে পারিবে না। সুতরাং উহারাও যাইবে।

এ বায়নার পর দল চলিবে ধূলিয়ান অঞ্চলের দিকে। সে চলিয়া গেলে কি করিয়া চলিবে? দলটা কানা হইয়া যাইবে যে! সে যে তাহারই বিশ্বাসঘাতকতা করা হইবে। তা ছাড়া—বসন্ত আছে। বসন্তকে সে কথা দিয়াছে। সে যতদিন বাঁচিয়া আছে ততদিন সে তো তাহাকে ছাড়িয়া যাইতে পারিবে না। মনে পড়ে গাঁটছড়া বাঁধার কথা। কথা আছে—যে কেহ একজন মরিলে তবে এ গাঁটছড়া খুলিয়া লইবে অপর জন। ভাবিতে ভাবিতেও সে শিহরিয়া উঠে। বসন্তের মৃত্যুকামনা করিতেছে সে! না না। ঠাকুরঝি তুমি দূরেই থাক—সুখেই থাক—তোমার সঙ্গে দেখা হয়ত হইবে না। সে বসন্তের কালো-কোকিল—যেখানে বসন্ত সেইখান ছাড়া অন্য কোথাও যাইতে পারে না সে। বসন্ত বাঁচিয়া থাক—সে সুস্থ হইয়া উঠুক—বসন্তকে লইয়াই এ জীবনটা সে কাটাইয়া দিবে। এই তো কয়দিনের জীবন! কয়টা দিন। ইহার মধ্যে—বসন্তকে ভালবাসিয়াই কি শেষ করিতে পারিবে যে, ইহার পর আবার ঠাকুরঝিকে ভালবাসিবে? এমনই করিয়াই তো একদিন ঠাকুরঝিকে ছাড়িয়া—তাহাকে ভালবাসার লীলাটা অসমাপ্ত রাখিয়া—চলিয়া আসিয়া বসন্তকে পাইয়াছে, তাহাকে ভালবাসিতে সুরু করিয়াছে। আবার বসনকে ছাড়িয়া ঠাকুরঝির কাছে? না। এই ভাল।

তবুও তাহার ভাল লাগে না। সে দল হইতে বাহির হইয়া গিয়া মাঠে বসিয়া থাকে। কখনও আপনিই এক সময় চকিত হইয়া উঠিয়া ফিরিয়া আসে, কখনও বা দল হইতে কেহ যায়, ডাকিয়া আনে।

বসন্ত বলে—এই দেখ, এইবার তুমি ক্ষেপে যাবা।

নিতাই নিবিষ্টচিত্ততার মধ্যেই হাসে—কেনে? কি হ'ল?

—সকাল থেকে মাঠে মাঠে ঘুরে এলে। খেতে-দেতে হবে না?

—ভারী ভাল কলি মনে এসেছে বসন। শোন—

—না, এখন খাও দিকিনি।

—না। আগে শোন। বলিয়াই সঙ্গে সঙ্গে সুর ভাঁজিয়া আরম্ভ করে—

"এই খেদ আমার মনে মনে।
ভালবেসে মিটল না আশ—কুলাল না এ জীবনে।
(হায়) জীবন এত ছোট কেনে?"

বসন্তও মুগ্ধ হইয়া যায়, সেও সঙ্গে সঙ্গে গানটি শিখিতে বসে। খাওয়া-দাওয়া দুইজনেরই পড়িয়া থাকে।

বসন্তেরও অনেক পরিবর্তন হইয়াছে। দেহের প্রতি যত্ন এখন তাহার অপরিসীম। মদ এখন সে খুব কম খায়। দুর্ব্বাঘাসের রস আগে নিয়মিত খাওয়া ঘটিয়া উঠিত না। এখন নিয়মিত সকালে উঠিয়াই দুর্ব্বাঘাসের রসটি খাইয়া তবে অন্য কাজে সে হাত দেয়। স্বাস্থ্যও তাহার এখন অনেক ভাল হইয়াছে। শীর্ণ রুক্ষ মুখখানি অনেকটা নিটোল হইয়া ভরিয়া উঠিয়াছে, রুক্ষ দীপ্ত গৌরবর্ণে একটু শ্যাম আভাষ দেখা দিয়াছে। কথার ধার আছে, কিন্তু জ্বালা নাই। এখন আর সে তেমন তীক্ষ্ণ-কণ্ঠে খিলখিল করিয়া হাসে না। মুচকিয়া মৃদু-হাসি হাসে।

ললিতা নির্ম্মলা ঠাট্টার আর বাকি রাখে না। বসন্ত যখন নিতাইয়ের কোন কাজ করে, তখন ললিতা নির্ম্মলাকে অথবা নির্ম্মলা ললিতাকে একটি কথা বলে—'হায়—সখি, অবশেষে!' অর্থাৎ যে পিরীতিকে এককালে বসন্ত মুখ বাঁকাইয়া ঘৃণা করিত, সে পিরীতিতেই পড়িল অবশেষে!

বসন্ত রাগে না, মুচকি হাসিয়া শুধু বলে—মরণ।

প্রৌঢ়াও হাসে। মধ্যে মধ্যে সেও দুই চারিটা রহস্য করিয়া থাকে।

—বসন, ফুল তবে ফুটল। কোকিল নাম পাল্টে ওস্তাদের নাম দে বসন—ভোমরা। কোকিলও কালো, ভোমরাও কালো।

বসন্ত হাসে।

সমস্ত দিন বেশ থাকে বসন্ত, কিন্তু সন্ধ্যার পর হইতেই সে উগ্র হইয়া উঠে। দেহের বেসাতির সময় এটা। সন্ধ্যার অন্ধকার হইলেই ক্রেতাদের আনাগোনা সুরু হয়। মেয়েরা গা ধুইয়া প্রসাধন করিয়া বসিয়া থাকে। তিনজনে তখন তাহারা বসে একটি জায়গায়। অথবা আপন-আপন ঘরের সম্মুখে পিঁড়ি পাতিয়া বসে—মোট কথা এই সময়ের আলাপ-রঙ্গরহস্য সবই তাহাদের পরস্পরের মধ্যে আবদ্ধ। পুরুষদের সঙ্গে ভাবটা যেন ছাড়া-ছাড়া। ইঙ্গিতময় ভাষায় অশ্লীল ভাবের রঙ্গরহস্য চলে নিজেদের মধ্যে।

নির্ম্মলা মৃদুস্বরে ডাকে—নি-ব, নি-স, নি-ন্ত! অর্থাৎ নি শব্দটাকে যোগ করিয়া সে ডাকে—বসন্ত!

বসন্ত উত্তর দেয়—নি কি? মানে কি?

ওই নি শব্দটাকে যোগ করিয়া তারপর চলে অশ্লীল রহস্য। কোন একদিনের

ব্যভিচার-বিলাসের গল্প। সকলেই তাহারা হাসিয়া গড়াইয়া পড়ে। যেন সম্মুখের দেহব্যবসায়ের আসরের জন্য মনটাকে তাহারা সানাইয়া লয়।

আগে এ আলোচনায় এ আসরে বসন্তই ছিল সকলের চেয়ে প্রদীপ্ত। কিন্তু সে এখন স্তিমিত হইয়া গিয়াছে। গম্ভীরভাবে বসিয়া থাকে সে।

পুরুষেরা এসময়ে স্বতন্ত্র আসন পাতে। তাহাদেরও যেন সাময়িকভাবে মেয়ে-গুলির সঙ্গে সম্বন্ধ চুকিয়া যায়। নিতান্ত নির্লিপ্তের মত তাহারা বসিয়া থাকে।

নিতাই একটা নিরালা জায়গা বাছিয়া বসে, আপনার লণ্ঠনটি জ্বালিয়া দপ্তর খোলে, লেখে, পড়ে। বসন্তের ঘরে আগন্তুকদের মত্ত কণ্ঠের সাড়া জাগে—নিতাই রামায়ণ পড়ে। কৃষ্ণলীলা পড়ে। গানও রচনা করে—

"আর কতকাল মাকাল ফলে ভুলবি আমার মন ?"

অথবা—

"আমার কর্ম্মফল
দয়া ক'রে ঘুচাও হরি—জনম কর সফল।"

কখনও সে বসিয়া ভাবে। ভাবে, বড় বড় কবিয়ালদের কথা—যাহারা সত্যকারের কবিয়াল। ঝুমুরের আসরে যাহারা গান গায় না। তেমন বায়না ইদানীং তাহার ভাগ্যেও দুই-একটা করিয়া জুটিতে আরম্ভ করিয়াছে। এইবার তাহার এ দল হইতে বাহির হইয়া পড়া উচিত। এক বাধা বসন্ত। বসন্ত যে রাজী হয় না! সে সবই জানে—সবই বুঝিতে পারে। তবুও সে এ দল ছাড়িয়া যাইতে পারে না। আশ্চর্য্য! সে আপন মনেই একটু হাসে।

—কি রকম ? হাসছ যে আপন মনে!

নিতাই চাহিয়া দেখে—বেহালাদার তাহার দিকে চাহিয়া প্রশ্ন করিতেছে। সে বসিয়াছে অল্প দূরে। বেহালাদার বসিয়া আপনার বেহালাখানিকে লইয়া পড়ে। সুর বাঁধে। সে সুর বাঁধা যেন তাহার ফুরায় না। সুর বাঁধিয়া একবার ছড়ি টানিয়াই আবার তার-বাঁধা কানটায় মোচড় দেয়। তার কাটিয়া যায়। বেহালাদার নূতন তার পরাইতে বসে। ছড়িতে রজন ঘষে। বেহালাখানাকে ঝাড়ে। মাঝে মাঝে বার্নিশের শিশি হইতে বার্নিশ লইয়া বার্নিশ মাখায়।

নির্ম্মলার ঘরে কলরব উঠে।

বেহালাদার বেহালায় ছড়ি চালায়। রাত্রি একটু গভীর না হইলে—বাজনা তাহার ভাল জমে না। বারোটা পার হইলেই তাহার যেন হাত খুলিয়া যায়। একটা অদ্ভুত বাজনা সে বাজায়। বেহালাদারের সেই আড়ৎ বাজে না—লম্বা টানা সুর।

সুরটা কাঁপে। মধ্যে মধ্যে এমন বিষম কোমলের ধাপে খাদে নামিয়া আসে যে, শরীর সত্যই ঝিম্‌ঝিম্‌ করিয়া উঠে। মনে হয় যেন সমস্ত নিঝুম হইয়া গিয়াছে, চারিদিক যেন হিম হইয়া গেল। যে শোনে তাহার নিজের শরীরের হাতপায়ের প্রান্ত ভাগও যেন ঠাণ্ডা হইয়া গিয়াছে মনে হয়। অসাড় হইয়া যায় সব চিন্তা ভাবনা।

দোহারটা তর্ক করে বাজনদারের সঙ্গে।

বাজনদারটার উপরে কোন কিছুরই ছায়া পড়ে না। তাহার কেহ ভালবাসার জন নাই। সে চোর, ভালবাসিলেই ভালবাসার জনের টাকাপয়সা সে চুরি করে। সে হা-হা করিয়া হাসে—বাজনা বাজায়। দোহারটার তর্কের জবাব দেয়। মধ্যে মধ্যে গিয়া মদ খাইয়া আসে। বেহালাদারের জন্য, দোহারের জন্য মদ লইয়া আসে। তারপর ঘুম পাইলেই বিছানা পাড়িয়া শুইয়া পড়ে।

দোহারটি এখন ললিতার ঘরে গিয়া ললিতার সঙ্গে ঝগড়া বাধাইবার চেষ্টা করে।

মহিষের মত লোকটা ধূনির সম্মুখে বসিয়া থাকে। প্রৌঢ়া ঘরগুলির প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখিয়া বসিয়া সুপারি কাটে। লোকজন আসিলে মেয়েদের ডাকিয়া দেখায়, দরদস্তুর করে, টাকা আদায় করে। গোপনে মদ বিক্রী করে। প্রৌঢ়ার এই সময়ের মূর্তি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র এবং বিশিষ্ট। গম্ভীর, কথা খুব কম কয়, চোখের ভ্রূ দুইটি কুঞ্চিত হইয়া ভ্রূকুটি উদ্যত করিয়াই থাকে; দলের প্রত্যেকটি লোক সন্ত্রস্ত হয়। বসন্ত উগ্র হইয়া ঝগড়া করে, বসন্তকেও সে প্রায় ধমক দেয়।

—এই বসন! ও কি হচ্ছে? ঝগড়া করছিস কেনে?

—বেশ করছি। আমি মদ খাব না।

—এক-আধটু খেতে হবে বৈকি। তা না হ'লে হবে কেনে? নোকে আসবে কেনে?

—না আসে, নাই এল। আমার ঘরে লোক এসে দরকার নাই।

—দরকার নাই!

—না।

—বেশ, কাল সকালে তুমি ঘর চলে যেয়ো। আমার এখানে ঠাঁই হবে না।

শুধু বসন্তই নয়, নির্মলা ললিতাও মধ্যে মধ্যে ক্লান্ত হইয়া হাঁপাইয়া পড়ে। তাহারাও বলে—দরকার নাই, আর পারি না। মাসী কিন্তু অনড়। তাহার সেই এক উত্তর—তা হ'লে বাছা আমার এখানে ঠাঁই হবে না।

সকলকেই চুপ করিতে হয়, বসন্তকেও হয়। আশ্চর্য্যের কথা, আবার দশ-পনের

দিন ব্যবসায় মন্দা মন্থর হইয়া উঠিলে মেয়েগুলি চিন্তিত হইয়া পড়ে। আপনাদের মধ্যেই আলোচনা হয়।

– আর ভাই রোজকার নাই—কিছু নাই ; ভাল লাগছে না মাইরী।

— বসন !

—কি ?

—এ কেমন জায়গা বল তো ?

—কে জানে ভাই। পাঁচটা টাকা রেখেছিলাম—নাকছাবি গড়াব ব'লে ; চার টাকা তার খরচ হয়ে গেল।

মাসী তাহাদের ডাকিয়া বলে—নে. আজ সাজগোজ কর দেখি ভাল ক'রে। গাঁয়ের বাজারে বেড়াতে যাব।

অর্থাৎ মেয়েগুলিকে বাজারের পথে পথে দেখাইয়া ঘুরাইয়া আনিবে।

মেয়েরা উৎসাহিত হইয়া সাবান লইয়া পুকুরঘাটে যায়। স্নো—সিঁদুর—পাউডার —টিপ লইয়া সাজিতে বসে।

প্রৌঢ়া—ধোয়া ধপ্‌ধপে থান কাপড় পরিয়া—গালে পান পুরিয়া তাহাদের লইয়া বাহির হয়।

এই দেহের বেসাতির উপার্জ্জনেও ওই প্রৌঢ়ার স্বার্থ আছে। এই উপার্জ্জনই তিন ভাগ হইবে। দুই ভাগ পাইবে উপার্জ্জনকারিণী মেয়েটি, এক ভাগ পাইবে ওই প্রৌঢ়া—এই নিয়ম। গানের আসরের উপার্জ্জনও এমনি ভাগ করিয়া বিলি হয়। আসরের উপার্জ্জন হয় আট ভাগ—আট ভাগ হইতে—এক ভাগ হিসাবে—মেয়ে তিনটি পায় তিন ভাগ—দুই ভাগ প্রৌঢ়ার—দুই ভাগ কবিয়ালের, এক ভাগ বেহালাদারের—এক ভাগ আধ ভাগ হিসাবে দোহার ও বাজনদার পায়। উপার্জ্জন যে লোক হইতে হইবে না—প্রৌঢ়া তাহাকে দলে রাখিবে না। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে সে উপার্জ্জনের পথগুলির দিকে চাহিয়া বসিয়া থাকে। ক্ষীণতম সাড়ায় সে মিষ্টমুখে সরস বাক্যে সাদর আহ্বান করে—কে গো বাবা ? এস, এগিয়ে এস। লজ্জা কি ধন ? ভয় কি ? এস এস। আগন্তুক আগাইয়া আসিলে সে একটা মোড়া পাতিয়া বসিতে দেয়, পান দিয়া সম্মান করে, তারপর মেয়েদে ডাকে—ওলো বসন, নির্ম্মলা, ইদিকে আয়। বলি ললিতে, ক'ভরি সোনা পরেছিস কানে লো ?

বসন সেদিন বলিল—আমার গা কেমন করছে মাসী ! শরীর ভাল নাই।

—শরীরে আবার কি হ'ল তোর? কিছু হয় নাই। শোন ইদিকে। একটু মদ খেলেই চাঙ্গা হয়ে উঠবে শরীর। শোন, ইদিকে আয়।

আহ্বান—আদেশ। উপেক্ষা করিবার উপায় নাই। বসন বাহির হইয়া আসিল। পরিচ্ছন্ন বেশভূষা, গায়ে সুগন্ধি মাখিয়া একটি রীতিমত ভদ্রলোক দাঁড়াইয়া ছিল। মাসী বলিল—দেখি, তোর গা দেখি!···ওমা! গা যে দিব্যি—আমার গা তোর চেয়ে গরম! ওগো বাবা, মেয়ের আমার শরীর খারাপ। একটুকু মদ খাওয়াতে হবে। সহসা কণ্ঠস্বর মৃদু করিয়া হাসিয়া বলিল—আমার কাছেই আছে।

রূপোপজীবিনী নারী; সুরুচিসম্পন্ন বেশভূষা, সুশ্রী লোকটিকে দেখিয়া তাহার মনে অভ্যাসের নেশা জাগিয়া উঠে। কটাক্ষ হানিয়া মুচকি হাসিয়া বসন তাহাকে হাত ধরিয়া ঘরে লইয়া যায়।

মাসীও হাসিল। সে তো জানে, এ বিষ একবার ঢুকিলে—প্রেমের অমৃত সমুদ্রেও তাহাকে শোধন করা যায় না। বসন্তের শরীর ভাল হইয়া গিয়াছে।

লোকটা চলিয়া গেলে বসন্তেরও নেশা ছুটিয়া যায়। মদের নেশার প্রতিক্রিয়ার মতই একটা প্রতিক্রিয়া জাগিয়া উঠে। নেশার ভান করিয়া সে পড়িয়া রহিল, কাঁদিল। এমন ক্ষেত্রে সে কল্পনা করে, কালই—কালই সে নিতাইকে লইয়া এখান হইতে চলিয়া যাইবে। আজও করিল। কিন্তু যাওয়া সহজ কথা নয়, কোথায় যাইবে? ওই মাসী—ওই নির্মলা—ওই ললিতা ছাড়া—কে কোথায় আপন জন আছে তাহার?

* * * *

দিন সাতেক পর।

বসন্ত থরথর করিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে আসিয়া মাসীকে বলিল—মাসী!

বসন্তের কণ্ঠস্বরে মাসী চমকিয়া উঠিল। এ যে দীর্ঘকাল পরে পুরানো বসন্তের কণ্ঠস্বর!—কি, বসন?

কানের কাছে মুখ আনিয়া ফিস্ ফিস্ করিয়া বসন্ত—সেই পুরানো বসন্ত বলিল—ওষুদ, মাসী। আমার ব্যামো হয়েছে!

—ব্যামো? কাশি?

—না না না। বসন্তের চোখে ছুরির ধার খেলিতেছিল—সে দৃষ্টির দিকে চাহিয়াই প্রৌঢ়া নিজের ভুল বুঝিল,—সঙ্গে সঙ্গে হাসিয়া আশ্বাস দিয়া মাসী বলিল—তার জন্যে ভয় কি? আজই তৈরি করে দোব। তিন দিনে ভাল হয়ে যাবে, মাছটা খাস ন।

ইহাদের জীবনে এই একটা অধ্যায়। এ অধ্যায় অনিবার্য্য, আসিবেই। মানুষের জীবনে কোন্ কালে কেমন করিয়া এ ব্যাধির উদ্ভব হইয়াছিল—সে তত্ত্ব বিশেষজ্ঞের গবেষণার বিষয়। ইহাদের জীবনে এ ব্যাধি অনিবার্য্য। শুধু অনিবার্য্যই নয়, এই ব্যাধিতে জর্জ্জরিত হইয়াও বাকী জীবনটা কাটায়; মানুষের মধ্যে ছড়াইতে ছড়াইতে পথে চলে। ডাক্তার কবিরাজ দেখায় না। নিজেরাই চিকিৎসা করে। ইহাদের মধ্যে ওই চিকিৎসাবিদ্যাটাও নাচগানের ধারার মত চলিয়া আসিতেছে। চিকিৎসা অর্থে—ব্যাধিটা বাহ্যিক অন্তর্হিত হয়; কিন্তু রক্তস্রোতের মধ্যে প্রবাহিত হইয়া ফেরে। ফলে ভাবী জীবনে অকস্মাৎ কোন একটা ব্যাধি আসিয়া হতভাগিনীদের জীবনটাকে পথের ধূলার উপর আছাড় মারিয়া অর্দ্ধমৃত করিয়া দিয়া চলিয়া যায়। সে সব কথা ইহারা ভাবে না। এইটাই যে সে সব ব্যাধির হেতু তাহাও তাহারা বুঝে না। শুধু ব্যাধি হইলে তাহারা সাময়িক ভাবে আকুল হইয়া উঠে।

বসন্তও আকুল হইয়া মাসীর কাছে আসিয়া পড়িল। মাসী রোগের চিকিৎসা জানে।

সংবাদটায় ইহাদের মধ্যে লজ্জার কিছু নাই। শুধু ছোঁয়াচ বাঁচাইবার জন্য সাবধান হওয়ার মধ্যে খানিকটা ঘৃণার বা অস্পৃশ্যতা দোষের আভাষ ফুটিয়া উঠে।

গামছা-কাপড় সাবধান করিয়া নির্ম্মলা ললিতা আসিল।

বসন্ত কাহারও দিকে ফিরিয়া চাহিল না।

নির্ম্মলা পাশে বসিয়া বলিল—চুল বাঁধা রাখতে নাই। খুলে দি আয়।

নিতাই গত রাত্রের কয়েকটা উচ্ছিষ্ট পাত্র ছিল লইয়া বাহির হইয়া যাইতেছিল।

বসন্ত নির্ম্মলাকে বলিল—বারণ কর। সে আজ নিতাইয়ের সঙ্গে মুখ তুলিয়া কথা বলিতে পারিতেছে না।

নির্ম্মলা বলিল—দাদা—দাদা—

নিতাই হাসিয়া বলিল—কেনে ব্যস্ত হচ্ছ বসন? কিছু ভয় ক'রো না তুমি। আমার কিছু হবে না।

নির্ম্মলা অবাক হইয়া গেল।

তিন দিনের স্থলে নয় দিন কাটিয়া গেল। বসন্ত বিছানায় পড়িয়া ছটফট্ করিতেছিল। সর্ব্বাঙ্গ তাহার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্ফোটকে ভরিয়া গিয়াছে, দেহে কে যেন কালি ঢালিয়া দিয়াছে। গভীর রাত্রে আলো জ্বালিয়া শিয়রে বসিয়া নিতাই বাতাস করিতেছিল। এমন ক্ষেত্রে রুগ্না মেয়েগুলির দুর্দ্দশার সীমা থাকে না। ভালবাসার পাত্র পুরুষেরা তাহাদের সঙ্গ ত্যাগ করে, কেহ কেহ হয়তো দল ছাড়িয়া পলাইয়া

যায়। রোগগ্রস্তা একা পড়িয়া থাকে। যেটুকু সেবা—যেটুকু যত্ন জোটে, সেটুকু করে ওই দলের মেয়েরাই। নিতাই কিন্তু বসন্তের শিয়রে বসিয়াছে—প্রশান্ত হাসি মুখে।

বাহিরে রাত্রি নিঃশব্দ গতিতে প্রথম প্রহর পার হইয়া দ্বিতীয় প্রহরের সমীপবর্ত্তী হইয়া আসিয়াছে। অকস্মাৎ রাত্রির স্তব্ধতা ভেদ করিয়া জাগিয়া উঠিল একটি সুর। জাগিয়া বসিয়াই নিতাই মধ্যে মধ্যে ঢুলিতেছিল। সুরের সাড়ায় সে জাগিয়া উঠিল। একটু না হাসিয়া সে পারিল না। খেয়ালী বেহালাদার বেহালা বাজাইতেছে। আজ নির্ম্মলার ঘরে বীভৎস উৎসবের আসর বসিয়াছে। বেহালাদারের আজ খেয়াল জাগিবার কথা বটে। সন্ধ্যা হইতেই সে আজ এই সুর শুনিবার প্রত্যাশাও করিয়াছিল। বড় মিঠা হাত কিন্তু! অদ্ভুত সুর! বেহাগের আমেজ আছে। শুনিলেই মনে হয় গভীর গাঢ় অন্ধকার রাত্রে সব যেন হারাইয়া গেল।

—আঃ ছি! ছি! ছি!—বসন্ত জাগিয়া উঠিয়া বলিয়া উঠিল।

চকিত হইয়া নিতাই বলিল—কি বসন? কি হচ্ছে?

—আঃ! বারণ কর গো। বাজাতে বারণ কর।

—ভাল লাগছে না?

হাঁপাইতে হাঁপাইতে বসন্ত বলিল—নাঃ। নাঃ। আমার হাত-পা যেন হিম হয়ে আসছে।

ছড়ির টানে একটি দীর্ঘ করুণ সুর কাঁপিয়া কাঁপিয়া ওই রাত্রির অন্ধকারের সঙ্গে যেন মিশিয়া এক হইয়া যাইতেছে।

উনিশ

মাসখানেক পর বসন্ত রোগশয্যা হইতে কোনরূপে উঠিয়া বসিল। তখন বসন্তকে আর সে বসন্ত বলিয়া চেনা যায় না। ঘৃণিত কুৎসিত ব্যাধি তাহার প্রায় সর্ব্বস্ব লুঠিয়া লইয়া গিয়াছে। বিষাক্ত জিহ্বার হিংস্র লেহনে উজ্জ্বল গৌরী বসন্তের অনুপম দেহবর্ণ যেন মুছিয়া গিয়াছে। তাহার দিকে চাহিয়া দেখিলে মনে হয়—সর্ব্বাঙ্গে কে মাখাইয়া দিয়াছে অঙ্গারের গুঁড়া। মাথার সে চিকণ কালো দীর্ঘ চুলের রাশি হইয়া উঠিয়াছে কর্কশ পিঙ্গলাভ। শুধু বর্ণই নয়—তাহার দেহের গন্ধ রস সবই গিয়াছে; তাহার দেহে একটা উৎকট গন্ধ, রস-নিটোল কোমল দেহ কঙ্কালসার। বসন্তের গরব-করা রূপসম্পদের মধ্যে অবশিষ্ট আছে শুধু ডাগর দুইটি চোখ। শীর্ণ শুষ্ক মুখে

চোখ দুইটা যেন আরও ডাগর হইয়া উঠিয়াছে। স্তব্ধ নিশ্চল হইয়া সে বসিয়া থাকে। চোখ দুইটা জ্বল্‌জ্বল্ করিয়া জ্বলে—ভস্মরাশির মধ্যে দুই টুকরা জ্বলন্ত কয়লার মত।

সেদিন মাসী বলিল—বসন, বেশ ভাল ক'রে 'ত্যালে হলুদে' মেখে চান কর আজ।

বসন্ত নিষ্পলক চোখে স্থির দৃষ্টিতে চাহিয়া বসিয়া ছিল, সে কোন উত্তর দিল না, একটুকু নড়িল না, চোখের একটা পলক পর্য্যন্ত পড়িল না।

মাসী আবার বলিল—রোগের গন্ধ মরবে, কালচিটে খসখসে বদ ছিরি যাবে, শরীরে আরাম পাবি।

বসন্ত তবু তেমনি নীরবে বসিয়া রহিল।

মাসী এবার তাহার কাছে বসিয়া তাহাকে টানিয়া লইল—গায়ের কাপড় খুলিয়া দিয়া সর্ব্বাঙ্গে হাত বুলাইয়া দিল; ললিতাকে ডাকিয়া বলিল—ললিতে, বাটিতে করে খানিক ত্যাল গরম করে দে তো মা। আর খানিক হলুদ। তারপর সে ডাকিল নিতাইকে—বাবা! বাবা কোথা গো?

নিতাই ঘরের মধ্যে বসন্তের রোগশয্যা পরিষ্কার করিতে ব্যস্ত ছিল। বিছানাপত্রগুলি বাহিরে আনিয়া রোদে ফেলিয়া দিয়া বলিল—আমাকে বলছ মাসী?

হাসিয়া প্রৌঢ়া বলিল—বাবা মানুষের একটাই গো, বাবা, সে আমার তুমি। ভাল বাবা তুমি, মেয়ে ডাকছে—বুঝতে লারছ?

হাসিয়া নিতাই বলিল—বল।

—বসনের চিরুণী আর ত্যালের শিশিটা দাও তো বাবা, মাথায় জট বেঁধেছে—আঁচড়ে দি।

বসন এতক্ষণে কথা বলিল—বিছানার দিকে আঙুল দেখাইয়া বলিল—ওসব কি হবে?

ঘরের মধ্যে তেলের শিশি ও চিরুণীর সন্ধানে যাইতে যাইতে নিতাই বলিল—কাচতে হবে।

তীব্র তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বসন্ত চীৎকার করিয়া উঠিল—না। বলিয়াই সে ফোঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিল। সে কান্না তাহার আর থামে না।

নিতাই আশ্চর্য্য মানুষ। সে হাসিয়া সান্ত্বনা দিয়া বলিল—মাসী যা বলছে তাই শোন বসন। এ সব এখন তুমি ভেবো না।

বসন্ত কেবল কাঁদিয়াই চলিল।

নিতাই আবার বলিল—আমারও তো মানুষের শরীর! আমার রোগ হ'লে—

তুমি সুদে আসলে পুষিয়ে দিয়ো। আমি মহাজনের মত হিসেব ক'রে লোব। না, কি মাসী ?

সে হাসিতে হাসিতে বিছানাগুলা লইয়া চলিয়া গেল।

ললিতা, নির্ম্মলা গালে হাত দিয়া বিস্ময়ে হতবাক হইয়া গেল। প্রৌঢ়া একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল—বসন আমাদের ভাগ্যিমানী।

রোগ-ক্লেদ ভরা বিছানা কাপড়—সমস্ত ক্ষারে সিদ্ধ করিয়া নিতাই কাচিয়া পরিষ্কার করিল। ললিতা নির্ম্মলা—দেহোপজীবিনী—তাহাদের জীবনের প্রেম শরতের মেঘ, আসে চলিয়া যায়, যদি বা কোনটা কিছুদিন স্থায়ী হয়—তবে হেমন্তের শীতের বাতাসের মত দেহোপজীবিনীর দুর্দ্দশার আভাষ আসিবামাত্র—সেও চলিয়া যায়। নির্ম্মলার এ ব্যাধি হইয়াছে—তিনবার, ললিতার হইয়াছে দুইবার। রোগ প্রকাশ পাইবামাত্র তাহাদের ভালবাসার জন পলাইয়াছে। নির্ম্মলার একজন প্রেমিক—রোগের সুযোগে—যথাসর্ব্বস্ব লইয়া পলাইয়াছিল। শুধু নিজেদের জীবনেই নয়—তাহাদের সমব্যবসায়িনীদের জীবনেও এমন ঘটনা তাহারা দেখে নাই।

বিছানা কাপড় পরিষ্কার করিয়া ফিরিয়া নিতাই দেখিল, বসন তেমনি চুপ করিয়া বসিয়া আছে। সে তাহার দিকে চাহিয়া খানিকটা আশ্বস্ত হইল। তেল হলুদ মাখিয়া স্নান করিয়া বসন খানিকটা শ্রী ফিরিয়া পাইয়াছে ; মাথার চুল আঁচড়াইয়া প্রৌঢ়া একটি এলোখোঁপা বাঁধিয়া দিয়াছে—কপালে একটি সিঁদুরের টিপও দিয়াছে।

রোগক্লিষ্টা হতশ্রী বসন্ত সুস্থ হইয়াছে এবং অপেক্ষাকৃত সুস্থির হইয়াছে দেখিয়া নিতাই সত্যই খুসী হইল। বলিল—বাঃ, এই তো বেশ মানুষের মত হয়েছ !

বসন্ত হাসিল। তারপর ফেলিল একটা গভীর দীর্ঘনিশ্বাস, নিতাইয়ের কথাগুলা যেন বসন্তের ওই হাসির ধারের মুখে কাটিয়া খান খান হইয়া গেল। তাহার সমস্ত আশ্বাস বসন্তের দীর্ঘনিশ্বাসে যেন ফুৎকারে কোথায় উড়িয়া গেল। বসনের হাসির মধ্যে যত বিদ্রূপ তত দুঃখ, নিতাই বিচলিত না হইয়া পারিল না।

আত্মসম্বরণ করিয়া নিতাই বলিল—আমি মিছে বলি নাই বসন। তোমার রং ফিরেছে—দুর্ব্বল হোক—রোগা চেহারা গিয়েছে—বিশ্বাস না হয়—আয়নায় তুমি নিজে দেখ। সে আয়নাখানা পাড়িয়া বসন্তের সম্মুখে ধরিল।

মুহূর্ত্তে একটা কাণ্ড ঘটিয়া গেল।

বসন্তের বড় বড় সাদা চোখের কোণ হইতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ ঝরিয়া, শুষ্ক কালো বারুদের মত—তাহার দেহে যেন আগুন ধরাইয়া দিল—মুহূর্ত্তে বিদ্যুতের মত ক্ষিপ্র গতিতে নিতাইয়ের হাত হইতে আয়নাটা ছিনাইয়া লইয়া—বসন্ত তাহাকে লক্ষ্য করিয়া ছুঁড়িয়া

মারিল। দুর্ব্বল হাতের লক্ষ্য—আর নিতাইও মাথাটা খানিকটা সরাইয়া লইল—তাই নিতাই সে আঘাত হইতে বাঁচিয়া গেল। আয়নাটা ছুটিয়া গিয়া একটা বাঁশের খুঁটিতে লাগিয়া—তিন চার টুকরা হইয়া ভাঙিয়া পড়িল।

নিতাই একটু হাসিল। সে কাচের টুকরা কয়টা কুড়াইতে আরম্ভ করিল।

—বসন!

নিতাই মুখ তুলিয়া দেখিল, মাসী। গম্ভীর কঠোরস্বরে মাসী আবার বলিল—বসন!

বসন তেমনি নীরব অচঞ্চল; চোখের দৃষ্টি তাহার স্থির নিস্পলক।

—বলি, রোগ হয় না কার? তোর একা হয়েছে। জানিস—এই মানুষটা না থাকলে তোর হাড়ির ললাট ডোমের দুগ্‌গতি হ'ত!

বসন্ত তবু উত্তর দিল না। আর মাসীর এ মূর্ত্তির সম্মুখে দাঁড়াইয়া উত্তর করিবার শক্তি বা সাহস হইবার তাহার কথাও নয়। এ মাসী আলাদা মাসী। নিষ্ঠুর কঠোর শাসনপরায়ণা দলনেত্রী। মেয়েরা হইতে পুরুষ—এমন কি তাহার নিজের ভালবাসার জন—ওই মহিষের মত বিশালকায় ভীষণদর্শন লোকটা পর্য্যন্ত প্রৌঢ়ার এই মূর্ত্তির সম্মুখে দাঁড়াইতে ভয় করে। নিতাইও এ স্বর—এ মূর্ত্তির সম্মুখে স্তব্ধ হইয়া গেল, কাচ কুড়াইতে কুড়াইতে স্তব্ধ হইয়া মাসীর দিকে চাহিয়া রহিল।

মাসী আবার কঠোরতর স্বরে ডাকিল—বসন! কথার জবাব দিস না যে বড়?

বসন এবার দাঁড়াইল, নিস্পলক চোখের স্থির দৃষ্টি মাসীর দিকে ফিরাইয়া চাহিয়া রহিল। সঙ্গে সঙ্গে নিতাই আসিয়া দাঁড়াইল—দুইজনের মাঝখানে। মাসীর চোখ দুইটা ধক্ ধক্ করিয়া জ্বলিতেছে—রাত্রির অন্ধকারে বাঘিনীর চোখের মত। বসন্তের চোখে আগুন—তাহার চেতনা নাই—কিন্তু ভয়ও নাই—শুধু দাহিকাশক্তি লইয়া সে জ্বলিতেছে। নিতাই সবিনয়ে হাসিয়াও দৃঢ় স্বরে বলিল—বাইরে যাও মাসী। ছি! রোগা মানুষ—

—রোগা মানুষ! রোগ সংসারে আর কারও হয় না? ওর একার হয়েছে? ঝাঁটা মেরে—

—ছি মাসী, ছি!

—ছি? কেনে—ছি কেনে শুনি?

—রোগা মানুষ। তা ছাড়া তোমার কাছে অপরাধ তো কিছু করে নাই।

—আমার দলের নোকের ওপর করেছে। এতে আমার দল থাকবে কেনে। তুমি আমার দলের নোক।

—বসনের জন্যেই তোমার দলে আছি মাসী। যাও, তুমি বাইরে যাও।

প্রৌঢ়া নিতাইয়ের মুখের দিকে চাহিল। এ দলের প্রত্যেকটি লোক আপনার অজ্ঞাতসারেই প্রৌঢ়ার আনুগত্য স্বীকার করিয়া লয়। দলনেত্রী এ কথাটা ভাল করিয়াই জানে। দলের সর্ব্ববিষয়ে তাহার ব্যবস্থার অধিকার, প্রতিটি কপর্দ্দক তাহার হাত দিয়া বিতরণের বিধি—তাহার আসন, তাহার সাজ সরঞ্জামের আভিজাত্য, প্রত্যেক জনকে অধীন অনুগত করিয়া তোলে। নিজের যৌবনে—তাহার দলনেত্রীর দলে সে নিজেও এমনই করিয়া আনুগত্য স্বীকার করিয়া আসিয়াছে, তাহার দলে এতদিন পর্য্যন্ত সকলেই তাহার আনুগত্য স্বীকার করিয়া আসিতেছে; আজ তাহার ব্যতিক্রম দেখিয়া সে স্তম্ভিত হইয়া গেল। এ ক্ষেত্রে তাহার দুর্দ্দান্ত রাগ হইবার কথা, সক্রোধে ওই ভীষণদর্শন লোকটাকে আহ্বান করাই উচিত। কিন্তু নিতাইয়ের মুখের দিকে চাহিয়া দুইটার একটাও তাহার মনে হইল না। মনে হইল—এ লোকটি আনুগত্য স্বীকারই করে নাই কোনদিন, এবং আজ সে তাহাকে যে লঙ্ঘন করিল, তাহারও মধ্যে রূঢ় কিছু নাই, উদ্ধত কিছু নাই, নিতাই তাহার কোনমতেই অপমান করে নাই।

তাহার মুখের দিকে কিছুক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া সে বলিল—আশীর্ব্বাদ করি বাবা, তুমি চিরজীবী হও। মাসী ছেড়ে আজ তোমার সঙ্গে মা-বেটা সম্বন্ধ পাতাতে ইচ্ছে করছে। তা হ'লে শেষ কালটার জন্যে আর ভাবনা থাকে না।

নিতাই হাসিয়া বলিল—মা মাসী তো সমান কথা গো! এখন ঘরে যাও! বউ বেটার ঝগড়া মা-মাসীকে শুনতে নাই।

আর কোন কথা না বলিয়া সে এ অনুরোধ মানিয়া লইল, চলিয়া গেল।

নিতাই এবার বসনের দিকে ফিরিয়া বলিল—ছি! রোগা শরীরে কি এমন রাগ করে? রাগে শরীর খারাপ হয় বসন।

অকস্মাৎ বসন সেই মাটির উপরেই উপুড় হইয়া পড়িয়া ফোঁপাইয়া কাঁদিতে আরম্ভ করিল।

সস্নেহে নিতাই বলিল—আজ সকাল থেকে এমন ক'রে কাঁদছ কেনে বসন?

বসন্তের কান্না বাড়িয়া গেল; সে কান্নার আবেগে শ্বাস যেন রুদ্ধ হইয়া আসিতেছিল।

নিতাই তাহার মাথায় সস্নেহে হাত বুলাইয়া দিয়া বলিল—কাল কলকাতায় ওষুদের দোকানে চিঠি নিকেছি; সালসা আনতে দিয়েছি তিন শিশি। সালসা খেলেই শরীর সেরে উঠবে, রক্ত পরিষ্কার হবে—সব ভাল হয়ে যাবে।

শ্বাসরোধী কান্নার আবেগে বসন্ত কাশিতে আরম্ভ করিল। কাশিয়া খানিকটা শ্লেষ্মা তুলিয়া ফেলিয়া অবসাদে নির্জ্জীবের মত পড়িয়া রহিল। ধীরে ধীরে একটা আঙুল দিয়া কি যেন সে দেখাইয়া দিল।

—কি ?

এতক্ষণ পরে বসন্ত কথা বলিল—অদ্ভুত হাসি হাসিয়া বলিল—রক্ত।

—রক্ত ?

—সেই কাল রোগ! বসন্ত আবার হাসিল। এতক্ষণ ধরিয়া যেন এই কথাটা বলিতে না পারিয়াই সে কাঁদিতেছিল। কথাটা বলিয়া ফেলার সঙ্গে সঙ্গে কান্নাও তাহার শেষ হইয়াছে।

নিতাই স্থির তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া দেখিল—টকটকে রাঙা আভাস সুস্পষ্ট। একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া সে অনেকক্ষণ চুপ করিয়া রহিল।

বসন্ত বলিল—কেনে তুমি দলে এসেছিলে, তাই আমি ভাবছি ; মরতে আমার ভয় ছিল না। কিন্তু আর যে মরতে মন চাইছে না। রোগক্লিষ্ট শীর্ণ মুখে মৃদু-হাসি মাখিয়া সে একদৃষ্টে নিতাইয়ের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

তাহার কপালে মুখে হাত বুলাইয়া নিতাই বলিল—ভয় কি ? রোগ হ'লেই কি মরে বসন ? শরীর সারলেই—ও রোগও ভাল হয়ে যাবে।

আবার সেই বিচিত্র হাসি হাসিয়া বসন নীরবে শুধু ঘাড় নাড়িয়া জানাইয়া দিল—না না না।

কিছুক্ষণ পর মুখ ফুটিয়াই বলিল—আর বাঁচব না।

নিতাইয়ের চোখে এবার জল আসিল।

বসন্ত বলিল—আমি জানতে পেরেছি। বেহালাদার রাত্রে বেহালা বাজায়, আগে কত ভাল লাগত। এখন ভয় লাগে। মনে হয়, আমার আশেপাশে দাঁড়িয়ে কে যেন বিনিয়ে বিনিয়ে কাঁদছে! অহরহ মনে আমার মরণের ভাবনা। মনের কথা কি মিথ্যে হয়!

বসন্তের মনের কথা সত্যসত্যই সত্য, মিথ্যা নয় ; দিন কয়েক পরেই সন্ধ্যার দিকে তাহার দেহের উত্তাপে স্পষ্ট জ্বর বুঝিতে পারা গেল। এই অবস্থাতেই স্থান হইতে স্থানান্তরে যাত্রার তাহাদের বিরাম ছিল না। সেদিন তাহারা একটা ছোট-খাটো শহরে আসিয়া বাসা গাড়িয়াছিল। ঘর এবার খড়ের নয়, বাজারে জীর্ণ একটা

মাটির বাড়ি তাহারা ভাড়া লইয়াছিল। নিতাই বলিল - ললিতেকে একবার ডাকি, তোমার কাছে বসুক। আমি একজন ডাক্তারকে ডেকে আনি।

—না। আকুল হইয়া বসন্ত বলিয়া উঠিল—না।

—এই আধ ঘণ্টা। আমি দণ্ডের মধ্যে ফিরে আসব।

—না—গো— না! যদি কাশি ওঠে। রক্ত যদি দেখতে পায়! তবে এই পথের মধ্যেই ফেলে আজই এখুনই পালাবে সব! যেয়ো না, তুমি যেয়ো না।

নিতাই অগত্যা বসিল। রক্ত উঠার কথা আজও সকলের কাছে লুকানো আছে।

জ্বরটা যেন আজ বেশী বেশী বাড়িতেছে। অন্য দিন রাত্রি প্রহর খানেক হইতেই খানিকটা ঘাম হইয়া জ্বর ছাড়ে, বসন্ত অনেকটা সুস্থ হয়। আজ ঘামও হয় নাই—সে সুস্থও হইল না। মধ্যে মধ্যে জ্বরজর্জ্জর অসুস্থ বিহ্বল ব্যগ্র দৃষ্টি মেলিয়া সে চারিপাশ খুঁজিয়া নিতাইকে দেখিতেছিল—আবার চোখ বন্ধ করিয়া এ-পাশ হইতে ও-পাশে ফিরিয়া শুইতেছিল। অস্থিরতা আজ অতিরিক্ত।

নিতাই সে দৃষ্টির অর্থ বুঝিয়াছিল। তাই যতবার সে চোখ মেলিয়া তাহাকে খুঁজিল, ততবার সে সাড়া দিয়া বলিল—আমি আছি। এই যে আমি।

রাত্রির তখন শেষ প্রহর। নিতাই তন্দ্রাচ্ছন্ন হইয়া দেওয়ালে ঠেস দিয়া বসিয়াই ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল।

রাত্রির শেষ প্রহর অদ্ভুত কাল। এই সময় দিনের সঞ্চিত উত্তাপ নিঃশেষে ক্ষয়িত হইয়া একটা রহস্যময় ঘন শীতলতা জাগিয়া উঠে, সেই স্পর্শ ললাটে আসিয়া লাগে, চেতনা যেন অভিভূত হইয়া পড়ে। ধীরসঞ্চারিত নৈঃশব্দের মধ্য দিয়া একটা হিমরহস্য সমস্ত সৃষ্টিকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে, নিস্তরঙ্গ বায়ুস্তর মধ্যে নিঃশব্দসঞ্চারিত ধূমপুঞ্জের মত। মাটির বুকের মধ্যে, গাছে-পাতায় থাকিয়া যে অসংখ্য কোটী কীটপতঙ্গ অবিরাম ধ্বনি তুলিয়া থাকে, তাহারা পর্য্যন্ত অভিভূত হইয়া পড়ে, আচ্ছন্নের মত। এ সময়ে কিছুক্ষণের জন্য তাহারাও স্তব্ধ হয়। আকাশে জ্যোতির্লোক হয় পাণ্ডুর; সে লোকেও যেন হিম তমসার স্পর্শ লাগে। কেবল অগ্নিকোণে ধক্ ধক্ করিয়া জ্বলে শুকতারা—অন্ধ রাত্রি-দেবতার ললাটচক্ষুর মত। সকল ইন্দ্রিয় আচ্ছন্ন-করা রহস্যময় এই গভীর শীতলতার স্পর্শে নিতাই শত চেষ্টা সত্ত্বেও—জাগিয়া থাকিতে পারে নাই। আচ্ছন্নের মত দেওয়ালের গায়ে কখন ঢলিয়া পড়িয়াছিল।

অকস্মাৎ সে জাগিয়া উঠিল—বসন্তের আকর্ষণে। বসন্ত কখন উঠিয়া বসিয়াছে।

দুই হাত দিয়া তাহার গলা জড়াইয়া ধরিয়া সে ডাকিতেছে—ওগো! ওগো! আর্ত্ত-বিহ্বল তাহার কণ্ঠস্বর।

—কি বসন? কি? উঠে বসলে কেনে? শোও, শোও! বসন্তের হাত দুইটি হিমের মত ঠাণ্ডা; পৃথিবীর বুক ব্যাপ্ত করিয়া যে হিমানীপ্রবাহ ভাসিয়া উঠিয়াছে, সেই হিমানীপ্রবাহ যেন সরীসৃপের মত বসন্তের হাতের মধ্য দিয়া নিঃশব্দ সঞ্চারে সর্ব্বদেহে সঞ্চারিত হইতেছে। বসন্তের সর্ব্বাঙ্গে ঘাম।

—বারণ কর। বারণ কর।

—কি?

—বেহালা। বেহালা বাজাতে বারণ কর গো।

—বেহালা? কই? নিতাই বেশ কান পাতিয়া শুনিল। কিন্তু রাত্রির স্তব্ধ শেষ প্রহরেও—তাহাদের দুই জনের শ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দ ছাড়া—আর কোন ধ্বনি সে শুনিতে পাইল না।

—আঃ, শুনতে পাচ্ছ না? ওই যে, ওই যে! কেবল বেহালা বাজছে, কেবল বেহালা বাজছে।

চকিতের মত একটা কথা নিতাইয়ের মনের মধ্যে জাগিয়া উঠিল।

বসন্তের দেহের স্পর্শই তাহাকে সচেতন করিয়া দিল। তাহার মণিবন্ধ স্পর্শ করিয়া সকরুণ দৃষ্টিতে বসন্তের মুখের দিকে চাহিয়া নিতাই বলিল—গোবিন্দের নাম কর বসন।

—কেনে? বসন্ত অস্থির ভাবে প্রশ্ন করিল—কেনে?

কেন সে কথা নিতাই কিছুতেই বলিতে পারিল না।

মৃত্যুকালীন অস্থিরতার মধ্যেও হঠাৎ কয়েক মুহূর্ত্তের জন্য শান্ত স্থির হইয়া বড় বড় চোখ আরও বড় করিয়া মেলিয়া বসন্ত প্রশ্ন করিল—আমি মরছি?

নিতাই ম্লান হাসিমুখে তাহার কপালে হাত বুলাইয়া দিয়া এবার বলিল—ভগবানের নাম—গোবিন্দের নাম করলে কষ্ট কম হবে বসন।

—না। ছিলা-ছেঁড়া ধনুকের মত সজোরে পাশ ফিরিয়া শুইয়া বসন বলিল—না। কি দিয়েছে ভগবান আমাকে? স্বামীপুত্র ঘরসংসার কি দিয়েছে? না।

নিতাই অপরাধীর মত চুপ করিয়া রহিল। ভগবানের বিরুদ্ধে যে নালিশ বসন করিল, সে নালিশের সব দায়দাবী, কি জানি কেন, তাহারই মাথার উপর চাপিয়া বসিয়াছে বলিয়া যেন অনুভব করিল।

বসন আবার পাশ ফিরিয়া বলিল—গোবিন্দ, রাধানাথ, দয়া ক'রো। আসছে

জন্মে দয়া ক'রো। তাহার বড় বড় চোখ দুইটা জলে ভরিয়া টলমল করিতেছিল, বর্ষার প্লাবনে ডুবিয়া-যাওয়া পদ্মের পাপড়ির মত। নিতাই সযত্নে আপনার খুঁটে সে জল মুছাইয়া দিয়া বলিল—বসন!

—না, আর ডেকো না। না! বলিতে বলিতেই সে আবার অধীর আক্ষেপে শূন্য বায়ুমণ্ডলে কিছু যেন আঁকড়াইয়া ধরিবার জন্য দুই হাত প্রসারিত করিয়া নিষ্ঠুরতম যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া উঠিল।

পরক্ষণেই সে নিতাইয়ের কোলে ঢলিয়া পড়িয়া গেল।

কুড়ি

গঙ্গার তীরবর্ত্তী শহর। গঙ্গার তীরবর্ত্তী শ্মশানেই, নিতাইই বসন্তের সৎকার করিল। সাহায্য করিল দলের মেয়েরা। কিন্তু আশ্চর্য্যের কথা পুরুষেরা শব স্পর্শ পর্য্যন্ত করিল না। এ ক্ষেত্রে আপন আপন জাতি সম্বন্ধে তাহারা সচেতন হইয়া উঠিল। দোহার—ললিতার ভালবাসার মানুষ—সে মুখ ফুটিয়া বলিল—ওস্তাদ, যা করছে ওরাই করুক। করলে তো অনেক। আবার কেনে?

নিতাই হাসিল, প্রতিবাদ করিল না। তাহার কথা শুনিবার লক্ষণও দেখাইল না। তার্কিক দোহার ছাড়িল না, বলিল—হাসির কথা নয় ওস্তাদ। পরকালে—

বেহালাদারটি হাসিয়া বাধা দিয়া বলিল - যাক ভাই, ও কথা যাক। বলিয়াই সে বেহালায় ছড়ির টান দিল।

চিতার উপর শবদেহ চাপাইবার পূর্ব্বে প্রৌঢ়া একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিল—আঃ! বসন, আমার সোনার বসন! দুই ফোঁটা চোখের জলও তাহার চোখ হইতে ঝরিয়া পড়িল। পাশেই বালুচরের উপর বসিয়া ছিল নির্ম্মলা ও ললিতা। নিঃশব্দ কান্নায় তাহাদের চোখ হইতে শুধু জল ঝরিয়া পড়িতেছিল অনর্গল ধারায়।

নিতাই দেহটা চিতার উপর চাপাইবার উদ্যোগ করিল, প্রৌঢ়া বলিল—দাঁড়াও বাবা, দাঁড়াও। সে আসিয়া বসন্তের আভরণ খুলিতে বসিল। নিম্নশ্রেণীর দেহোপজীবিনীর কিই বা আভরণ! কানে দুইটা ফুল, নাকে একটা নাকচাবী, হাতে দুইগাছা শাঁখা বাঁধা, তাহার উপর বসন্তের গলায় ছিল একছড়া হালকা বিছাহার।

নিতাই হাসিল। বলিল—খুলে নিচ্ছ মাসী?

মাসী কেবল তাহার মুখের দিকে একবার চাহিল, তারপর আপনার কাজে মন

দিল। গহনাগুলি আঁচলে বাঁধিয়া সে বলিল—বুকের নিধি চলে যায় বাবা, মনে হয় দুনিয়া আঁধার, খাস্তি বিষ, আর কিছু ছোঁব না—কখন কিছু খাব না। আবার এক বেলা যেতে না যেতে চোখ মেলে চাইতে হয়, উঠতে হয়, পোড়া পেটে দুটো দিতেও হয়, লোকের সঙ্গে চোখ জুড়তে হয়। বাঁচতেও হবে, খেতে পরতেও হবে, এগুলো চিতেয় দিয়ে ফল কি বল? বক্তব্য শেষ করিয়া হাসিয়া সে বলিল—এগুলি আমার পাওনা বাবা।

নিতাই আবার একটু হাসিল, হাসিয়া সে বসন্তের নিরাভরণ দেহখানি চিতায় চাপাইয়া দিল।

প্রৌঢ়া আবার বলিল, কপালে হাত দিয়া আক্ষেপ করিয়াই বলিল—আমার অদেষ্ট দেখ বাবা। আমিই হলাম ওদের ওয়ারিশান। প্রৌঢ়ার চোখ দিয়া জল গড়াইয়া পড়িল।

ললিতা, নির্ম্মলা অদূরে সজল চোখে উদাস দৃষ্টিতে বসন্তের চিতার দিকে চাহিয়াছিল। বসন্তের বিয়োগে বেদনা তাহাদের অকৃত্রিম; কিন্তু ঠিক এই মুহূর্ত্তটিতে তাহারা ভাবিতেছিল, নিজেদের কথা। তাহাদেরও হয়তো এমনি করিয়া যাইতে হইবে, মাসী এমনি করিয়াই তাহাদের দেহ হইতে সোনার টুকরা কয়টা খুলিয়া লইবে। বহুভাগ্যে যদি বুড়া হইয়া বাঁচে, তবে ওই মাসীর মতই তাহারাও দলের কর্ত্রী হইবে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল। কল্পনা তাহাদের ততদূর গেল না, আশার চেয়ে নিরাশাই তাহাদের বড়। শুধু তাহাই নয়, নিরাশ পরিণাম কল্পনা করিতেই এই মুহূর্ত্তটিতে বড় ভাল লাগিতেছে। তাহারাও এমনি করিয়া মরিবে, মাসী বাঁচিয়া থাকিবে।

সৎকার শেষ করিয়া ফিরিয়া নিতাই দেখিল, মহিষের মত লোকটা বসন্তের ঘরে আড্ডা গাড়িয়া বসিয়া আছে। বসন্তের জিনিসপত্রগুলি ইহারই মধ্যে এক জায়গায় স্তূপীকৃত করিয়া রাখা হইয়া গিয়াছে।

আবারও নিতাই একটু হাসিয়া ঘরের একপাশে একটা মাদুর বিছাইয়া চিতাগ্নির উত্তাপজর্জ্জর, পরিশ্রমক্লান্ত দেহ গড়াইয়া দিল।

ভাবিতেছিল মরণের কথা।

মরণ কি? পুরাণে পড়া মরণের কথা তাহার মনে পড়িল। মানুষের আয়ু ফুরাইলে ধর্ম্মরাজ যম আদেশ দেন তাঁহার অনুচরগণকে, মানুষের আত্মাকে লইয়া আসিবার জন্য। ধর্ম্মরাজের অদৃশ্য অনুচরেরা আসিয়া মানুষের অঙ্গুলিপ্রমাণ আত্মাকে

লইয়া যায়। ধর্ম্মরাজের বিচারালয়ে ধর্ম্মরাজ তাহার কর্ম্ম বিচার করেন, স্বর্গ অথবা নরকে তাহার বাসস্থান নির্দ্দেশ করিয়া দেন। বিভিন্ন কর্ম্মের জন্য বিভিন্ন পুরস্কার—বিভিন্ন শাস্তির ব্যবস্থাও সে পড়িয়াছে। নিতাইকেও একদিন সেখানে যাইতে হইবে। বসন্তের সঙ্গে তাহার কর্ম্মেরই বা পার্থক্য কোথায়? সুতরাং বসন্ত যেখানে গিয়াছে, সেখানেই সে যাইবে। অনন্ত নরকে হয়তো! সেদিন আবার তাহার সঙ্গে দেখা হইবে। কিন্তু আজ তাহাতে তাহার মন ভরিল না। তাহার কোলের উপরেই বসন্ত মরিয়া লুটাইয়া পড়িল, সে নিজহাতে তাহার দেহখানা পুড়াইয়া ছাই করিয়া দিল। সমস্ত পৃথিবীর মধ্যে আর বসন্তকে খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না।

এই একটা কথাই বার বার মনে ঘুরিতেছে।

বসন্ত চলিয়া গেল। সমস্ত পৃথিবী খুজিয়া আর তাহাকে পাওয়া যাইবে না। সেই বসন্ত! ঝক্‌মকে ক্ষুরের মত মুখের হাসি, আগুনের শিখার মত তাপ, তেমনি রঙ, তেমনি রূপ, বসন্তকালের কাঞ্চনগাছের মতই বসনের বেশভূষার বাহার। সেই বসন চলিয়া গেল! গায়ের গহনাগুলা প্রৌঢ়া টানিয়া খুলিয়া লইল, সে নিজে তাহার দেহখানা আগুনে তুলিয়া দিল, বসন একটা প্রতিবাদও করিল না। মরণ সত্য সত্যই অদ্ভুত। গহনার উপর বসন্তের কত মমতা! সেই গহনা প্রৌঢ়া লইল। বসন্ত একটা কথাও বলিল না। দেহের জন্য তাহার কত যত্ন এতটুকু যন্ত্রণা তাহার সহ্য হইত না—সেই দেহ আগুনে পুড়িয়া ছাই হইয়া গেল, কিন্তু তাহার মুখের এতটুকু বিকৃতি হইল না। দুঃখ, কষ্ট, লোভ, মোহ সব এক মুহূর্ত্তে মরণ ঘুচাইয়া দিল! মরণ অদ্ভুত! থাকিতে থাকিতে তাহার মনে গানের কলি গুন গুন করিয়া জাগিয়া উঠিল।

"মৃত্যু হে, কোটি বার প্রণাম তোমায়।
তুমি যারে কৃপা কর—তাহার সকল দুঃখ হর—
ক্রোধ মোহ অহঙ্কারো—মুছে দাও এক লহমায়।"

তবুও একটা দুঃখ তাহার মনে কাঁটার মত বিঁধিতেছিল। বসন্ত আজই মরিয়াছে, দুপুরবেলা পর্য্যন্ত দেহটাও তাহার ছিল। এখন প্রায় সন্ধ্যা হইয়াছে, ইহারই মধ্যে দল হইতে বসন্ত মুছিয়া গেল। প্রৌঢ়া বসন্তের জিনিসপত্র লইয়া আপনার ঘরে পুরিয়া খাওয়াদাওয়ার ব্যবস্থায় ব্যস্ত। ললিতা, নির্ম্মলা আজ নিজেরা খরচ দিয়া মদ কিনিয়া খাইতে বসিয়াছে। বেহালাদার, দোহার ও ঢুলীটা আলোচনা করিতেছে, কোন্ দলে কে গানে-নাচে-রূপে-যৌবনে সেরা মেয়ে আছে। সর্ব্ববাদিসম্মতভাবে 'প্রভাতী' নাম্নী কে একজন তরুণীর নাম স্থির হইয়াছে; তাহাকেই আনা উচিত। বিশ ত্রিশ এমন

কি পঞ্চাশ টাকা পর্য্যন্ত দিয়াও তাহাকে দলে আনা প্রয়োজন। নতুবা এ দল অচল হইয়া যাইবে।

ঢুলীটা বলিল—ললিতা নির্ম্মলা মুখপাত হ'লে চোখ বুজে গান শুনতে হবে।

ললিতা নির্ম্মলা ফোঁস করিয়া উঠিল। মদের নেশায় উত্তেজিত রূপোপজীবিনী নারী, রূপের নিন্দায় গালিগালাজে স্থানটাকে অসহনীয় করিয়া তুলিয়াছে।

বসন্ত ইহারই মধ্যে মুছিয়া গেল?

নিতাই ধীরে ধীরে অলক্ষিতে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। আসিয়া বসিল গঙ্গার ধারে শ্মশানে, বসন্তের চিতার পাশে।

এমন ঘনিষ্ঠ নৈকট্য হইতে নিতাই মৃত্যুকে কখনও দেখে নাই। পাড়ায়—গ্রামে মানুষ মরিয়াছে, সে শুনিয়াছে। মরণ সম্বন্ধে সকল মানুষের মতই একটা ভয়—একটা সকরুণ অসহায় দুঃখই তাহার ছিল। কিন্তু বসন্ত তাহার কোলের উপর মরিয়া মরণের সঙ্গে একটা প্রত্যক্ষ পরিচয় করিয়া দিয়া গেল যেন। বসন্তের হাতে কপালে হাত রাখিয়া সে যেন মরণের ছোঁয়াচ অনুভব করিয়াছে। মরণ যেন বসন্তকে লইয়া তাহার সঙ্গে কাড়াকাড়ি করিয়া গেল।

বসন্ত কিন্তু মরিতে ভয় পায় নাই, তবে বাঁচিতে তাহার সাধ ছিল। মরণে ভয়ই বা কি? ভয় শুধু হারাইয়া যাওয়ার। দেহ ঘর সংসার স্বজন পৃথিবী হারাইয়া অসহায় মানুষের আত্মা নাকি দেহের মমতায় অনেক সময় কাঁদিয়া কাঁদিয়া ফেরে। গভীর নিশীথ-রাত্রে বসন্ত যদি আসে—চিতার পাশে দেহের সন্ধানে?

বসন্ত কিন্তু আসিল না।

সমস্ত রাত্রি শ্মশানে শিয়াল, শকুন, কুকুর প্রভৃতি শ্মশানচারীদের মধ্যে কাটাইয়া দিল, কিন্তু বসন্তের দেখা মিলিল না। সারারাত্রি বালুচরের ধার ঘেঁষিয়া গঙ্গা কলকল করিয়া বহিয়া গেল। কলকল-কুলকুল শব্দ কখনও উঁচু কখনও মৃদু; আকাশে দুই-তিনটা তারা খসিয়া গেল; গঙ্গার ওপারে শড়কটায় কত গরুর গাড়ী গেল; গাড়ীর নীচে ঝুলানো আলো দুলিয়া দুলিয়া একটা আলো তিন-চারিটার মত মনে হইল; সারারাত্রি জোনাকীগুলা জ্বলিল, নিবিল; গঙ্গার কিনারার জঙ্গল হইতে বাহির হইয়া শিয়ালগুলা বালুর চরের উপর ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইল; গাছে শকুন কাঁদিল, চিতার কাছে কতকগুলা বসিয়া রহিল উদাসীর মত। নিতাই বসিয়া বসিয়া সব দেখিল, মুহূর্ত্তের জন্য কোন কিছুর মধ্যে বসন্তের আভাস মিলিল না, বসন্ত বলিয়া কিছুকে ভ্রম হইল না। আকাশের তারাগুলা পূব হইতে পশ্চিমে ঢলিয়া পড়িল, বড় কাস্তেটা পাক খাইয়া ঘুরিয়া গেল, বিছের লেজটা গঙ্গার পশ্চিম

পাড়ের জঙ্গলের মধ্যে ডুবিয়া গেল; পূব আকাশে শুকতারা উঠিল। গঙ্গার পূর্ব্ব পাড়ের ঢালু চরটা প্রায় ক্রোশখানেক চওড়া, তার ওপারে সারি-সারি গ্রাম, গ্রামের গাছপালাগুলার মাথায় আকাশে ক্রমে ফিকে রঙ ধরিল: কল-কল-কল-কল করিয়া পাখীগুলা একবার রোল তুলিয়া ডাকিয়া উঠিল। রাত্রি শেষ হইয়া আসিয়াছে। নাঃ, বসন্ত দুনিয়া হইতে মুছিয়াই গিয়াছে। হঠাৎ তাহার চোখ ফাটিয়া জল আসিল। সে চোখ বন্ধ করিয়া আত্মসম্বরণ করিতে চেষ্টা করিতেই মুহূর্ত্তে বসন্তের মুখ স্পষ্ট হইয়া তাহার মনের মধ্যে ভাসিয়া উঠিল। মনে হইল, বসন্ত যেন তাহার সামনে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে।—বসন্ত! বসন্ত!

চোখ খুলিতেই নিতাইয়ের ভ্রম ভাঙিয়া গেল। আকাশের অন্ধকারের ঘোর আরও কাটিয়াছে। গঙ্গা, শ্মশান, গাছপালা, চিতার আঙরা, কুকুরের পাল নিতাইয়ের সম্মুখে। উদাস মনে আবার সে চোখ বুজিল। অদ্ভুত! এ কি! আবার বসন্তকে সে দেখিতে পাইতেছে। বসন্ত আসিয়াছে। চোখ বন্ধ করিলেই সে দেখিতেছে স্পষ্ট বসন্তের ছবি; ছবি নয়—সত্যকারের বসন্ত, সে হাসিতেছে, কথা বলিতেছে। পুরানো কথার পুনরাবৃত্তি নয়, বসন্ত নূতন ভঙ্গিতে কত নূতন কথা বলিতেছে, নূতন বেশভূষায় নূতন রূপে দেখা দিতেছে।

নিতাই খুসী হইয়া উঠিল। থাকিতে থাকিতে নূতন কলি তাহার মনে জাগিয়া

"মরণ হে তোমার হ'ল পরাজয়।
বুকের নিধি তুমি কেড়ে নিতে পার—
মনের নিধি কিন্তু অমর অক্ষয়।
বুকের ভিতর আমার মনের লোহার ঘরে—
রাখি যে রতনে পরম যতন করে—
সাধ্য কি তোমার কেড়ে নিতে তারে—
আমি ছাড়া সে নয়, আমি যে সে-ময়।"

পরিপূর্ণ মন লইয়া সে উঠিল। বসন্ত তাহার হারায় নাই। গঙ্গার ঘাটে মুখ-হাত ধুইয়া সে ফিরিল বাসার দিকে।

বাসায় তখন বাঁধাছাঁদা তোড়জোড় পড়িয়া গিয়াছে। তাহাকে দেখিয়া সকলে হৈ-চৈ করিয়া উঠিল—এই যে! এই যে!

দোহারটি রসিকতা করিয়া বলিল—আমি বলি, ওস্তাদ বুঝি বিবাগী হয়ে গেল।

নিতাই মৃদু হাসিয়া ছড়ার সুরে তাহারই পুরানো একটা গানের দুইটি কলি আবৃত্তি করিয়া দিল—

"সে বিনে প্রাণে বাঁচিনে—ভবনে-ভুবনে রহি কেমনে?
আমি যাব সেই পথে, যে পথ লাগে ভাল নয়নে।"

ললিতা ঠোঁটে পিচ কাটিয়া বলিল—বল কি বোনাই, অঙ্গে তবে তোমার ছাই কই?

নির্ম্মলা কিন্তু আসিয়া সস্নেহে তাহাকে সম্ভাষণ করিয়া বলিল—ব'স দাদা, আমি চা ক'রে দি।

বাজনদারটি আসিয়া মৃদুস্বরে বলিল—কাল ছিলে কোথা বল তো? কার বাড়ীতে? কেমন হে? অর্থাৎ তাহার ধারণা, নিতাই কাল রাত্রে বসন্তকে ভুলিবার জন্য শহরের কোন দেহব্যবসায়িনীর ঘরে আশ্রয় লইয়াছিল।

বেহালাদার ধমক দিল—থাম হে থাম, তুমি। যেমন তুমি নিজে, তেমনি দেখ সবাইকে। ব'স ওস্তাদ, ব'স। নিতাই হাসিয়া বসিল।

প্রৌঢ়া এতক্ষণ কাজে ব্যস্ত ছিল। একজন পুরানো কাপড়ের ব্যবসায়ীর সঙ্গে বসন্তের কাপড়গুলি বেচিবার বন্দোবস্ত করিতেছিল। দাম-দস্তর শেষ করিয়া সে বাহিরে আসিল। নিতাইকে বলিল—ওগো বাবা, এই বেলাতেই উঠছি। গুছিয়ে জিনিসপত্তর বেঁধে-ছেঁদে লাও।

নির্ম্মলা একটি বাটিতে মুড়ি তেল মাখিয়া আনিয়া নামাইয়া দিয়া বলিল—চায়ের জল ফুটেছে, মুড়ি কটি খেয়ে লাও। সারা রাত কাল খাও নাই।

তাহার মুখের দিকে চাহিয়া নিতাই বলিল—ভগ্না লইলে ভাইয়ের বেথা কেউ বোঝে না।

—আর মাসী বেটীর কথা বুঝি ভুলেই গেলে বাবা? প্রৌঢ়া আসিয়া একটি মদের বোতল, গোটা দুয়েক গত রাত্রের সিদ্ধ ডিম, খানিকটা মাংস আনিয়া নামাইয়া দিল।—কাল রাত থেকে আনিয়ে রেখেছি। খাও, শরীলের যুত হবে।

নিতাই তাহার মুখের দিকে চাহিয়া মৃদু হাসিয়া বলিল—মা-মাসীকে কি কেউ ভোলে, না—ভোলা যায়? চিরদিন তোমার কথা মনে থাকবে মাসী।

প্রৌঢ়া আসিয়া বলিল—তুমি খাও, আমি আসছি।

প্রৌঢ়া চলিয়া যাইতেই ঢুলীটা আরও কাছে আসিয়া বসিল। নিতাই হাসিয়া বলিল—লাও, ঢেলে লাও। আরম্ভ কর।

কৃতার্থ হইয়া মদ ঢালিতে ঢালিতে ঢুলীটা চুপি চুপি বলিল—বসনের কাপড়-চোপড় বিক্রী হয়ে গেল।

নিতাই কোন উত্তর দিল না।

অভিযোগ করিয়া ঢুলীটা আবার বলিল—গয়না দু-এক পদ রেতে খুলে লাও নাই কেনে, বল দেখি? এমুনি মুখ্যমি করে, ছি!

নিতাই, বেহালাদার ও দোহারকে বলিল—এস, লাও।

তাহারাও এবার অপরিমেয় সহানুভূতি লইয়া কাছে ঘেঁষিয়া বসিল। কিছুক্ষণ পরেই বেহালাদার সচকিত হইয়া বলিল—ওই! বোতল শেষ হয়ে গেল! তুমি? তুমি তো কই—

নিতাই হাসিয়া বলিল—দরকার নাই, ও আর খাব না।

—খাবে না?

—নাঃ।

সকলে অবাক হইয়া গেল।

নিতাই বলিল বেহালাদারকে—তোমার কাছে একটি জিনিস শিখবার সাধ ছিল। রাত্রে তুমি যে বেহালা বাজাও, ওই বাজনাটি শিখতে।

বেহালাদার বলিল—নিশ্চয়। তোমাকে শেখাব না ওস্তাদ? দেখ দেখি! তিন দিনে শিখিয়ে দোব।

নিতাই হাসিয়া বলিল—তিন দিন আর পাচ্ছি কোথায় তোমাকে?

—কেনে? কথাটা বলিল দোহার। বেহালাদার স্থির দৃষ্টিতে নিতাইয়ের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

নিতাই হাসিয়া বলিল—আজুই আমি চলব!

—সে তো আমরাও। তুমি—। দোহারের মুখের উপর হাত দিয়া বেহালাদার বলিল—থাম তুমি, থাম।

নিতাই কিন্তু দোহারের কথারই জবাব দিল—তোমরা এক পথে, আমি আর এক পথে।

বেহালাদার তাহার হাতখানি চাপিয়া ধরিল, শুধু বলিল—ওস্তাদ!

নিতাই একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বেশ গলা ছাড়িয়া গান ধরিল—

"বসন্ত চলিয়া গেল হায়,
কালো কোকিল আজি কেমনে গান গায়
বল—কেমনে থাকে হেথায়!"

বেহালাদার বেহালাটা টানিয়া লইয়া বলিল—শোন ওস্তাদ, শোন, সেই সুর তোমাকে শোনাই, শোন। এসেছে।

সে ছড়ি টানিল—লম্বা টানা সুর। সেই সুর।

প্রৌঢ়া অনেক বুঝাইল। অনেক প্রলোভন দেখাইল। বসন্তের গহনা কাপড়-চোপড়ের দামের অংশ দিতে চাহিল। আরও বলিল—বসনের চেয়ে ভাল নোক আমি দলে আনছি বাবা। আমি কথা দিচ্ছি, তোমার কাছেই সে থাকবে।

নিতাই বলিল—না মাসী, আর লয়।

নির্ম্মলা কাঁদিল।

নিতাইও এবার চোখ মুছিয়া বলিল—না ভাই, তুমি কেঁদো না, তুমি কাঁদলে আমি বেথা পাব।

বেহালাদার বলিল—তুমি কি বিবাগী হবে ওস্তাদ?

নিতাই এ প্রশ্নের জবাব দিতে পারিল না। মনে মনে সে এখনও কিছু স্থির করিয়া উঠিতে পারে নাই। তবে এখানে আর ভাল লাগিতেছে না; শুধু ভাল লাগিতেছে না নয়, বসন্তের সঙ্গে যে গাঁঠছড়া ও গিঁঠ সে বাঁধিয়াছিল, সে গিঁঠ যে খুলিয়া গিয়াছে। বসন্ত যে আজ তাহাকে মুক্তি দিয়াছে, সে আর এ দলে থাকিবে কেমন করিয়া? বেহালাদারের প্রশ্নে তাহার মনে অকস্মাৎ নূতন সুর বাজিয়া উঠিল।—বিবাগী?

বৈরাগ্যই তাহার ভাল লাগিল।

একুশ

ঝুমুরের দল ধরিল দেশের পথ।

বাংলা দেশে, মেলা এবং সমারোহ-সম্পন্ন পর্ব্ব গাজন উৎসবের সঙ্গে সঙ্গেই প্রায় শেষ হয়। বৈশাখ হইতে চাষের কাজ সুরু হয়, অন্যদিকে বৎসরের উৎপন্ন সম্পদের উদ্বৃত্ত অংশ ব্যয়িত হইয়া সম্বল ক্ষীণ হইয়া আসে, কাজেই সমারোহের পর্ব্বের ব্যবস্থা এ সময়ে নাই। করিলেও চলে না। আবার আশ্বিনের পর উৎসব-সমারোহ আরম্ভ হইবে। বৈশাখে একটি পর্ব্ব আছে—সেটি বুদ্ধপূর্ণিমায় ধর্ম্মরাজ পূজা। সেও শেষ হইয়া গিয়াছে। এখন শহর বাজারে গেলে কিছু কিছু ব্যবসা চলে। কিন্তু বসন্তের মৃত্যু তাহাদের আসরটা যেন ভাঙিয়া দিয়া গেল। এবার আর জমিবে না। তাহারা তাই দেশের পথ ধরিল।

নিতাই কোন্ পথে কোথায় যাইবে ঠিক করে নাই, কিন্তু ওই দলটির বন্ধন কাটাইয়া অন্য পথে দাঁড়াইবার জন্যই ভিন্ন একটা পথ ধরিল।

নির্ম্মলার কান্নার বিরাম ছিল না।

শেষ মুহূর্ত্তে ললিতাও কাঁদিল।

প্রৌঢ়া কিন্তু আশা ছাড়ে নাই; সে বলিল—চিরকাল তো মানুষের মন বিবাগী হয়ে থাকে না বাবা, আবার চোখে রঙ ধরবে। তখন ফিরে এস। মাসীকে ভুল না।

বেহালাদার ম্লান হাসি হাসিয়া বলিল—আচ্ছা!

মহিষের মত লোকটাও কথা বলিল—চললে? তা—। খানিকটা চুপ করিয়া থাকিয়া আবার বলিল—সন্নোসী হওয়ার কষ্ট অনেক হে! ভিখ্ করে পেট ভরে না—নইলে—তা বেশ, এস তা হ'লে।

তাহারা যাইবে ছোট লাইনের ট্রেনে। যে লাইনের উপর নিতাইয়ের নিজের বাড়ী। ওই লাইনের ট্রেনেই নিতাই আসিয়াছিল—গ্রাম ছাড়িয়া। ট্রেনে চড়িয়াও মাসী বলিল—এস বাবা এই গাড়ীতেই চড়। এই নাইনেই তো বাড়ী। মন খারাপ হয়েছে—বাড়ী ফিরে চল বাবা!

বাড়ী! সেই কৃষ্ণচূড়ার গাছ। ঠাকুরঝি! সোনার বরণ ঝক্‌ঝকে ঘটি মাথায় ক্ষারে-ধোওয়া মোটা কাপড় পরা কালো মেয়েটি! মনে পড়িয়া গেল কত-কালের পুরানো গান—

"কালো যদি মন্দ তবে কেশ পাকিলে কাঁদো কেনে?
কালো চুলে রাঙা কুসুম হেরেছ কি নয়নে?"

নিতাইয়ের মুখে হাসির রেখা দেখা দিল। অদ্ভুত হাসি! কত কথা মনে পড়ি-তেছে, কত কথা—কত পুরানো গান!

নিতাই ঘাড় নাড়িয়া নীরবেই জানাইল—না।

তাহার মনের মধ্যে সেই গানের কলি গুঞ্জন করিতেছিল—"চাঁদ তুমি আকাশে থাক"। মনে ঘুরিতেছিল—"তাই চলেছি দেশান্তরে—।" সে আবার একবার ঘাড় নাড়িয়া জানাইল—না।

নিতাই নীরবেই বিদায় হইল। এই বিদায়, তাহার শোকাচ্ছন্ন মনকে আরও উদাস করিয়া তুলিল। দলের প্রত্যেক জনটির মুখ তাহার চোখের সম্মুখে ক্ষণে-ক্ষণে জাগিয়া উঠিতেছিল—বিদায়-ব্যথা-কাতর ম্লান মুখ! কাহারও সহিত কোনদিন তাহার ঝগড়া হয় নাই, কিন্তু তাহারা যে এত ভাল—এ কথা আজিকার দিনের এই মুহূর্ত্তটির আগে একদিন একটিবারের তরেও মনে হয় নাই। বরং যখন তাহাদের

কাছে ছিল তখন দোষই অনেক চোখে পড়িয়াছে। মাসীকে দেখিয়া মনে হইত মুখে মিষ্ট কথা বলিলেও সমস্ত অন্তরটা বিষে ভরা, মিথ্যা ছাড়া সত্য বলিতে জানে না। পৃথিবীতে খাদ্য এবং অর্থ ছাড়া আর কিছুকে ভালবাসে না মাসী। আজ মনে হইল—না, না, মাসী—মাসীর মত, মায়ের মত ভাল বাসিত তাহাকে। তাহার চোখের ওই কয় ফোঁটা জল বসন্তের মরণকালের ভগবানের নামের মতই সত্য।

নির্ম্মলা চিরদিন ভাল। মায়ের পেটের বোনের মতই ভাল।

ললিতার চোখা চোখা ঠাট্টাগুলি—শ্যালিকার মুখের ঠাট্টার মতই মিষ্ট ছিল।

বেহালাদারের কথা মনে করিয়া তাহার চোখে জল আসিল। কানের কাছে বাজিয়া উঠিল সেই স্বর।

সে ফিরিয়া আসিয়া বসিল গঙ্গার ঘাটে। গঙ্গায় স্নান করিয়া সে মনে মনে একখানি গঙ্গাস্তব রচনা করিল। ঘাটের উপরেই একটা গাছের তলায় আসিয়া বসিল। কিন্তু কোথায় সে যাইবে? পথে পথে ভিক্ষা করিয়া ফিরিবে বাউল দরবেশের মত? না। এ কল্পনা তাহার ভাল লাগিল না। তবে? কিই বা করিবে—কোথায়ই বা যাইবে? হঠাৎ তাহার মনে হইল—হায় হায় হায়, হায়রে পোড়া মন। এ কথা কি ভাবিতে হয়? ঠাকুর, ঠাকুরের কাছে যাইবে সে! গোবিন্দ! বিশ্বনাথ! প্রভু, প্রভুর কাছে যাইবে সে। মায়ের কাছে যাইবে। মা অন্নপূর্ণা। মা সীতা! রাধারাণী রাধারাণী রাধারাণী! সে কবিয়াল—সে কবি। সে সেইসব দেবতার দরবারে বসিয়া গান গাহিবে—মহিমা কীর্ত্তন করিবে—ভগবানকে গান শুনাইবে—শ্রোতারা শুনিয়া চোখের জল ফেলিবে—সঙ্গে সঙ্গে তাহাকেও কিছু কিছু দিয়া যাইবে—তাহাতেই তাহার দিনগুজরাণ হইবে। ভাবনা কি? হায় রে পোড়া মন—এতক্ষণ তুমি এই কথাটাই ভাবিয়া পাইতেছিলে না? সমস্ত দিন ধরিয়া সে কল্পনা করিল—যতটা সে পারিবে পথে পথে হাঁটিয়াই চলিবে, অপারগ হইলে ট্রেন ধরিবে, শরীর সুস্থ হইলে আবার হাঁটিবে। এখান হইতে কাশী, বাবা বিশ্বনাথ—মা অন্নপূর্ণা। কাশী হইতে অযোধ্যা, সীতারাম—সীতারাম! সীতারামের রাজ্য হইতে রাধাগোবিন্দ, রাধারাণী—রাধারাণীর রাজ্য বৃন্দাবন। তারপর মথুরা—না, না, মথুরা সে যাইবে না। রাধারাণীকে কাঁদাইয়া রাজ্যলোভী শ্যাম রাজা হইয়াছে সেখানে, সে রাজ্যে নিতাই যাইবে না। মথুরা হইতে বরং কুরুক্ষেত্র—হরিদ্বার। হরিদ্বারের পরই হিমালয়—পাহাড় আর পাহাড়। তাহার ভূগোল মনে পড়িল—পৃথিবীর মধ্যে এত উঁচু পাহাড় আর নাই—হিমালয়ের সর্ব্বোচ্চ শৃঙ্গ গৌরীশঙ্কর। হিমালয়ের মধ্যেই মানস সরোবর। সেখান পর্য্যন্ত নাকি

মানুষ যায়। নিতাই মানস সরোবরে স্নান করিবে। তারপর জনশূন্য হিমালয়ের কোথাও একটা আশ্রয় বানাইয়া, সেইখানেই থাকিয়া যাইবে। নিত্য নূতন গান রচনা করিবে—গাহিবে, পাহাড়ের গায়ে খুদিয়া খুদিয়া লিখিয়া রাখিবে। সে মরিয়া যাইবে—তাহার পর যে সে-পথ দিয়া যাইবে সে তাহার গান পড়িবে—মনে মনে নিতাই-কবিকে নমস্কার করিবে।

বৈশাখের দ্বিপ্রহর। আগুনের মত তপ্ত ঝড়োহাওয়া গঙ্গার বালি হু-হু করিয়া বহিয়া চলিয়াছে। দুই পারের শস্যহীন চরভূমি ধূসরবর্ণ—যেন ধূ-ধূ করিতেছে। মানুষ নাই, জন নাই; কেবল দুই-একটা চিল আকাশে উড়িতেছে—তাহারাও যেন কোথায় কোন্ দূর দূরান্তরে চলিয়াছে। সব শূন্য—সব উদাস—সব স্তব্ধ—একটা অসীম বৈরাগ্য যেন সমস্ত পৃথিবীকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছে। নিতাই সেই অগ্নিগর্ভ রৌদ্রের মধ্যেই বাহির হইয়া পড়িল। "চলো মুসাফের বাঁধো গাঁঠোরী—বহুদূর যানা হৈ।"

নিতাই কাশীতে আসিয়া উঠিল।

ব্রীজের উপর ট্রেনের জানালা দিয়া কাশীর দিকে চাহিয়াই সে মুগ্ধ হইয়া গেল। বাঁকা চাঁদের ফালির মত গঙ্গার সাদা জল ঝকমক্ করিতেছে—সমস্ত কোল জুড়িয়া মন্দির, মন্দির আর ঘাট, আরও কত বড় বড় বাড়ী। নিতাইয়ের মনে হইল মা-গঙ্গা যেন চোখঝলসানো পাকা বাড়ীর কণ্ঠি গাঁথিয়া গলায় পরিয়াছেন। ট্রেনের যাত্রীরা কলরব তুলিতেছে—জয় বিশ্বনাথ—অন্নপূর্ণামায়ীকি জয়!

সেও তাহাদের সঙ্গে সঙ্গে সুর মিলাইয়া দিল।

স্টেশনে নামিয়া অকস্মাৎ তাহার মনের ছন্দ কাটিয়া গেল। সে বিব্রত এবং বিহ্বল হইয়া পড়িল। বাংলা দেশের শেষ হইতেই সে একটা অস্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করিতেছিল। ট্রেনে ক্রমশই ভিন্ন ভাষাভাষী ভিন্ন রকমের বেশভূষায় ভূষিত লোকের ভিড় বাড়িতেছিল। কাশীতে নামিয়াই সে এই ভিন্ন ধরণের মানুষের মেলার মধ্যে মিশিয়া গিয়া মুহূর্ত্ত মধ্যে প্রত্যক্ষভাবে অনুভব করিল যে, এখানকার মানুষের সঙ্গে তাহার জীবনের ছন্দ কোনখানে মিলিতেছে না।

বিহ্বলের মতই সে দাঁড়াইয়া রহিল।

চারিদিকে অসংখ্য মানুষ, কিন্তু প্রশ্ন করিবার মত কাহাকেও সে খুঁজিয়া পাইল না। মাথায় পাগড়ী টুপি, কাপড়জামা পরিবার ভঙ্গি সব স্বতন্ত্র—তাহাদের

কলরবের মধ্যে কতকগুলি শব্দ ছাড়া সে আর কিছুই বুঝিতে পারিতেছে না। আর যেটুকু বুঝিতেছে সেটুকু বক্তব্যের ভঙ্গির মধ্য হইতে ভাবের ইঙ্গিত—জিজ্ঞাসা—সম্বোধন—কৌতুক—ক্রোধের ভাবসঙ্কেত। প্রাণ তাহার হাঁপাইয়া উঠিল।

রাজন হিন্দী বাত বলিত। কিন্তু এ হিন্দী সে হিন্দী নয়। ভাষা আলাদা, স্বর আলাদা—সব আলাদা। নিতাইয়ের মনে হইল—এ কথা অত্যন্ত কঠিন, ইহার এতটুকু মিষ্টতা নাই,—স্নেহ নাই, রস নাই, সুর নাই।

টাঙ্গা, এক্কা, মোটর দ্রুত গতিতে শহরের দিকে চলিয়াছে। অসংখ্য মানুষ ভাষা বলিতে বলিতে চলিয়াছে। সেই জনস্রোতে নিতাই ভাসিয়া চলিল।

—মহাশয়!

লোকটা তাহার দিকে চাহিয়া একটা ভ্রূকুটি করিয়া চলিয়া গেল।

—ওহে ভাই! ওহে!

লোকটা কি শুনিতে পায় না?

—ও ভাই, শুনছ?

লোকটা হয়তো কালা. নতুবা এত উঁচু গলার ডাক শুনিতে না পাওয়ার কথা নয়। অথবা লোকটা শুনিয়াও শুনিল না।

বিহ্বলের মত চারিদিকে চাহিতে চাহিতে এক পথ হইতে অন্য পথে চলিতেছিল। অকস্মাৎ তাঁহার মুখ চোখ আনন্দে প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। পূজার থালা হাতে ধপ্ধপে সাদা থান পরিয়া যাইতেছিলেন একটি মহিলা। সে আনন্দে অধীর হইয়া তাঁহার দিকে আগাইয়া গেল। তাহার মনে হইল—এ যে তাহাদের গ্রামের সেই রাঙা মা ঠাকুরুণ। হ্যাঁ—তিনিই তো। তেমনি ঢলমল করিয়া সম্ভ্রমভরা কাপড় পরিয়াছেন, তেমনি আধ-ঘোমটা মাথায়, মাথার চুলগুলি ভালভাবে ছাঁটা—তিনিই তো! হারাইয়া-যাওয়া ছেলে যেন মাকে খুঁজিয়া পাইয়াছে। কাছে আসিয়া সে তাঁহার আগে গিয়া জোড়হাত করিয়া দাঁড়াইল। না, রাঙা মা-ঠাকুরুণ নন, তবে ঠিক রাঙামায়ের মতই। ইনিও তাহাদের দেশের অন্য কোন গ্রামের রাঙামা—তাহাতে নিতাইয়ের সন্দেহ রহিল না। সে হিসাবে তাহার ভুল হয় নাই—তিনি বাঙালী মহিলাই বটেন। বিধবা বাঙালীর মেয়েটি পূজা করিয়া ফিরিতেছিলেন। নিতাই আসিয়া হাত জোড় করিয়া বলিল—মা-ঠাকুরুণ!

নিতাইয়ের দিকে চাহিয়া দেখিয়া তিনি বলিলেন—কে বাবা?

নিতাই গড় হইয়া প্রণাম করিয়া করিয়া বলিল—আজ্ঞে হ্যাঁ, মা, আমি এখানে বড় 'বেপদে' পড়েছি।

—বিপদ ?

—হ্যাঁ মা, গরীব 'নোক', আশ্চয় নাই ; তা ছাড়া আমি কথাবার্ত্তা কিছুই বুঝতে পারছি না।

হাসিয়া তিনি বলিলেন—এস, আমার সঙ্গে এস। দেশ থেকে বুঝি সন্থ এসেছ ?

—হ্যাঁ মা ! নিতাই যেন বাঁচিয়া গেল।

তাহার এই নূতন মা—মানুষটি বড় ভাল।

নিতাই মনে মনে নিজের ভাগ্যকে ধন্যবাদ দিল। ভাগ্যবিধাতাকে বলিল—প্রভু, তোমার মত দয়াল আর হয় না। অধমের ওপর দয়ার তোমার শেষ নাই। নইলে এমন বিদেশে বিভূঁয়ে যশোদার মত মায়ের আশ্চয়ে এসে পড়লাম কি ক'রে ?

এই নূতন মা তাহাকে নিজের বাসায় লইয়া গেলেন। বাসা—একখানি ঘর, এক টুকরা বারান্দা। আর রান্না করিবার জন্য ছোট আর একটা বারান্দার একটা কোণ। নিতাই সঙ্কুচিত হইয়া বলিল—আমি বরং বাড়ীর বাইরে বসি।

—কেন বাবা ? এই বারান্দায় ব'স। হ'লেই বা ডোম।

নিতাই চুপ করিয়া রহিল।

মা বলিয়া গেলেন—বাঙালীর ছেলে তুমি। দেশ থেকে এসেছ—কতদিন দেশের কথা শুনি নি। তুমি বল দেশের কথা—আমি শুনি আর কাজ করি।

নিতাইয়ের চোখে জল আসিয়া গেল। সত্যই মা যশোদা। বৃন্দাবনের মায়েরা—যশোমতীর দেশের মায়েরা কেমন সে জানে না, কিন্তু তাহার দেশের মায়েরা ছাড়া যশোদার মত মা অন্য কোন দেশে আছে বলিয়া তাহার মনে হয় না। সে দেখিয়াছে এই দেশের কত লোক—হিন্দুস্থানী কথা যাহারা বলে—তাহারা তাহাদের দেশে যায়—অনায়াসে এক বৎসর. দুই বৎসর এক নাগাড়ে কাটাইয়া দেয়, কই মাকে দেখিবার জন্য তো তাহারা ছুটিয়া যায় না ! মায়েরাও নিশ্চয় দেশে দিব্য থাকে ! যে যশোদা গোপালকে এক বেলার জন্য গোষ্ঠে পাঠাইয়া কাঁদে, সে যশোদার মত মা তাহারা কি করিয়া হইবে ? তা ছাড়া এমন মিষ্ট কথা—আহা-হা রে !—মা গো মা ! না—কি বাবা গোপাল ? এমন ডাক—এমন সাড়া—আর কোথায় মেলে ?

মা তাহাকে কত কথা জিজ্ঞাসা করিলেন।—কোন্ জেলা কোন্ গাঁয়ে ঘর তোমার বাবা ? তোমাদের গ্রামে কত ঘর ব্রাহ্মণ—কত ঘর কোন্ জাত বাবা মাণিক ?

তোমাদের কোন্ স্টেশন ? তোমাদের ওদিকে গেল বার ধান কেমন বাবা ? ধান ছাড়া আর কোন ফসল হয় ? বর্ষা কেমন হয় বাবা ? বাদলা হয় ঘন-ঘন ?

মায়ের চোখ দুইটি স্বপ্নাতুর হইয়া উঠিল।

বর্ষায় কাদা কেমন হয় বাবা ? তোমাদের দেশে ডাবের গাছ বেশী, না তালের গাছ বেশী ? ডাবের দর কি রকম ? মাছ কেমন—কোন্ মাছ বেশী ? তোমাদের দেশের মুড়ি কেমন হয় বাবা ?

নিতাই একে একে জবাব দিয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়িল এক একটি ছবি।

—তোমাদের গ্রামের কাছে নদী আছে বাবা ? বড় দীঘি আছে গ্রামে ? আঃ, কত দিন দীঘির জলে স্নান করি নাই ! দীঘিতে পদ্মফুল ফোটে ? শালুক সব গ্রামেই আছে। নীল শালুক আছে বাবা তোমাদের গ্রামে ? কলমী-শুশুনির শাক হয় বাবা ?

মধ্যে মধ্যে প্রশ্ন ফুরাইয়া যায়। মা চুপ করিয়া থাকেন উদাস মনে, বোধ হয়, তাঁহারও মনে পড়ে দেশের কথা। আবার হঠাৎ মনে আসে একটা প্রশ্ন, সেইটার পিছনে পিছনে আসে—আবার এক ঝাঁক প্রশ্ন।

—তোমাদের ওদিকে সজনের ডাঁটা খুব হয় ? 'নজনে' আছে ? পানের বরজ আছে ? কেয়া-র গাছ আছে তোমাদের গ্রামে, সাপ থাকে গোড়ায় ? গোখরো কেউটে সাপ খুব বেশী ওদিকে, না ? নদীর ধারে শামুকভাঙা কেউটে থাকে ? গাঙ-শালিক আছে ? 'বউ কথা কও' পাখী আছে ? থাকবেই তো। 'চোখ গেল' অনেক আছে, না ? 'কৃষ্ণ কোথা রে' পাখী ? অনেকে বলে 'গেরস্তের খোকা হোক', হলুদ রঙ গায়ের, মাথাটি কালো, ঠোঁটটি লালচে ! আমরা বলি—'কৃষ্ণ কোথা রে' —আছে ?

হঠাৎ মায়ের চোখ জলে ভরিয়া গেল। চুপ করিয়া তিনি বসিয়া রহিলেন কিছুক্ষণ। ফোঁটা দুই জলও তাঁহার চোখ হইতে ঝরিয়া পড়িল।

নিতাই প্রশ্ন করিতে সাহস করিল না। কিন্তু 'কৃষ্ণ কোথা রে' পাখীর সন্ধানে চোখে জল আসিল দেখিয়া তাহার মনে হইল—তাঁহার কৃষ্ণও কোথায় চলিয়া গিয়াছে বোধ হয়।

মা বলিলেন—মা যশোদা গোপালের জন্যে কাঁদছিলেন আর হলুদ বাটছিলেন। বাটা হলুদ নিয়ে কাঁদতে কাঁদতেই গড়লেন এক পাখী। সেই পাখীর মাথায় ঝরে পড়ল—তাঁর চোখের এক ফোঁটা জল। সেই জলের তাপে পুড়ে তার মাথাটি হয়ে গেল কালো—আর জলের সঙ্গে ছিল যে চোখের রক্ত, সেই রক্তে তার ঠোঁট হয়ে গেল

লাল। পাখীটিকে ছেড়ে দিয়ে বললেন—পাখী, তুই দেখে আয় আমার কৃষ্ণ কোথায়। পাখী ডেকে ডেকে ফিরতে লাগল—'কৃষ্ণ কোথা রে ?' 'কৃষ্ণ কোথা রে ?'

নিতাইয়ের চোখ দিয়াও জল ঝরিতে আরম্ভ করিল।

মা বলিলেন—আমার কৃষ্ণও চলে গেছে বাবা। ব্রহ্মাণ্ডেও আর কেউ নেই। তাই এসেছি বাবার চরণে। নইলে দেশ ছেড়ে—। অর্দ্ধপথেই থামিয়া মা চোখ মুছিলেন। আবার প্রশ্ন করলেন—বাবা, তোমার কে আছে ঘরে ? মা আছে ?

—আছে, মা।

—তবে তুমি এই বয়সে ? কিছু মনে ক'রো না বাবা—তোমাদের জাতের কেউ তো এমন ভাবে আসে না! তাই জিজ্ঞাসা করছি।

হাত দুটি জোড় করিয়া নিতাই বলিল—পূর্ব্বজন্মের কর্ম্ম ফল—হয়তো আমার কর্ম্মফের, নইলে—

—কি বাবা!

নিতাই বলিল—বাবা দাদা চাষ করেছে। একটু থামিয়া আবার বলিল—লুকোব না মা আপনকার নেকটে, চুরি ডাকাতিও করেছে। সেই বংশে জন্ম আমার, মা—আমি—সে আবার থামিয়া গেল। কয়েক মুহূর্ত্ত পরে সে আবার বলিল—বলিতে সে লজ্জা বোধ করিতেছিল, বলিল—দেশে কবিগান শুনেছেন মা ? দুই কবিয়ালে মুখে মুখে গান বেঁধে পাল্লা দিয়ে গান করে ?

—শুনেছি বইকি বাবা। কত শুনেছি। আমাদের গাঁয়ে নবান্নের সময় বারোয়ারী অন্নপূর্ণাপুজো হ'ত। কবিগান হোত পুজোয়। দুর্গাপুজোয় হ'ত যাত্রাগান, কৃষ্ণযাত্রা—শখের যাত্রা। নীলকণ্ঠের গান—"সাধে কি তোর গোপালে চাই গো ? শোন যশোদা!" সে সব গান কি ভুলবার! মনসার ভাসান গান হ'ত মনসাপুজোয়। চব্বিশ প্রহরের কীর্ত্তন হ'ত। বাউল বৈরেগীরা খঞ্জনী একতারা নিয়ে গান গেয়ে ভিক্ষা করত—"আমি যদি আমার হতাম কুড়িয়ে পেতাম হেমের ঘড়া"। আহা-হা বাবা সেই কীর্ত্তনগানে শুনেছিলাম—"অমিয় মথিয়া কেবা লাবনি তুলিল গো তাহাতে গড়িল গোরাদেহ"—গোরাচাঁদের দেহ অমৃত ছেঁকে তৈরী হয়েছে। এ সব গান সেই অমৃত-ছাঁকা জিনিস বাবা। কবিগান শুনেছি বইকি।

নিতাই চুপ করিয়া গেল। ইহার পর আর নিজেকে কবিয়াল বলিয়া পরিচয় দিতে সাহস হইল না।

বিধবাই জিজ্ঞাসা করিলেন—তুমি কি কবির দলে থাকতে বাবা ? নিজে কবিগান করতে ?

হাত জোড় করিয়া নিতাই বলিল—হ্যাঁ মা, অধম একজন কবিয়াল।

—তবে তো তুমি ভাল লোক বাবা। তীর্থ করতে বেরিয়েছ?

একটু চুপ করিয়া থাকিয়া নিতাই বলিল—আর ফিরব বলে বেরুই নাই মা। ইচ্ছে আছে ভগবানের দরবারে পথে পথে গান করব, তাতেই দিন কটা কেটে যাবে আমার।

বিধবা অনেকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলেন—তুমি তো সুখ পাবে না বাবা, এ দেশে—। বলিতে গিয়া তিনি হঠাৎ থামিয়া গেলেন।—সুখ যদি বিশ্বনাথ দেন তো পাবে।

অপরাহ্ণে সে বিদায় লইল মায়ের কাছে।

মায়ের বৃত্তান্ত সে সব জানিল। আপনার জন মায়ের কেউ নাই, একমাত্র সন্তানকে হারাইয়া মা এখানে আসিয়া আশ্রয় লইয়াছেন। দেশ হইতে জ্ঞাতিরা, যাহারা তাঁহার শ্বশুরের সম্পত্তির উত্তরাধিকার পাইয়াছে, তাহারা মাসে দশটি করিয়া টাকা পাঠায়, তাও অনিয়মিত। মা হাসিয়া বলিলেন—পেটের জন্যে ঝগড়া করতে ইচ্ছে করে না বাবা, লজ্জা হয়। আহার কমিয়ে আধপেটা অভ্যেস করলে এক মাসের খোরাকে দু মাস যায়। তার মধ্যে উপোস করতে পারলে—বিধবার উপোস তো অনেক।

নিতাই প্রণাম করিল দূর হইতে ভূমিষ্ঠ হইয়া, বলিল—আপনি দু পা পিছিয়ে যান মা। আমি ওই ঠাঁইটির ধূলো নেব।

মা বলিলেন—তুমি আমার পা ছুঁয়েই নাও বাবা। আমি তো চান করব এখুনি।

—না। নিতাই তাঁহার পা ছোঁয় নাই।

মা বলিলেন—অনেক সত্র আছে, জায়গা মিলবে। আমার ঘর এই তো দেখছ—তা ছাড়া এ বাড়ীতে আর দশজন থাকে। সবাই মেয়েছেলে এখানে—

নিতাই হাসিয়া বলিল—দেবতার দেখা খানিকক্ষণের জন্যই বটে মা। চিরকালের পুণ্যি তো আমার নয় মা অন্নপূর্ণা। আপনি আমার সাক্ষাৎ মা অন্নপূর্ণা।

মা বলিলেন—তোমার কচি বয়স, তুমি কবিয়াল—তুমি দেশে ফিরে যাও বাবা। চমৎকার তোমার গলা। গানও তোমার ভাল। দেশে তোমার কদর হবে। এ তো বাংলা গানের দেশ নয় বাবা।

এই কথাটায় নিতাই একটু ক্ষুণ্ণ হইল। এই লইয়া মা তাহাকে দুইবার কথাটা বলিলেন।

* * *

বিশ্বনাথের মন্দির-প্রাঙ্গণে সে সন্ধ্যায় আসিয়া বসিল। ডোমের ছেলে সে, মন্দির-প্রবেশের অধিকার নাই—সেজন্য তাহার আক্ষেপও নাই। প্রাঙ্গণের এক প্রান্তে বসিয়া মন্দিরশীর্ষের ধ্বজার দিকে চাহিয়াই সে ধন্য হইয়া গেল।

চারিদিকে আরতি ও শৃঙ্গার-বেশ দর্শনার্থীর ভিড়। হাজার কণ্ঠে বিশ্বনাথের জয়ধ্বনি, সেই ধ্বনির সঙ্গে সে নিজের কণ্ঠও মিশাইয়া দিল—জয় বিশ্বনাথ!

তারপর সে গান রচনা আরম্ভ করিল—

"ভিখারী হয়েছে রাজা দেখ রে নয়ন মেলে।
সাতমহলা সোনার দেউল গড়েছে সে শ্মশান ফেলে।"

গুন্‌গুন্ করিয়া সুর ভাঁজিয়া গানখানি রচনা শেষ করিয়া সে গলা চড়াইয়া গান আরম্ভ করিল—আহা! প্রাণ ঢালিয়া সে গাহিতেছিল। প্রাঙ্গণের লোকজন মিষ্ট কণ্ঠের আকর্ষণে আসিয়া জমিতে আরম্ভ করিল। কিন্তু অল্পক্ষণ দাঁড়াইয়াই তাহারা চলিয়া যাইতেছিল।

গান শেষ হইলে—অল্প কয়েক জন লোক, যাহারা শেষে আসিয়া জমিয়াছিল—তাহাদের একজন তাহাকে কিছু বলিল। তাহার বক্তব্য সম্পূর্ণ বুঝিতে না পারিয়া নিতাই সবিনয়ে বলিল—কি বলছেন প্রভু? আমি বুঝতে পারতা নাই।

একজন হাসিয়া বাঙলায় বলিল—তুমি বুঝি সবে এসেছ দেশ থেকে?

—আজ্ঞে হঁ্যা।

—উনি বলছেন হিন্দী ভজন গাইতে। তোমার এমন মিষ্টি গলা, তোমার কাছে হিন্দী ভজন শুনতে চাইছেন।

—হিন্দী ভজন? নিতাই জোড়হাতে বিনয় করিয়া বলিল—আজ্ঞে প্রভু, আমি তো হিন্দী ভজন জানি না।

বাঙালীটি হিন্দী ভাষায় প্রশ্নকারী ওইদেশী লোকটিকে যাহা বলিল, আন্দাজে নিতাই সেটা বুঝিল; বোধ হয় বলিল—হিন্দী-ভজন ও জানে না।

জনতার সকলেই এবার চলিয়া গেল। যেন তাহার মধ্যে উপেক্ষা ছিল বলিয়া নিতাইয়ের মনে হইল।

এখানে ওখানে আরও কতজনে গান গাহিতেছে, হিন্দী গান, সেখানে ছোট বড় নানা ধরণের ভীড় জমিয়াছে। সেও উঠিয়া আসিয়া একটা জনতার পাশে দাঁড়াইল।

সুর তাহার মন্দ লাগিল না, মন্দ কেন, ভালই লাগিল; কিন্তু গান সে বিশেষ বুঝিতে পারিল না, ভালও লাগিল না। তাহার মনে গুঞ্জরণ করিয়া উঠিল রামপ্রসাদের পদ;

"আমার কাশী যেতে মন কই সরে?
সর্ব্বনাশী এলোকেশী—সে যে সঙ্গে-সঙ্গে ফেরে!"

আহা রে! ইহার চেয়ে কি ভাল গান হয়? তাহার সমস্ত অন্তরটা এক গভীর বেদনার উদাসীনতায় ভরিয়া উঠিল। তাহার মনে পড়িল গ্রামের মা-চণ্ডীকে। রামপ্রসাদের এলোকেশীর মত মা-চণ্ডী আজ এই কাশীতে আসিয়া তাহার আশে-পাশে ফিরিতেছে। কিছুক্ষণ পর সে মন্দির প্রাঙ্গণ হইতে বাহির হইয়া পথে পথে ঘুরিয়া অবশেষে গঙ্গার ঘাটে আসিয়া উপস্থিত হইল। চুপ করিয়া ঘাটের উপর বসিল, আবার তাহার মনে পড়িল, রামপ্রসাদের আর একখানি গান—

"মা হওয়া কি মুখের কথা!
শুধু প্রসব করলেই হয় না মাতা—
যদি না বোঝে সন্তানের ব্যথা!
ক্ষুধার সময় শুধায় না মা—
এল সন্তান গেল কোথা?"

চোখে তাহার জল আসিল। গানের সঙ্গে এবার মনে পড়িল এখানকার মা অন্নপূর্ণাকে। সে গুন্‌গুন্ করিয়া গান আরম্ভ করিল।

তাহার অনতিদূরে দুইটা লোক অনর্গল বকিয়া চলিয়াছে। তাহাদেরই একজন আলোচনায় বাধা পাইয়া রূঢ়ভাবেই বলিল—গানা মৎ করনা। মৎ চিল্লাও।

নিতাই চুপ করিয়া বসিয়া রহিল।

আষাঢ়ের সন্ধ্যা। এখানে এখন প্রচণ্ড গরম। ঘাটে ও ঘাটের উপর পথে দলে দলে লোক আসিতেছে যাইতেছে, আলাপ আলোচনা চলিতেছে—কিন্তু সবই যেন নিতাইয়ের নিকট হইতে বহুদূরের কথা বলিয়া মনে হইতেছে, স্বরধ্বনির রেশ কানে আসিতেছে, কিন্তু শব্দের কথা অস্পষ্ট। মানুষগুলিও যেন অনেক দূরের মানুষ! মানুষের মত—তাহাদের সহিত নিতাই আত্মীয়তা নির্ণয় করিতে পারিতেছে না, মধ্যে মধ্যে দুই-চারি টুকরা কথা ঠিক কানের কাছেই বাজিয়া উঠিতেছে, বাঙলা কথা, দুই-চারিজন আত্মীয়েরও সাক্ষাৎ মিলিতেছে, তাহারা বাঙালী। কিন্তু তাহাতে নিতাইয়ের মন ভরিতেছে না।

মনে পড়িল মায়ের কথা কয়টি। স্তব্ধ হইয়া নিঃসঙ্গ অপরিচয়ের মধ্যে সে বসিয়াই রহিল। কতক্ষণ পরে—তাহার খেয়াল ছিল না—অকস্মাৎ সে অনুভব করিল—

জনকোলাহল স্তব্ধ হইয়া গিয়াছে। সচেতন হইয়া—চারিদিকে চাহিয়া দেখিল—লোক জন নাই; বোধ হয় যে যাহার ঘরে ফিরিয়া গিয়াছে। ঘাটের উপর দুই-চারিজন লোক ঘুমে অসাড় হইয়া পড়িয়া আছে। সেও ঘাটের উপর শুইয়া পড়িল। এই গভীর রাত্রে অচেনা শহরের পথ চিনিয়া যাওয়া সম্ভবপর হইবে না। আর কোথায়ই বা যাইবে? চারিদিক নিস্তব্ধ। কেবল ঘাটের নীচে গঙ্গার নিম্ন কলস্বর ধ্বনিত হইতেছে। সেই শব্দই সে শুনিতে লাগিল। অপরিচয়ের পীড়ায় পীড়িত অস্বচ্ছন্দ তাহার মন অদ্ভুত কল্পনাপ্রবণ হইয়া উঠিয়াছিল—গঙ্গার স্রোতের শব্দ শুনিতে শুনিতেও নিতাইয়ের মনে হইল—গঙ্গাও যেন দুর্বোধ্য ভাষায় কথা বলিতেছে। কাটোয়ায়, নবদ্বীপেও তো সে গঙ্গার শব্দ শুনিয়াছে; কাটোয়ায় যে-দিন বসন্তের দেহ পোড়াইয়াছিল, সে দিন তো গঙ্গা স্পষ্ট ভাষায় কথা বলিয়াছিল। এখানকার সবই কি দুর্বোধ্য ভাষায় কথা কয়? আবার তাহার মায়ের কথা মনে পড়িল। সমস্ত দিনের মধ্যে পাখীর ডাক সে অনেক শুনিয়াছে কিন্তু 'বউ কথা কও' বলিয়া তো তাহাদের কেউ ডাকে নাই; 'চোখ গেল' বলিয়াও তো কোন পাখী ডাকে নাই—'কৃষ্ণ কোথা রে' বলিয়াও তো কোন পাখী কাঁদিয়া ফেরে নাই এখানে! কাকের স্বর পর্য্যন্ত কেমন ভিন্ন রকম! মা তাহাকে বলিয়াছিলেন—ঠিকই বলিয়াছিলেন!

অকস্মাৎ তাহার মনে হইল - বিশ্বনাথ? বিশ্বনাথই যে এই রাজ্যের রাজা; তবে তিনিও কি—এই দেশেরই ভাষা বলেন? তাঁহার ওই ভক্তদের মতই তবে কি তিনি তাহার কথা—তাহার বন্দনা বুঝিতে পারেন না? হিন্দী ভজন? হিন্দী ভজনেই কি তিনি বেশী খুসী হন। 'মা অন্নপূর্ণা—তিনিও কি হিন্দী বলেন? ক্ষুধার সময় তিনি যদি নিতাইকে প্রশ্ন করেন—তবে কি ওই হিন্দীতে কথা বলিবেন? তবে? তবে? তবে সে কাহাকে গান শুনাইবে? আবার তাহার মনে পড়িল—তাহাদের গ্রামের 'মা চণ্ডী'কে, সঙ্গে সঙ্গে 'বুড়াশিব'কে। পাগলিনী ক্ষ্যাপা মা! ভাঙর ভোলা!

ওমা দিগম্বরী নাচ গো!

সঙ্গে সঙ্গে বেহারার কাঁধে চড়িয়া ক্ষ্যাপা মা নাচে!

"ভাঙড় ভোলা—হাড়ের মালা গলায় নাচে থিয়া থিয়া।"

ভোলানাথ নাচে, তাহার গাজনের ভক্তেরা নাচে। হাজারে হাজারে কাতারে কাতারে লোক আশেপাশে যাহারা দাঁড়াইয়া থাকে—তাহারাও মনে মনে নাচে।

কেবল মা চণ্ডী নয়, বাবা শিব নয়—তাঁহাদের সঙ্গে সঙ্গে নিতাইয়ের মনে পড়িল —অনেককে—অনেক কিছুকে। গ্রামের না হইলেও প্রথমেই মনে পড়িল ঝুমুর দলটিকে—নির্ম্মলা বোনকে মনে পড়িল—ললিতাকে মনে হইল, মাসীও আসিয়া

বাবা বলিয়া তাহার চোখের সামনে দাঁড়াইল। বেহালাদার, দোহার, বাজনদার—রাজন, বণিক মাতুল, বিপ্রপদ ঠাকুর, সকলে দূরে যেন ভীড় জমাইয়া দাঁড়াইয়া আছে। ঠাকুরঝিকে মনে পড়িল, কৃষ্ণচূড়ার গাছতলায় পথের দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া ওই যে!—গ্রামের ধারের নদী ও নদীর ধারে চরভূমিতে তরির চাষ, বিস্তীর্ণ মাঠ, বৈশাখে মাঠের ধূলা, কাল বৈশাখীর ঝড়, কালো মেঘ, ঘন ঘোর অন্ধকার, সেই চোখ ধাঁধানো বিদ্যুৎ—সেই কড়্ কড়্ শব্দে মেঘের ডাক—ঝর্ ঝর্ বৃষ্টি—সব মনে হইল। পূর্ণিমায় ধর্ম্মরাজ পূজার উৎসব। ঢাক শিঙা কাঁসীর বাজনার সঙ্গে ফুলের মালা গলায় ভক্ত দলের নাচ। গভীর রাত্রে বাগান হইতে ভক্তদলের ফল সংগ্রহ; কত কথা মনে পড়িল;—বাবুদের পুরানো বাগানে গাছের কোটরে অজগরের মত গোখুরার বাস, গোখুরাগুলা ডালে ডালে বেড়ায়, দোল খায়; কিন্তু ভক্তেরা যখন 'জয় ধর্ম্মরাজো' বলিয়া রোল দিয়া গাছে গাছে চড়ে, তখন সেগুলা সন্তর্পণে লুকাইয়া থাকে। জ্যৈষ্ঠে অবশিষ্ট আম যখন পাকে তখন বাগানটায় সে কি মিষ্ট গন্ধ! বাগানের সেই পুরানো বটগাছ তলায় অরণ্য ষষ্ঠীর দিন মেয়েদের সমারোহ মনে পড়িল। আল পথ ধরিয়া বিচিত্র বর্ণের কাপড় চোপড় পড়িয়া মেয়েদের যাওয়ার ছবি নিতাইয়ের চোখের সম্মুখে ভাসিয়া উঠিল। আল পথের দুধারে লকলকে ঘন সবুজ বীজ-ধানের ক্ষেত; মাঝখান দিয়া পথ। এখন আষাঢ়। আকাশে হয়তো মেঘ দেখা দিয়াছে, শ্যামলা রঙের জলভরা মেঘ। ভাবিতে ভাবিতে নিতাইয়ের 'বার-মেসে' গানের কথা মনে হইল। তাহারও মনে গানের সুর গুঞ্জন করিয়া উঠিল—

বৈশাখে সূর্য্যের ছটা—
যত সূর্য্য ছটা, কাঠফাটা, তত ঘটা কাল বৈশাখী মেঘে—
লক্ষ্মী মাপেন বীজ ধান্য চাষ ক্ষেতের লেগে।
পুণ্য ধরম মাসে—
পুণ্য—ধরম মাসে—ধরম আসে—পূর্ণিমাতে (সবে) পূজে ধর্ম্ম রাজায়—
আমার পরাণ কাঁদে, হায়রে বিধি, কাঠের মতন বক্ষ ফেটে যায়।
তারপরে জ্যৈষ্ঠ আসে —!
জ্যৈষ্ঠ এলে, বৃক্ষতলে, মেয়ের দলে অরণ্য ষষ্ঠী পূজে।
জামাই আসে, কন্যা হাসে—সাজেন নানা সাজে।
দশহরায় চতুর্ভুজা—
দশহরায় চতুর্ভুজা গঙ্গা পূজা, এবার সোজা ভাসিবে মাঠ বন্যায়।—

আমার পরাণ কাঁদে, হায়রে বিধি—চোখের জলে বক্ষ ভেসে যায় ॥

এমনি করিয়া আষাঢ়ে রথযাত্রা—বর্ষার বাদল—অম্বুবাচীর লড়াই, শ্রাবণের রিমি ঝিমি বর্ষণ মাথায় করিয়া ধানভরা ক্ষেত পার হইয়া সেই বাবাজীর আখড়ায় ঝুলন-উৎসব দেখার স্মৃতি হইতে চৈত্রের গাজন পর্য্যন্ত মনে করিয়া করিয়া সে এক নূতন বারমাসে গান মনের আবেগে রচনা করিয়া ফেলিল—

বছর শেষে—চৈত্র মাসে

বছর শেষে চৈত্র মাসে, দিব্য হেসে বসেন এসে অন্নপূর্ণা পুজোর টাটে

ভাণ্ডার পরিপূর্ণ, মাঠ শূন্য, তিল পুষ্প ফুটছে শুধু মাঠে—

তেল নাহি হায় শিবের মাথায়

তেল নাহি হায় শিবের মাথায় ভরল জটায়—অঙ্গেতে ছাই

গাজনে ভূত নাচায়।

আমার পরাণ কাঁদে—হায়রে বিধি—পক্ষ মেলে উড়ে যেতে চায় ॥

অধীর হইয়া সে প্রভাতের প্রতীক্ষা করিয়া রহিল। বারবার এখানকার নূতনমাকে মনে মনে উদ্দেশ করিয়া বলিল—তুমি আমাকে ছলনা করেছ মা! সেখানকার মা তুমি আমাকে ফেরাবার জন্যে আগে থেকে এখানে এসে বসে আছ! তোমার আজ্ঞা আমি মাথায় নিলাম। শিরোধার্য্য করলাম।

* * * *

সকালেই নিতাই ট্রেণে চড়িয়া বসিল।

সমস্ত রাত্রির জাগরণের অবসাদের পর ট্রেণে উঠিয়া একটা কোণে ঠেস দিয়া বসিবামাত্রই সে প্রায় ঘুমে আচ্ছন্ন হইয়া পড়িল। মোগলসরাই জংসনে কোনরূপে উঠিয়া ট্রেণ পালটাইয়া নূতন গাড়ীতে উঠিয়া সে বাঁচিয়া গেল। ছাদের সঙ্গে ঝুলানো বেঞ্চগুলার একটা খালি ছিল, সেই বেঞ্চে উঠিয়াই সে শুইয়া পড়িল। সঙ্গে সঙ্গেই ঘুমে আচ্ছন্ন হইয়া পড়িল! আঃ-নিশ্চিন্ত! সোনার দেশে মায়ের কোলে চলিয়াছে সে। পরদিন সকালে তাহার ঘুম ভাঙিল—পরিচিত কাহারও ডাকে যেন ঘুম ভাঙিল, নতুবা ঘুম ভাঙিত কি না সন্দেহ—পরিচিত কে ভারী মিষ্টস্বরে যেন তাহাকে ডাকিল।

—ওঠ, ওঠ, ওঠ!

নিতাই ধড়্মড়্ করিয়া উঠিয়া বসিল।

তাহাকে নয়, নীচের বেঞ্চে একটা লোক একটা গোটা বেঞ্চ জুড়িয়া শুইয়া আছে, তাহাকেই কতকগুলি নবাগত যাত্রী ডাকিতেছে—ওঠ—ওঠ।

নিতাই হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিল। আঃ গাড়ীটা চেনামুখে যেন ভরিয়া গিয়াছে। সব

চেনা, সব চেনা! নিতাই তাড়াতাড়ি উপর হইতে নীচে নামিয়া—সবিনয়ে আগন্তুক যাত্রী দলের একজনকে বলিল—মালগুলো ওপরে তুলে দি ?

—দাও তো দাদা, দাও তো।

—বেঁচে থাক বাবা ; বড় ভাল ছেলে তুমি। এক বৃদ্ধা তাহাকে আশীর্ব্বাদ করিল।

মালগুলা তুলিয়া দিয়া নিতাই জানালা দিয়া মুখ বাড়াইয়া দেখিল। ইষ্টিশানের বাহিরের দিকে চাহিয়া তাহার চোখ জুড়াইয়া গেল। সব চেনা—সব চেনা! আঃ—তবে তো দেশে আসিয়া পড়িয়াছে! জানালার বাহিরে বাঙলা দেশ। সব চেনা। রাণীগঞ্জ পার হইল। এইবার বর্দ্ধমান!

বর্দ্ধমানে গাড়ী বদল করিয়া—ঘণ্টা দুয়েক মাত্র। তাহার পরই সে গ্রামে গিয়া পড়িবে। মা চণ্ডী বুড়ো শিব!

মা-চণ্ডী বুড়োশিবের দরবারে বসিয়াই সে ভগবানকে গান শুনাইবে। তীর্থে তীর্থে মেলায় মেলায়—তারকেশ্বরে—কালিঘাটে গিয়া গান শুনাইয়া আসিবে। দেশের জেলায় জেলায় ঘুরিয়া দেশের লোককে গান শুনাইয়া ফিরিবে। তাহারা বলিবে না—হিন্দী ভজন গাও। নিজেই সে এবার কবির দল করিবে, এখন তাহার নাম হইয়াছে, বায়নার অভাব হইবে না। কবিয়াল নিতাইচরণের নামে দেশের লোক ভাঙিয়া পড়িবে। সে কিন্তু খেউড় আর গাহিবে না। শুধু ভগবানের নাম! আরও একজনের নাম করিয়া গান গাহিবে—বসন্তের নাম করিয়া গান। বসন্তকে সে কি ভুলিতে পারে ? সে বসন্তের কোকিল—বসন্তের গান না গাহিয়া সে থাকিতে পারে ?

কোকিল কি বসন্তকে ভুলিতে পারে ?

এক্সপ্রেস ট্রেণটা থামিয়া গেল।

বর্দ্ধমান! বর্দ্ধমান!

আসরের প্রথমেই গাহিবে মা চণ্ডীর বন্দনা ; সঙ্গে সঙ্গেই সে মা চণ্ডীর দরবারে গাহিবার জন্য গান রচনা আরম্ভ করিয়া দিল। দেশে নামিয়াই প্রথমে সে আজ মা চণ্ডীকে গান শুনাইয়া আসিবে ;—

সাড়া দে মা—দেগো সাড়া
ঘরপালানো ছেলে এলো—বেড়িয়ে বিদেশ-বিভূঁই পাড়া।
তোমার সাড়া না পেলে মা, কিছুতেই যে মন ভরে না—

আকাশ জুড়িয়া ঘন কালো মেঘ। হু-হু করিয়া ভিজা জলো বাতাস বহিতেছে। আঃ, দেহ জুড়াইয়া যাইতেছে। মাটির বুক আর দেখা যায় না; লকলকে কাঁচা ঘাসে ভরিয়া উঠিয়াছে। ওঃ—বর্ষা নামিয়া গিয়াছে; চষা ক্ষেতগুলির কালো মাটি জলে ভিজিয়া আদরিণী মেয়ের মত তুলিয়া ধরিতে গলিয়া পড়িয়াছে। টেলিগ্রাফের খুঁটির উপর একটা ভিজা কাক পাখা দুটা অল্প বিছাইয়া দিয়া ঘাড় বাঁকাইয়া বসিয়া আছে। কচি নতুন অশথ-বট-শিরীষের পাতাগুলি ভিজা বাতাসে কাঁপিতেছে। লাইনের দুধারের ঝোপগুলিতে থোপা থোপা ভাণ্ডীর ফুল ফুটিয়াছে! আহা-হা! কেয়া ঝোপটার সব চেয়ে বাহার খুলিয়াছে বেশী! হঠাৎ তাহার মনে পড়িয়া গেল বসন্তকে—

"করিল কে ভুল—হায় রে,
বুকের মাঝে ভরা মন মাতানো বাসে
করাত কাঁটার ধারে ঘেরা কেয়া ফুল!"

ঝম্-ঝম্ শব্দে ট্রেণ চলিয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে বৃষ্টিও নামিয়াছে। মধ্যে মধ্যে মেঘের উপর ঘনাইয়া আসিতেছে সন্ধ্যাবেলার কাজলদীঘির জলের রঙের মত রঙ, বৃষ্টি জোর হইতেছে অমনি চারিদিকে ঝাপসা। ওঃ, এদিকটায় প্রচুর বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে। মাঠ জলে থৈ থৈ করিতেছে। ব্যাঙের গ্যাঙোর গ্যাঙোর ডাক ট্রেণের শব্দকে ছাপাইয়াও কানে আসিতেছে। এদিকে কাড়ান লাগিয়া গেল।

ঘং-ঘং গম্-গম্ শব্দে ট্রেণখানা ধ্রুপদ ধামারে গান ধরিয়া দিল। নদীর পুল। গেরুয়া রঙের জলে সাদা সাদা ফেনা ভাসিয়া চলিয়াছে। এপার হইতে ওপার পর্য্যন্ত লাল জল থৈ থৈ করিতেছে। জল ঘুরপাক খাইতেছে, আবার তীরের মত ছুটিয়া চলিয়াছে। দুপাশে কাশের ঝাড়, ঘন সবুজ। অজয়! অজয় নদী! দেশে আসিয়া পড়িয়াছে। দেশ, তাহার গাঁ! তাহার মা।

তোমার সাড়া না পেলে মা, কিছুতেই যে মন ভরে না
চোখের পাতায় ঘুম ধরে না বয়ে যায় মা জলের ধারা।

এইবার বোলপুর—তারপর কোপাই, তারপর, তারপর জংসন; ছোট লাইন। ঘটো-ঘটো ঘটো-ঘটো ঘং-ঘং ঘং-ঘং। সর্ব্বাঙ্গে দুরন্ত দোলা দিয়া নাচাইয়া ছোট লাইনের গাড়ীর চলন। হায়-হায়-হায়-হায়! সঙ্গে সঙ্গে নিতাইয়ের বুকের ভিতর নাচিতেছে নিতাইয়ের মন। ছেলে মানুষের মত নাচিতেছে। চোখ ভাসাইয়া জল আসিতেছে অজয়ের বানের মত। মা গো—মা, আমার মা। আমার গাঁ। ওই যে—সেই 'নিমচের জোল' 'উদাসীর মাঠ';—ওই যে কাশীর পুকুর;—ওই যে

সেই কালী বাগান!—যে বাগানের গাছগুলি ছিল তাহার কবি-জীবনের গানগুলির প্রথম শ্রোতার দল!

গাড়ীটা ঈষৎ বাঁকিল—ইষ্টিশানে ঢুকিতেছে।—ওই যে, ওই যে।—গাড়ী থামিল।

ট্রেণ চলিয়া গিয়াছে।

নিতাই দাঁড়াইয়া আছে। তাহার চারিদিকে বিস্মিত একটি জনতা। নিতাই এমনটি প্রত্যাশা করে নাই। এত স্নেহ, এত সমাদর তাহার জন্য সঞ্চিত হইয়া আছে এখানে? রাজার মুখে পর্য্যন্ত কথা নাই। বেনে মামা, দেবেন, কেষ্ট দাস, রামলাল, কয়েকজন ভদ্রলোক পর্য্যন্ত তাহাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইয়া আছে। সম্মুখে সেই কৃষ্ণচূড়ার গাছটি। ফুলের সময় শেষ হইয়া আসিয়াছে, ঘন সবুজ চিরোল চিরোল পাতায় ভরিয়া উঠিয়াছে; তবু দুই চারিটা ফুল যেন নিতাইয়ের জন্যই ধরিয়া আছে। নিতাইয়ের চোখে জলের ধারা। নিতাই কাঁদিতেছে; কাঁদিতেছে বিপ্রপদ ঠাকুরের মৃত্যুকে উপলক্ষ্য করিয়া। বিপ্রপদ ঠাকুর মরিয়া গিয়াছে।

বিপ্রপদের জন্য নিতাইয়ের কান্নায় সকলে বিস্মিত হইয়া গিয়াছে। কথাটা কৌতুকের কথা! কিন্তু নিতাইয়ের ওই নীরব বিগলিত অশ্রুধারা এমন একটি অনুচ্ছ্বসিত প্রশান্ত মহিমায় মহিমান্বিত হইয়া উঠিয়াছিল যে তাহার কান্নাকে উপহাস করিবার উপায় ছিল না। নিতাইয়ের কবিয়ালীর খ্যাতি দেশে সকলেই শুনিয়াছে, তাহার জন্যে সকলে তাহাকে শ্রদ্ধা না হোক প্রশংসাও করে মনে-মনে; কিন্তু এ তাহা নয়, তাহারও অতিরিক্ত কিছু। তাহার চোখের ওই দর বিগলিত ধারার সেই মহিমাতেই নিতাই মহিমান্বিত হইয়া সকলের চেয়ে বড় হইয়া উঠিয়াছে! বিপ্রপদকে হারাইয়াই সে শুধু কাঁদে নাই, তাহাদের সকলকে ফিরিয়া পাইয়াও কাঁদিতেছে।

কতক্ষণ পর।

নিতাই আসিয়া বসিল সেই কৃষ্ণচূড়া গাছের তলায়। রাজাকে ডাকিয়া পাশে বসাইল। লাইন যেখানে বাঁকিয়াছে, দুটি লাইন যেখানে একটি বিন্দুতে মিলিয়া এক হইয়া গিয়াছে মনে হয়, সেইখানে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া নিতাই বলিল—রাজন! ভাই!

—ওস্তাদ! ভেইয়া।

—ঠাকুরঝি ?

—ওস্তাদ।

—রাজন।

—ঠাকুরঝি নাই ভাইয়া! মর গেয়া। রাজার ঠোঁট দুইটি কাঁপিতে লাগিল। ক্ষেপে গিয়া ঠাকুরঝি, উসকেবাদ। রাজার চোখ হইতে জল পড়িতে আরম্ভ করিল। পাগল হইয়া ঠাকুরঝি মরিয়াছে! ওইটুকুর মধ্যেই কত কথা নিতাই খুঁজিয়া পাইল। অনেক কথা। নিতাইয়ের চোখ হইতে আবার অনর্গল ধারায় জল পড়িতে আরম্ভ হইল।

কান্নার মধ্যেই আবার তাহার মুখে হাসি ফুটিয়া উঠিল। না—ঠাকুরঝি মরে নাই, সে যে স্পষ্ট দেখিতেছে, ওই যেখানে রেলের লাইন দুটি একটি বিন্দুতে মিলিয়া বাঁকিয়া চলিয়া গিয়াছে দক্ষিণ মুখে নদী পার হইয়া, সেই খানে মাথায় সোনার টোপর দেওয়া একটি কাশ ফুল হিল-হিল করিয়া দুলিতেছে, আগাইয়া আসিতেছে যেন! সে আছে। এখানকার সমস্ত কিছুর সঙ্গে সে মিশিয়া আছে। এই কৃষ্ণচূড়ার গাছ, কৃষ্ণচূড়ার ফুল—এখানকার মাটি, ওই রেল লাইন, সব কিছুরই সঙ্গে মিশিয়া সে একাকার হইয়া মিশাইয়া আছে।

নিতাই উঠিল, বলিল—চল।

—কোথা ওস্তাদ ?

—চল, চণ্ডীতলায় যাব। মাকে প্রণাম করে আসি।

রাজার মুখের দিকে চাহিয়া সে বলিল—গড়াগড়ি দিয়ে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করব মাকে।

তাহার সর্ব্বাঙ্গ যেন এখানকার ধূলামাটির স্পর্শের জন্য লালায়িত হইয়া উঠিয়াছে।